পিকাসো জীবন ও শিল্প

অঞ্জলি চৌধুরী

শরৎ পাবলিশিং হাউস । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
পৌষ, ১৩৬১

প্রকাশক
সত্যেন্দু চ্যাটার্জী
১৮এ টেমার লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
চন্দ্রশেখর চৌধুরী
লক্ষ্মী প্রেস
১২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

বাঁধাই
ফেন্সী বাইণ্ডার্স
১৪৭ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০০৯

মা ও ঠাকুমাকে

ভূমিকা

রৌদ্রকরোজ্জ্বল ভূমধ্যসাগরের উপকূলে প্রাচীন স্পেনের প্রাণচঞ্চল সহর মালাগা। এখানে একোণ শতবর্ষপূর্বে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে আবির্ভূত যে শিশুটি উত্তরজীবনে সুদীর্ঘকাল নিত্য নূতন শিল্প সৃষ্টির চমকে বিশ্বমানসে এক দুরন্ত আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন সেই অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর মানুষটির ব্যক্তি-জীবনও ছিল তেমনি গতিচঞ্চল ও বৈচিত্র্যময়। স্পেনীয় সমাজে ইচ্ছামত পিতা বা মাতার পদবী গ্রহণের যে স্বাধীনতা ছিল তারই সুযোগে মাতৃ পদবীতে পরিচিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় শিল্পশিক্ষক জোসে রুইজ ব্লাসকোর বালকপুত্র পাবলো পিকাসো নামেই খ্যাতি অর্জন করলেন।

সেই বাল্যকাল থেকেই পিকাসোর দৃষ্টি রীতিবদ্ধ শিক্ষালয়ের চার দেওয়ালের সীমায় গণ্ডীবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছে বারবার, পরিবর্তে আকর্ষণ জন্মেছে তাঁর পিতার ব্যবহৃত রং, তুলি আর কাগজের উপর যার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে খোলা আকাশে উড়ে যাওয়া পায়রার ছবি, উদার স্বাধীনতার আহ্বান। যৌবনের প্রারম্ভেই মালাগার উজ্জ্বল পরিবেশ ছেড়ে চলে আসতে হয় বার্সিলোনায়, যেখানকার বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশে শিল্পরচনায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর আত্মপ্রত্যয়। সেখান থেকে কর্মের অন্বেষণে মাদ্রিদ, সেখান থেকে উদ্বেলিত প্রাণচাঞ্চল্যে অস্থির শিল্প-জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্মকেন্দ্র প্যারিস। শেষ পর্যন্ত পিকাসো এই প্যারিসেই খুঁজে পেলেন তাঁর আত্মবিকাশের ভিত্তিভূমি। শিল্পসৃষ্টির রাজপথে সুরু হল তাঁর বিজয় অভিযান। প্রতিভার এই যাত্রা কাহিনী প্রকৃতির নিয়মেই ছিল প্রতিবন্ধকতায় আকীর্ণ; এই জয়যাত্রার যে ধারাচিত্র বক্ষ্যমান এই গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে বর্ণনাচাতুর্যে এবং গতিপ্রবণতায় শিল্পীর জীবনপ্রবাহের মতই তা উদ্বেলিত ও বর্ণোজ্জ্বল। মহারাষ্ট্রের চিত্রকথকদের, বাংলার গাথাবর্ণক পটুয়াদের মতই এই গ্রন্থের রূপকাহিনী চলেছে দ্বিধাহীন গতিতে শিল্পীর জন্মকাল থেকে উত্তরণের উত্তুঙ্গ শিখরাভিমুখে। পথে তাঁর কত ঝঞ্ঝা কত উদ্বেল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ প্রতিবন্ধকতা; কখনও ক্ষণিক সাফল্যের দ্যুতি, কখনও দারিদ্র্যের দারুণ নিষ্পেষণ; কখনও প্রেমের ঐকান্তিক রসপ্রবাহ কখনও মোহভঙ্গের হতাশা; পরিণামে সাফল্যের রত্নমুকুট। আধুনিক জগতের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন এই শিল্পীর জীবনের অপ্রমেয় ঐশ্বর্য-সম্ভারের এক অপূর্ব প্রতিচিত্রায়ণ এই গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে সন্দেহ নেই।

জন্মসূত্রে স্পেনীয় হলেও ফরাসী সংস্কৃতির উদার মানসিকতায় অভিষিক্ত ইউরোপের বন্ধনহীন জীবনের শরিক পিকাসোর শিল্পীজীবনের সূত্রপাতেই তাঁর প্রতিভার ঝলক বিদগ্ধদর্শকের অভিনন্দন লাভ করেছিল। প্যারিসের শিল্পপরিবেশে তখন প্রচলিত দৌবারিকের নির্দেশের নিকট নতজানু আত্মসমর্পণতায় স্বীকৃত না হয়ে নূতন শিল্পলোকের সন্ধানে যে যাত্রার সূত্রপাত ঘটেছিল তার পরিবেশ নিহিত ছিল ফরাসী বিপ্লবের যুগান্তকারী সমাজ বিক্ষোভে লব্ধ সচেতনতায়। মানুষ যে যুগে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র আর পুরোহিত শাসনকে ধূলিসাৎ করে নূতন সমাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল সেই যুগের অন্যতম কবি ও শিল্পব্যাখ্যাতা বোদলেয়ার প্যারিসের ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সাঁলোক (প্রদর্শনী) উপলক্ষ্য করে আগতকালের শিল্প সম্পর্কে বলেছিলেন—"He will be truely a painter, the painter who will know how to draw out of our daily life, its epic aspects and will make us see and understand in colour and design, how we are great and poetic in our neckties and polished boots."

বোদলেয়ারের এই আহ্বান বৃথা হয় নি; কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রচলিত অনুমোদিত মার্গের শিল্পধারাকে অস্বীকার করে কিছু তরুণ শিল্পী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরীতে এক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রত্যাখ্যাতের প্রদর্শনী (Salon de Refuse´s) নামে পরিচিত সেই প্রদর্শনীতে প্রচলিত ধারাকে অস্বীকার করে এক নূতন দিগন্তের সূচনা ঘটেছিল। এই প্রদর্শনীতে যে দুঃসাহসী পথিকৃতেরা ছবি দেখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এডুয়ার্ড মানের Luncheon on the grass ছবিতে সুদূর প্রসারী বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উন্মুক্ত পরিবেশে নারীপুরুষের একান্ত আত্মসচেতন অস্তিত্বের যে বন্ধনহীন পরিবেশ রূপায়িত হয়েছিল নবচেতনা বিরোধী শিল্পানুরাগীদের মধ্যে তার ফলে আত্মপ্রকাশ করেছিল দারুণ প্রতিক্রিয়া; রব উঠেছিল এই শিল্প "scandalous, shocking, fanatical, ugly, insane." কিন্তু কালব্যাপী সংগ্রামে বিদ্রোহীরাই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন বিজয়ের পথে। কবি বোদলেয়ার সেদিন রূপশিল্পের ধারায় এই গতিপরিবর্তনকে যে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সমকালীন মুখর সমালোচনা ও প্রবল বিরোধিতাকে অতিক্রম করে এই নবশিল্পধারাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে তা প্রভূত সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। যে প্রবহমান ধারা 'আকাডেমিক' সংজ্ঞায় বিহিত হয়ে সরকার ও সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছিল তাকে অস্বীকার করায় এই নব্যপন্থীদের জুটেছিল অবজ্ঞা ও অভাব। কিন্তু দুরন্ত

সাহসের সঙ্গে সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে তাঁরা শিল্পের রূপায়ণে নিয়ে এসেছিলেন নানা বৈচিত্র্য, নানা ইঙ্গিতময়তা। এই নূতন দিকচক্রের প্রবর্তন ঘটেছিল ডিলাক্রোয়ার রূপকল্পনায় যিনি বিধিনিয়ন্ত্রিত পথ থেকে সৃষ্টিধর্মকে মুক্ত করে শিল্পীর নিজস্ব রূপকল্পনার প্রতিফলন রচনা করেছিলেন। এই শিল্প সর্ব-কালের জীবনভিত্তিক মানবসত্তার ঐকান্তিক রূপটিকে ফুটিয়ে তুলবার সার্থক প্রয়াসে তৎপর হয়েছিল। তাতে দেখা দিয়েছিল শিল্পীর গভীর বাস্তবানুগতি, মানুষের অনুভূতির গভীরতা এবং বিস্তৃত জনচৈতন্য। এই নূতন পথের আন্দোলনে প্রকাশ পেয়েছিল নিগূঢ়-রূপানুরাগ, গতিপ্রবণতা এবং হৃদয়ের গভীর সংবেদনশীলতা; এই নূতন প্রেরণার মূলে ছিল যুক্তিবাদ আর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা। এই নূতন পথসন্ধানীদের সৃষ্টিকর্মে দেখা দিল অসংখ্য বৈচিত্র্য; এডুয়ার্ড মানের দৃষ্টি মরীচিকা, এডগার ডেগাসের জীবনতৃষ্ণা, ক্লড মনের ছায়াপ্রকল্প নিয়ে এল এক বিস্ময়কর আলোড়ন শিল্পের জগতে। এই বিদ্রোহের আশুফল রেনোয়াকে করেছিল আর্থিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত, মনকে নিয়ে গিয়েছিল আত্মহননের পথে। চঞ্চল করে তুলেছিল ভানগক্‌কে নূতন পথের সন্ধানে। পল গগাকে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম সমাজ অধ্যুষিত তাহিতি দ্বীপে। দৃশ্যপ্রকৃতির বিশ্লেষণ সামগ্রিক শিল্পমানসে যে নূতন চেতনার প্রসার ঘটিয়েছিল তার ফলশ্রুতি রূপ নিয়েছিল সেই দৃষ্টিতে যেখানে প্রতীয়মান হয়েছিল বস্তুগঠনের বর্তুলতা। স্ফীতি আর কোণকতা (Cylinder, sphere and cone)।

এই চেতনার বিবর্তনের এক ক্রান্তিলগ্নে স্পেন দেশ থেকে প্যারিসে এসে বাসা বাঁধলেন উত্তর জীবনের নায়কশিল্পী পাবলো পিকাসো—প্রাণের প্রাচুর্যে হৃদয় যাঁর উদ্বেল, ভূমধ্যসাগরীয় শিল্পপ্রবাহের উষ্ণতা যাঁর শোনিত ধারায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন কাল থেকে প্যারিসের শিল্পে যে যুগবিপ্লব ঘটেছিল তাতে সংযোজিত হল আর একটি ঘূর্ণাবর্তের গতি। এই বিপ্লবের পথে এসেছে একটির পর একটি উদ্বেলতরঙ্গ। কিন্তু প্যারিসের বিপ্লব সচেতন সমাজকেও বিস্মিত করে পিকাসো তাঁর একক জীবনেই বহুবার গতি পরিবর্তন করে এক অনতিক্রমণীয় ইতিহাস রচনা করেছেন।

স্থায়ীভাবে পিকাসো যখন প্যারিসে বসতি নিলেন তখন 'শিল্পের প্রকৃত মুক্তি কোন পথে?' এই প্রান্তিক জিজ্ঞাসায় প্যারিসের শিল্পজগত মহাচাঞ্চল্যে সংক্ষুব্ধ। উন্মোচিত হয়েছে যবনিকা নূতন শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে—শিল্পীদের জন্য এসেছে এক অবর্ণনীয় পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সম্মুখে ক্ষীণ প্রতিভার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল

তৃণের মত অপসারণ। এই দ্বন্দ্ব পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে পিকাসো আত্মপ্রত্যয়ের প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে সঞ্চালিত করলেন তাঁর তুলিকা, বর্ণবিন্যাসে এল অনুভূতির এক গভীর প্রতিবেদন। দৃশ্যমান আকৃতিতে শিল্পীর ভাবজগতের সুস্পষ্ট গঠনানুভূতি। এক অদৃষ্টপূর্ব শিল্পরূপের আবির্ভাবে প্রবল বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন প্যারিসের শিল্পানুরাগীদের মহলে। শিল্পের চক্রবালে এক নূতন দিগন্তের সূচনা হল। সেই আবির্ভাব ক্ষণটি থেকে পিকাসোর আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকলো প্রতিপর্যায়ে বিস্ময়কর নবরূপায়ণের পটে। স্প্যানীস আর ডাচ্ নরনারীর দেহগঠন গ্রীকো-রোমক শিল্পের জীবনধর্ম, ফোব-শিল্পগোষ্ঠীর প্রকৃতি সংস্রববর্জিত রূপপরিকল্পনা, নিগ্রোশিল্পের অন্তর্নিহিত ভাবুকতাকে অতিক্রম করে পিকাসো যেদিন কিউবিজমের বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ চত্বরে উপনীত হলেন সেদিন তাঁর শিল্পীজীবনের এক গুরুতর গতিপরিবর্তনের দিন। এই কিউবিজমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেক্ষাপটে পিকাসো যে নূতন অর্থ-সংযোজন করেছিলেন সেই দুর্জয় কর্মধারা তাঁকে নিয়ে এসেছিল বিবর্তনের এক উত্তুঙ্গ পর্যায়ে। সুরপ্রবাহের মত অদম্যতার প্রাণপ্রাচুর্য পিকাসোকে স্থিত হতে দেয় নি কিউবিজমের আবেদনেও; ব্রাকের (Georges Braque) সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বর্ণসম্পাতের প্রাচুর্যে চিত্রপটকে উদ্ভাসিত করে দৃশ্যপটে অবর্ণনীয় সুরপ্রবাহ (visual music) সৃষ্টির প্রয়াস করেও পিকাসোর তৃপ্তি হল না। তৃপ্তি হল না ভাববাদের নৈরাজ্যে; কিছুদিন মানবতাধর্মী রচনায় বিশ্রাম নিয়ে পিকাসো ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপর্যয়ের প্রবক্তারূপে সুররিয়ালিজমের (Surrealism) অন্তহীন বিস্তারে। এই পর্যায়েই দেখা দিল পিকাসোর রচনায় অর্দ্ধমানবীয় ও অর্দ্ধদানবীয় রূপসৃষ্টি, যে প্রতিরূপায়ণে প্রতিভাত হল ও শিল্পীর মানসদৃষ্টিতে দেখা দিল মানবচরিত্রের গোপন রহস্য, দৃষ্টিগ্রাহ্য মানুষের আকৃতির অন্তরালে আসুরিক চরিত্রের সংগোপনতা; এই পর্যায়ের যুগান্তকারী সৃষ্টি 'গুয়ের্নিকা' (Guernica), স্বদেশে ফ্যাসিস্ট শক্তিদ্বারা নির্যাতিত মানুষের তরফে উচ্চারিত তুলনাহীন প্রতিবাদ। অন্তরে গভীর মানব দরদের প্রেরণায় শোষক ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার সাম্যবাদী আদর্শে অভিভূত হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাঙ্গারী ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট উৎপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে মোহমুক্ত পিকাসো মানবতাবাদের মধ্যেই সান্ত্বনার অন্বেষণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। দীর্ঘজীবনের বহু ঘটনা ও ভাবপ্রবাহের উজান বেয়ে পিকাসোর মহাযাত্রার অবসান হলেও এই জীবনের সামগ্রিকতা এক অপ্রমেয় বিস্ময়ের আবেদন নিয়ে চিরন্তন কাল ধরে অনুভূতিসম্পন্ন মানুষকে দুর্নিবার্যভাবেই আকর্ষণ করবে। শিল্পসৃষ্টির

পর্যায় পরিবর্তনের মতই পিকাসোর ব্যক্তি জীবনও ছিল একান্ত উপল বিক্ষুব্ধ প্রবল গতিশীল এক স্রোতস্বতীর মত। শিল্পপ্রকল্পের ক্রমোত্তরণের ভূয়িষ্ঠ এই জীবনের দুর্বার প্রবহমানতার এক অনবদ্য চিত্ররচনা করেছেন লেখিকা তাঁর সুনিপুণ বর্ণনা সমারোহে। বহুদূরের বিগতদিনের বিস্ময়কর এই মানুষটিকে লেখিকা যেভাবে তাঁর বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্যপটে উপস্থিত করেছেন, অনুসরণ করেছেন তাঁর জীবনের বাত্যাবিক্ষুব্ধ পথের নানা উত্থান-পতন বহু প্রেম-বিচ্ছেদের গতিপ্রবাহের অত্যন্ত সুখপাঠ্য সে বিবরণকে একান্তভাবেই স্বাগত জানিয়ে এই আশাই প্রকাশ করছি যে বিপুলগতিপ্রবণ বিশ্বের চলমান প্রেক্ষামঞ্চের এই বর্ণাঢ্য রূপচিত্রায়ণকে পাঠক গভীরভাবে উপভোগ করবেন, বিশ্ব সংস্কৃতির এক বিস্ময়কর সমারোহের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটবে।

প্রাচীন সৃষ্টিধর্মী নাটকের সূত্রধারের মতই শিল্পসম্পর্কে একান্ত উপলব্ধিহীন দর্শককে বর্ণ, রেখা ও বস্তুবিন্যাসের রসে সচেতন করে তুলবার দায়িত্ব উপযুক্ত ব্যাখ্যাতার। নিষ্ঠাবান শিল্পীর শিল্পরচনার পশ্চাতে যে বিস্তৃত নেপথ্য বিরাজমান সেই নেপথ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটানই সূত্রধারের দায়িত্ব। লেখিকা নির্দ্বিধায় সেই দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে, পিকাসোর শিল্পের সুবিশাল বিস্তৃতির অন্তরালের মানুষটির সঙ্গে পরিচয় সম্পাদন করে। শিল্পসচেতন রচনা পারদর্শিনী গ্রন্থকর্ত্রী ক্ষণজন্মা শিল্পীর জীবন নিয়ে যে রসাপ্লুত আখ্যায়িকা রচনা করেছেন তাঁর জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসাই তার প্রাপ্য। আমি তাঁকে ঐকান্তিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
অবসরপ্রাপ্ত বাগীশ্বরী অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবেদন

পিকাসো এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। তাঁর চিত্রকর্মের মধ্যে দেশ, কাল, সময় কখনো রেখায় কখনো রঙে নানাবিচিত্র ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রকাশ আমাদের যেমন অভিভূত করে তেমনি তাঁর চিত্রকর্মের ভিতরের ব্যক্তিত্ব মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ভূ-মণ্ডলের স্থানবিশেষের রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন কোন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তখন নির্যাতিত মানুষের পক্ষে তিনি তাঁর চিত্রকরণের মাধ্যমে রঙে ও ব্যঞ্জনায় তাকে মূর্ত করে তুলেছেন। বাস্তব বিশ্বের তিনি যেমন একজন বলিষ্ঠ চিত্রকর তেমনি মানবমনের গভীরে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবোধ প্রতি-নিয়ত অনুরণিত হচ্ছে তার যাদুকরী প্রকাশ তাঁর অসংখ্য বিচিত্র শিল্পকর্মের মধ্যে পেয়েছি। একেবারে প্রথম জীবনের প্রবল উন্মাদনার মধ্যে যে নিবিড় আত্ম-অন্বেষা এবং পরবর্তী জীবনের স্তরে স্তরে তাঁর সেই উত্তরণ আমাদের কাছে এক পরম বিস্ময়। আমরা যদি তাঁর শিল্পীজীবনটিকে নানাপর্বে ভাগ করি তাহলে একাধারে প্রেম, প্রীতি, বন্ধুত্বের সঙ্গে তাঁর শিল্পীমনের সংবেদনশীল সংরাগজড়িত এক অপূর্ব রূপমাধুর্য ও রূপৈশ্বর্যমণ্ডিত জীবনকে দেখতে পাই। প্রচলিত অর্থে সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো দারিদ্র্যের চরম সীমায়, কখনো গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের বিচ্ছেদব্যথায় তাঁকে বারে বারে একক শূন্যতায় নিমজ্জিত করেছে, অন্যদিকে খ্যাতি তাঁকে ধনী করে তুললেও, দেখা গেছে, সুন্দর ও অসুন্দরে তিনি সমরূপে বিচরণ করতে পেরেছেন। এর ফলে তাঁর চিত্রে জাগতিক ও মানবিক যে পরিমণ্ডল পরিপূর্ণরূপে গড়ে উঠেছে সেটিকে তিনি অতি নিপুণ বিন্যাসে জগতের সামনে মেলে ধরেছেন। জীবনের এই বারংবার উত্থান ও পতনে স্থিতধী হয়ে তাঁর সাধনা যেভাবে অবিচল রেখেছেন সেটিও এমন এক স্পর্শাতীত দূরত্ব ও বিস্ময় রচনা করেছে যার ফলে আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর দিকে শুধু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে না।

বাংলা ভাষায় পিকাসো-চর্চা তেমন প্রবল নয় এ বিষয়ে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে মনে করেছি। আমার চেয়েও যোগ্যতম ব্যক্তি একাজ করলে খুশি হওয়া যেত কিন্তু তা না হওয়ায় সীমিত সাধ্যে আমার এই দুর্বল প্রয়াস। স্বরাজ্যে স্বরাট্ এই শিল্পীর জীবনের বহু ঘটনা বিদেশী নানা ভাষায় নানাভাবে রচিত। এখনও তাঁর অনেক শিল্পকর্ম আমাদের অজ্ঞাত।

এই রচনা প্রকাশে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন সাহিত্যিক সম্রাট সেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর সহৃদয়তাকে খর্ব করবো না। বইটি রচনাকালে সাহিত্যিক সুভাষ সমাজদার পাণ্ডুলিপি পাঠ ও নিরন্তর উৎসাহ না দিলে এই শিল্পীর জীবনালেখ্য হয়তো দিবালোকে আসতো না। সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন মাইতিও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও কবিতা সিংহের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় দীপক মোহন সেনের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। রচনাটি 'চিত্রাঙ্গদা'তে ধারাবাহিকভাবে ছেপেছেন সম্পাদক শ্রীঅজিত গুপ্ত। তিনি অনেকগুলি ব্লক দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। ফরাসী নামের যথাযোগ্য বাংলাকরণে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রী গোবিন্দলাল রায়। এছাড়া শ্রীঅনুপ চক্রবর্তী ও তরুণ তালুকদারের নিকট আমি নানাভাবে ঋণী। কাগজ ও ছাপার দৈনন্দিন বিভ্রাটের মধ্যে দুঃসাহসী তরুণ প্রকাশক সত্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় বইটি ছেপে তাঁর প্রগতিশীল ও মহৎমনের পরিচয় দিয়েছেন।

মহাশিল্পী পিকাসোর আসন্ন শতবর্ষের শুভমুহূর্তে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সামান্য উপাচার নিবেদিত হল।

অঞ্জলি চৌধুরী



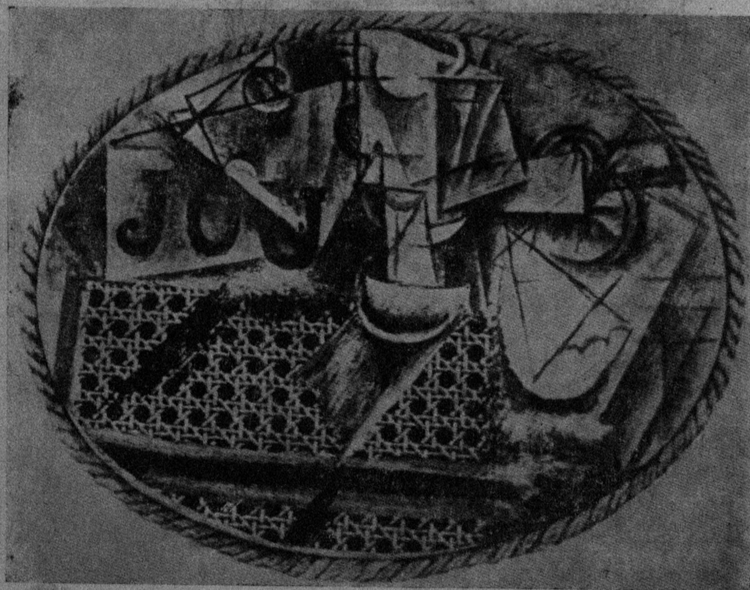
বৃদ্ধ গীটার বাদক (১৯০৩)
তেলরঙ



স্বেচ



'লা দোমোয়াজেল দ্য আভিইঙ' (১৯০৭) তেলরঙ



'বেতের চেয়ারে স্টীললাইফ' (১৯১১—১২)

তেলরঙ ও অন্যান্য উপকরণ



তিন নর্তকী (১৯২৫)

তেলরঙ



যোদ্ধা (১৯৩৩)
ভাস্কর্য



ফ্রাঙ্কোর স্বপ্ন ও মিথ্যা (১৯৩৭)
এচিং



মেইয়্যার প্রতিকৃতি (১৯৩৮)

তেলরঙ

বাল্যকথা : পায়রা : ষাঁড়ের লড়াই

গ্রানাডা তখন স্পেনের রাজধানী। গ্রানাডার উপকণ্ঠে প্লাজা দি-লা-মার্সেড ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-উপকূলে মালাগা শহরের এক কর্মমুখর অঞ্চল। শহরটির অতন্দ্র প্রহরী দু'টি বড় খাড়া পাহাড়। একটিতে আলকাজাবা দুর্গ, অপরটির অল্প দূরে বন্দর। গিরিশ্রেণীর মাঝখানে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রান্তর-জোড়া রমণীয় আঙ্গুরের ক্ষেত ভূমধ্যসাগরে মিশেছে। তাই এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল সান্নিধ্য পেয়েছে তুষারাবৃত এটলাস পর্বতের।

এল উনবিংশ শতাব্দী। শতাব্দীর ঘুমে আচ্ছন্ন সেই নিস্তব্ধ পরিবেশকে বিদীর্ণ করল মানুষ। পাহাড় কেটে গড়ে উঠল বসতি। এই বসতিতে স্পেনের মূর জাতির যাযাবরেরা বাস করতে লাগল। অরণ্য পরিবেশে ওদের জীবন ছিল প্রাণোচ্ছল—নাচ, গান আর হুল্লোড় ওদের নিত্য সঙ্গী। ওরা উত্তাল-সমুদ্রে মাছ ধরতো আর নেশা জমাতো মদে।

শিল্পী পাবলো পিকাসো জন্মেছে স্পেনের মালাগা শহরের প্লাজা দি-লা-মার্সেডে। পাবলোর দাদু ডন দিয়েগোর ছিল দোহারা গড়ন। তার মুখের রেখায় রেখায় কঠিন পরিশ্রমের সংকেত। সহনশীলতা ছিল তার সবচেয়ে বড় গুণ। ডন দিয়েগোর নবম-পুত্র পাবলোর পিতা জোসে রুইয্জ ব্লাসকো। পাবলোর অতীত বংশধরদের সম্বন্ধে অনু-সন্ধানের আর শেষ নেই। কেউ কেউ অনুমান করেন কোগোলুডোর য়ুয়ান দি লিওন ছিল মধ্যযুগের এক নাইট। পাবলোর দেহের শিরায় শিরায় বইতো এই নাইটের রক্তপ্রবাহ।

আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে পাবলোর পূর্বপুরুষেরা মালাগাতে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেছিল। ধর্ম, রাজনীতি,

রণকৌশল সবদিকেই পাবলোর পূর্বপুরুষেরা দেখিয়েছিল দক্ষতা। পাবলোর পিতা জোসে চিত্রশিল্পকে নিজের জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। সে ছিল মালাগার একজন শিল্পশিক্ষক।

ব্লাসকো পরিবারের মালাগাতে বসবাসের প্রায় একশো বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে, জোসে ব্লাসকোর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে নবজাত শিশু কিছুক্ষণের জন্য শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রইল। সকলেই উৎকণ্ঠিত নবজাতকের কান্না শোনার জন্য। কোথায় শিশুর কান্না! প্রাণের কোন স্পন্দন নেই।

জোসের অনুজ ডন স্যালভাডর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে—একটু ধোঁয়া চাই। একটু ধোঁয়া পেলেই আমি শিশুর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারব। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে শিশুর নাকে তামাকের ধোঁয়া ঢুকিয়ে দিল।

ঘুমন্ত শিশু জেগে উঠল। চিৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিল পৃথিবীর বাতাসে রয়েছে তার অধিকার। শিশু জীবন ফিরে পেল অস্বাভাবিকভাবে। অভিভাবকেরা আর দেরি না করে কাছাকাছি গীর্জায় গিয়ে তাকে দীক্ষিত করালো। নবজাতকের ভাগ্য-বিচারের ভার পড়ল জ্যোতিষীর ওপর। বিচারে দেখা গেল সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির মূলমন্ত্র বয়ে এনেছে বালক। জন্মক্ষণেই পাবলো যে আলোড়ন তুলেছিল সে আলোড়ন চলেছিল তার সারাজীবনের অক্লান্ত সাধনায়।

পাবলোর মা কৃষ্ণাঙ্গী ডোনা মারিয়া পিকাসো লোপেজ এক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা। পাবলোর চেহারায় মায়ের ছাপ সবচেয়ে বেশী। পাবলোর মাতামহ ডন ফ্রান্সিস্কো পিকাসো প্রায় দু'পুরুষ ধরে বসবাস করত মালাগাতে। মালাগাতে জন্মালেও বিদ্যাচর্চার জন্য সে পাড়ি দিয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। শিক্ষাশেষে অসামরিক ব্যক্তি হিসেবে কিউবাতে আস্তানা গাড়লো।

পাবলোর মাতৃকুল সম্বন্ধেও মতভেদের অন্ত নেই। কেউ-বা

বলেন ইতালীয়ান বংশধর, কারো ধারণা মেজরকা স্বর্ণকার এদের পূর্বপুরুষ, নয়তো এরা উত্তর আফ্রিকান বা ইহুদীদের বংশধর। পাবলো অবশ্য ইহুদীদের বংশধর নিজে একথা মানতেই চায় না। কেউ-বা বলেন, জিনোয়ার কাছাকাছি রিকোর শিল্পী মাতিওর রক্তধারা বইছে এদের শরীরে। স্যাবার্তে বলেছেন—বাবার দিক দিয়ে পিকাসো বসকু আর মায়ের দিকে ইতালীয়ান—মাইকেল এঞ্জেলো আর ভেলাস-কুয়েজের দেশের মধ্যে সে রচনা করেছে আত্মিক সেতু।

বৃদ্ধা পিতামহীর সঙ্গে ছোটবেলায় পাবলোর যত ঘনিষ্ঠতা। তাকে জাপটে বসে উৎকর্ণ হয়ে রূপকথার গল্প শোনে। কখনো ভয় কখনো-বা অফুরান কৌতূহল। বৃদ্ধা তার গল্পের ঝোলা উজাড় করে দিয়েও বালককে তৃপ্ত করতে পারে না। বাল্যের এই গল্প-শোনার দিনগুলির মধ্যে একসময়ে বালককে অক্ষর-পরিচয়ের জন্য গ্রামের স্কুলে পাঠানো হল। স্কুলের নিয়মের বেড়ি মেনে চলা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

পাবলো কাঁদতে কাঁদতে বললে—স্কুলে যেতে আমার ভাল লাগে না। বন্ধুবান্ধব কাউকেই আমার পছন্দ নয়।

মারিয়া তাকে বুঝিয়ে বললে—দিনকয়েক গেলেই বন্ধুদের সঙ্গে ভাব হয়ে যাবে। তখন তোমার স্কুল যেতে আর খারাপ লাগবে না। লক্ষ্মীটি পাবলো, তুমি আমাদের কথা শোনো।

পাবলোকে জোর করে পরিচারিকার সঙ্গে পাঠানো হল স্কুলে। সারা রাস্তায় সে চোখ মুছতে মুছতে হাঁটতে লাগল। পরিচারিকার কোন কথায়ই সে খুশি হল না। ছুটির পর ফিরে এল বাড়িতে। খাঁচা থেকে সদ্য মুক্তি-পাওয়া পাখির মত তাকে মনে হল। কিন্তু সে রাত্রে পাবলো অসুস্থ হয়ে পড়ল, তাই তাকে স্কুলে পাঠাবার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল।

পাবলোর পাণ্ডুর মুখ দেখে ঠাকুরমা নিজের ছেলেকে বললে—

পাবলো একটু বড় হলেই আপনা থেকে সে স্কুলে যাবে। এ নিয়ে এত ভাবনার কি আছে ?

জোসে কোন কথা বলল না। ভাবলো আর একটু বড় হলেই হয়তো এ সমস্যার সমাধান হবে। সে প্রতীক্ষার একসময় অবসান হল। বালক পাবলোকে আবার একটি বেসরকারী স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল।

না-না-না, আমি স্কুলে যাব না—পাবলো রাগে, দুঃখে ক্ষোভে ফেটে পড়ল।

জোসে উৎকণ্ঠিত। মনে মনে ভাবলো—তবে কি বালক লেখা-পড়ার প্রাথমিক পাঠটুকু রপ্ত করতে পারবে না ?

মারিয়াও উদ্বিগ্ন।

সেদিন সবে ভোর হয়েছে। মারিয়া জোসেকে বললে—কি করে যে পাবলোকে স্কুলে পাঠাবো বুঝতে পারছি না।

জোসে বললে—সে কথা ভাবলে আমিও যে স্থির থাকতে পারি না।

জোসে আর মারিয়ার কথার মাঝেই একসময় পাবলো বিছানা ছেড়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এল। ঘুম জড়ানো গলায় বললে —বাবা তোমার মডেলের একটি পায়রা পেলে আমি স্কুলে যাব।

জোসে তো ছেলের বায়না শুনে অবাক। সে বললে—মারিয়া, পাবলোর আব্দার শুনেছো ? যে ছেলে তুলি ধরতে শেখে নি তার চাই মডেল !

মারিয়াও কম আশ্চর্য হয় নি। তবুও সে বললে—একটা পায়রা নিয়ে পাবলো যদি স্কুলে যায় তো ভালই। তাই দাও না বাপু।

জোসে ভাবলো স্ত্রী তো কথা বলেই খালাস। তার অত সখের পায়রা সে কেমন করে একটা বালকের হাতে তুলে দেবে ! কিন্তু পাবলো তো সব ভাবনা চিন্তার উর্ধ্বে। সবচেয়ে নরম মখমলের মত পায়রাটিকে সঙ্গে নিয়ে সে স্কুলে পৌঁছলো।

ক্লাস শুরু হল।

পাবলোর পড়ায় কোন মন নেই। শিক্ষকের শাসনের ফাঁকে ফাঁকেই পায়রাটিকে দেখে আর মনে মনে ছবি আঁকে। ছুটির ঘণ্টা পড়ার আগেই বন্ধুদের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টির সামনে মডেলের ছবি আঁকা শেষ হল। বাড়ি ফিরে পাবলো দৌড়ে গেল বাবার স্টুডিওতে। মেলে ধরলো স্কেচ। জোসে বিস্মিত।

তুলি আর কলম পাবলোর বন্ধু। আর সে নিজে জোসের। জোসের অবসর-বিনোদনে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যাওয়ার সঙ্গীও হল বালক পাবলোই। ষাঁড়ের লড়াই দেখতে বসে পাবলো বলে—কি দারুণ! ষাঁড়ের প্রতিটি ভাবভঙ্গি আমার চোখে ছবির মত ভাসছে। বাড়ি ফিরেই আমি তোমায় অনেক ছবি এঁকে দেখাবো।

জোসে খুশিতে হাসে। খেলা শেষে বাড়ি ফিরে পাবলোর আর কোনদিকে খেয়াল থাকে না। রঙ, তুলি, পেন্সিল, কাগজ সব ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। নিবিষ্টচিত্তে ধ্যানী ঋষির মত একের পর এক স্কেচ করে। জোসে মুগ্ধ—সে পিতা আর শিল্পগুরু।

বালক বয়সের আঁকা ষাঁড়ের লড়াই ছবিটি এখনও তার স্টুডিওতে রয়েছে। ঐ বয়সেই পাবলো কত সুনিপুণভাবে হলদে, বাদামী, গোলাপী রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে ছবিটিতে। কি রেখা, কি রঙ—সবেতেই পাবলোর মুন্সিয়ানা। শিশু চিত্রপ্রদর্শনীতে তার ছবি দেবার প্রশ্নই ওঠে না। বড়দের আঁকা চিত্রের পাশেই ঝুলিয়ে দেওয়া হত তার ছবি।

পাবলোর বয়স মাত্র দশ। জোসে একদিন ক্লান্ত পায়ে বাড়ি ফিরল। বিমর্ষ মুখ। মারিয়া হাতের কাজ ফেলে স্বামীর কাছে দৌড়ে এসে দাঁড়ালো। উৎকণ্ঠায় বললে—তোমাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

জোসে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রইল। মনে মনে ঠিক করে নিল কথাটা সে কেমন করে স্ত্রীকে জানাবে। সোজা সে জানলা দিয়ে

বাইরে তাকিয়ে নিস্পন্দ গলায় বললে—মালাগা মিউজিয়ামের দরজা সাধারণের জন্য আর খোলা হবে না। কেমন করে এখন সংসার চালাবো ?

কথাটা শুনে মারিয়া চমকে উঠলো। এরই মধ্যে যে লোলা আর কনচিতার জন্ম হয়েছে। তাদের যে মানুষ করতে হবে।

ভারী গলায় জোসে বললে—মালাগা এবার আমাদের ছাড়তে হবে। ভাগ্য পরীক্ষার জন্য করুণনা যাব। পায়রা আর স্পেনের লাল গুল্মের ছবির ক্রেতাও আর তেমন নেই।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের নিয়ে জোসে পৌঁছুলো করুণনা। তুষার আর বৃষ্টি এ নিয়ে করুণনার জীবন। ভূমধ্যসাগরের উজ্জ্বল সূর্যালোক মেঘের আবরণে হারিয়ে গেল। অশান্ত, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বাতাস। কুয়াশা ঘেরা অলস দিন। প্রাকৃতিক পরিবেশ এনে দিল নৈরাশ্য। পাবলো বিমর্ষ। তবুও পাবলোর জীবনে করুণনা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

করুণনাতে এসে পাবলোকে স্কুলে পাঠাবার তোড়জোড় শুরু হল। পাবলোর স্কুলে যেতে ঘোরতর আপত্তি। নতুন অচেনা স্থান। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তেমন ভাব জমে ওঠে নি। কোথায় শিক্ষক ? জোসে কাকে পাবলোর মত ছাত্রের গুরু নির্বাচন করবে ? শিক্ষার এই সঙ্কট মুহূর্তে জোসে এক মরমী শিক্ষকের সন্ধান পেল। গুরুমশাই সাগ্রহে পাবলোর দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন।

শুরু হল বিদ্যাচর্চা। প্রথমদিন গুরুমশাই অনেক মজার কথায় পাবলোকে ভোলাতে চাইলেন। পাবলোর হাবেভাবে কিছু বোঝার উপায় নেই। গুরুমশাই তাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন বলেই মনে হল।

পরদিন যথারীতি এলেন গুরুমশাই। পাবলোর কোন পাত্তা নেই। চারদিকে খোঁজ পড়ল। শেষে তাকে আবিষ্কার করা গেল বাবার স্টুডিওতে। পাবলো বেপরোয়া। পড়াশুনায় তার আগ্রহ নেই। শিক্ষককে এড়িয়ে চলতে পারলেই খুশি।

অভিজ্ঞ, স্নেহপ্রবণ শিক্ষক। ছাত্রের মনোভাব বুঝতে তাঁর বেশী সময় লাগল না। তিনি পাবলোর প্রতিভাকে অঙ্ক শাস্ত্রে কিছুটা কাজে লাগাবার চেষ্টায় নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করতে লাগলেন। ছাত্রকে দিয়ে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে প্রথমে চারটি কিংবা পাঁচটি শব্দ লেখাতে চেষ্টা করলেন। ছাত্র বোর্ডের ধারেকাছে ঘেঁষতে নারাজ। মাস্টারমশাইও পিছপা হবার লোক নন। তিনি সংখ্যাগুলি পাবলোর সামনে নিজেই ধরে ধরে লিখলেন।

পাবলো গভীর মনোযোগ দিয়ে ঐ সংখ্যাগুলির দাগ ও টান লক্ষ্য করে বললে—মাস্টারমশাই আমি নিজেই পারবো ঐ সংখ্যাগুলি আঁকতে।

পড়ায় তার আগ্রহ নেই কিন্তু আঁকার জন্য প্রাণ চঞ্চল। তার লক্ষ্য কেমন করে ঐ সংখ্যাগুলির আঁকাজোখা একটা ছোট্ট পায়রায় রূপ দেওয়া যায়।

ছাত্র অঙ্কের সংখ্যা নিপুণভাবে অনুকরণ করলেও গুরুর কাছে সব সমস্যার সমাধান হল না। তিনি শুধু অনুকরণ বা পায়রার রূপে সন্তুষ্ট নন—ছাত্রকে দিয়ে ঐ সংখ্যার যোগফলও বার করতে হবে। শিক্ষক-মশাই কোন কথা না বলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়ই হোক ব্লটিং এ অঙ্কের উত্তরটি লিখে দিলেন।

পাবলো দেখামাত্র উত্তরটি এঁকে দিল।

গুরুমশাই আহ্লাদে ছাত্রের পিঠ চাপড়ে বললেন—তুমি অঙ্ক জানো। বাকিটুকু আয়ত্ত করতে তোমার বেশীদিন লাগবে না।

ছবি আঁকাকে কেন্দ্র করে মজার খেলায় শিক্ষকমশাই অনিচ্ছুক ছাত্রের শেখার আগ্রহকে বাড়িয়ে তুললেন। আনন্দে পাবলোর প্রাণ চঞ্চল। ঘুরে ফিরে মনে আসে শিক্ষকমশাইয়ের আশার বাণী। কিন্তু সে মুহূর্তের। মনের অবচেতনায় সেই অঙ্কের সংখ্যাগুলি যাদের নিয়ে তার পায়রা আঁকার স্বপ্ন। তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগল—পায়রার চোখ শূন্যের মত, শূন্যের নীচে ছয় সংখ্যা তার নিচে তিন। পায়রার দু'টি

চোখ, দু'টি ডানা। টেবিলের ওপরে পায়রার দু'টি পা বসানো। তারপর লাইন টেনে যোগ দেবার পালা।

শুধুমাত্র সংখ্যার পর সংখ্যা বসিয়ে যোগ দিতেই সে শিখলো না, শিখলো সংখ্যার প্রতীকগুলিকে আঁকার কাজে ব্যবহার করতে।

এর বছর দু' এক পরে করুণনাতে সংখ্যার প্রতীককে কেন্দ্র করে ছবি আঁকার একটা হিড়িক পড়ে গেল। অবশ্যই তা স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। পাবলো সংখ্যার সাহায্যে দু'জন দাঁড়ানো মানুষকে আঁকলো। সাত ও আট সংখ্যা দুটি বেছে নিল বেঁটে ও লম্বা মানুষের চোখ আঁকতে।

করুণনার আঁস্তিটুতো দ্য গারদোর জোসে ছিল শিক্ষক। পাবলো সেখানে ছাত্র। বিদ্যালয় সংলগ্ন জোসের ফ্ল্যাট। মারিয়ার ছেলের দিকে নজর রাখা সম্ভব হল। পাবলো আঁকলো 'খালি পায়ে মেয়ে' 'দুই বৃদ্ধ লোক'। 'খালি পায়ে মেয়ে' পাবলোর প্রতিভাকে জনসমক্ষে তুলে ধরলো। চিত্রকলার জগতে তার অজানা আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা হল।

করুণনা এসেও জোসের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন নয়। তার সবচেয়ে আদরের কন্যা কনচিতা ডিফথিরিয়া রোগে মারা গেল। জোসে অদৃষ্টের ক্রীড়নক। করুণনাতে আর নয়। সন্তানহারা জোসে পালাতে চাইল অন্য কোথাও। কর্মস্থান ঠিক করল বার্সেলোনাতে। সপরিবারে আবার করুণনা থেকে প্রস্থান।

প্রদীপ্ত সূর্যকিরণ। কর্মব্যস্ততা আর গতিতে ভরা জীবন। জোসে পরিবার বার্সেলোনাতে এসে অবসাদের আচ্ছন্নতা মুক্ত হয়ে ফিরে পেল নতুনের স্বাদ। কর্মস্থান আর গৃহ এরই আবর্তে ব্যতিক্রম হয়ে রইল শুধু জোসের জীবন। বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন, নির্বাসিত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল তার বন্ধুদের কৃতিত্ব। তার বন্ধুরা রয়্যাল আকাডেমি অব্ পেন্টিং-এ সভ্য হিসেবে স্থান পেল। জোসে সে সম্মান থেকে বঞ্চিত। অন্তরে পরাজয়ের গ্লানি, জ্বালা, পাণ্ডুর হতাশা। জীবন

মনে হল অর্থহীন। পাবলোর প্রতিভা তখন প্রাতঃকালের সূর্যমুখী। জোসে ছেলের প্রতিভায় মুগ্ধ। নিজের পরাজয় আর হতাশাকে ভুলতে চাইলো পাবলোর মধ্যে।

চোদ্দ বছর বয়সে পাবলোর সেণ্ট্রাল আকাডেমির এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেবার সময়। কঠিন পরীক্ষা। অন্ততঃ একমাস সময় লাগে এ পরীক্ষা শেষ করতে। পাবলো একদিনেই পরীক্ষায় পাশ করে বেরিয়ে এল।

অসাধারণ প্রতিভা পাবলোর। স্থান, কাল, পরিবেশের কোন প্রশ্ন নেই এক্ষেত্রে। তার ছবি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। তার সৃজনীশক্তি বয়স্ক শিল্পীদেরও ঈর্ষার বস্তু—দক্ষ হাতের বলিষ্ঠ তুলির টানে ক্যানভাসের পর ক্যানভাস তখন জীবন্ত।

বার্সেলোনাতে পাবলোর আর মন টিকলো না। যাযাবর-বৃত্তির সহজাত তাড়নায় সে গেল মাদ্রিদে। সঙ্গে রইল সর্বক্ষণের সঙ্গী রঙ আর তুলি। মাদ্রিদে এসে নিজের বিস্ময়কর প্রতিভা প্রমাণিত করল।

তবুও শান্তি নেই। মন উত্তাল। ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান এখানেও মিললো না। অনুভব করল আলো আছে, বাতাস আছে, নেই শুধু প্রাণের স্পন্দন। পরিবেশকে মনে হল রুদ্ধশ্বাস। রাত কাটে বিনিদ্র। যক্ষাবীজাণুর মত দুশ্চিন্তাগুলি যেন মাথাটাকে কুরে কুরে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। বার্সেলোনার 'চার বিড়ালি' কাফেটি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কবি, শিল্পীরা এসে জোট বাঁধতো এই কাফেতে। নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের বৈপ্লবিক নানা মতবাদে কাফেটি সরগরম। বিদ্রোহ স্পেনের সামাজিক ব্যবস্থার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। স্পেন তখন আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে বিধ্বস্ত। অবশ্য বার্সেলোনায় তখনও যুদ্ধের ছাপ পড়েনি। বার্সেলোনা তাই হয়ে উঠল শিল্পপীঠস্থান। পাবলো আবার ফিরে এল বার্সেলোনাতে। আলাপ হল স্যাবার্তের সঙ্গে।

বার্সেলোনাতে তার প্রথম প্রদর্শনী হল। তেমন জমলো না।

এর কিছু পরে নিখিল হিস্পান প্রদর্শনীর প্রদর্শিত একটি ছবি তাকে পুরস্কার এনে দিল।

পাবলো বার্সেলোনার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। খাতা ভরে ওঠে স্কেচে। ক্যানভাসে তুলির টান। কখনো সিরামিক, কখনো প্যাস্টেল —পাবলো আঁকার নেশায় বিভোর। ছবিতে কখনো তুলোজ-লত্রেক, কখনো এলগ্রেকো, কখনো জাপানী প্রিন্ট, কখনোবা রাফাইলের আগের যুগের শিল্পীদের আনাগোনা।

ছবি আঁকে পাবলো। মন তবু উত্তাল। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস তাকে ইশারায় আমন্ত্রণ জানায়। পাবলো উতলা। স্থির করল যাত্রা করবে মোহময়ী প্যারিসের মনোরম শোভা আর শিল্প-সম্পদকে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করতে।

পাবলো বাবা-মায়ের অনুমতি চাইলো। প্রস্তাব শুনে মায়ের চোখে জল এল। তবুও সে পাবলোর ভবিষ্যৎ ভেবে অনুমতি দিল সানন্দে। বাদ সাধলো জোসে। সে যে ছেলের একটা চাকরীর স্বপ্ন দেখেছিল। পাবলো প্যারিসে গেলে সে স্বপ্ন আর কোনদিন সফল হবে না।

পাবলো অনমনীয়। প্যারিস যে তাকে যেতেই হবে। সৃষ্টির তাগিদ যে তাকে প্রতিমুহূর্তে উত্যক্ত করে তুলছে।

অগত্যা রাজী হল জোসে। ছেলের হাতে তুলে দিল তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনের ভাড়া।

সৃষ্টির কাল : প্যারিস যাত্রা

উনিশ বছরেব যুবক পাবলো লা লোনগার স্কুলের বন্ধু পালারে ও অ্যামেচার শিল্পী কাজাজেমাকে সঙ্গী করে রঙীন কল্পনায় যাত্রা করল প্যারিসের দিকে। ট্রেনে সারারাত কাটলো কাঠের বেঞ্চে বসে। শরতের ভোরে তিনবন্ধু প্রথম পা বাড়ালো প্যারিসের রাস্তায়। অজানা দেশ, অচেনা মানুষ। সামান্য কয়েকটি ফরাসী ভাষা সম্বল। প্যারিসে বিশ্বমেলা। শহর ঝলমলে। সুদূর ইউরোপ থেকে সমবেত হয়েছেন কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক। উদ্দাম জীবনস্রোত। ব্যস্ততা আর কোলাহলের মাঝে কালো, রোগা, কোটপরা বাউণ্ডুলে পাবলো এক হাতে পোর্টফোলিও ও অন্য হাতে একটা থলে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মমার্তের পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। চারিদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে পাবলো বললে—বেশ লাগছে পাহাড়ী পথে। মোটা থলথলে ঐ মহিলাকে কেমন পিপের মত দেখতে।

পালারে ও কাজাজেমা হেসে উঠল।

উত্তরদিকে হাত বাড়িয়ে পাবলো বললে—এবড়ো-খেবড়ো জমিতে সোনালী সূর্যের রঙ দেখে মনে হচ্ছে ভ্যান গখের একটা ছবি।

ডানদিকের আঁকাবাঁকা পায়ে চলা সরু গলিগুলি ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে এল। ঘন বসতি। মাঝে মধ্যে লুই ফিলিপ্পি আমলের মত গোটা কয়েক দোতলা, তিনতলা বাড়ি। চাষীদের মাটির ঘর।

পালারে বললে—এখানে সস্তায় আমাদের জন্য একটা ঘর জুটবে নিশ্চয়ই।

কাজাজেমা ভরসা দিয়ে বললে—সে একটা কিছু বরাতে জুটে যাবে তো মনে হয়। যত সব গরীব কেরানী, কারিগর, দোকানদার, চিত্রশিল্পীদের স্বর্গ এই মমার্ত।

কথা শুনে পাবলো বললে—আভঁ গাদ শ্রেণীর ফরাসী ও বিদেশী শিল্পীদেরও এখানে সাক্ষাৎ পাবে। শিল্পজগতে এরা তো একেবারেই অবহেলিত।

কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে চলল। রাস্তার দু'পাশে ছোট বড় কাফে। রেস্তোরার ঝোলানো বোর্ডে লেখা 'সস্তায় ঝোলসমেত ঘোড়ার মাংস।'

কাজাজেমা হাতের পোঁটলাটা রাস্তায় নামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—আর পারছি না ভাই পাবলো পাহাড় বাইতে।

ওরাও একটু বিশ্রাম নিতে দাঁড়ালো। পাবলোর পকেটে ছিল—পিশৎ, ফঁত বোঁ ও ননেল-এর ঠিকানা। ননেল তার 'চার বিড়ালি' কাফের বন্ধু। পাহাড়ের মাঝামাঝি রু গাবরিয়েলে ননেল ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। দেখা হতেই পাবলো বললে—থাকার একটা আস্তানা জুটিয়ে দাও ভাই। খিদেয় যে পেট চুঁই চুঁই করছে।

ননেল তো ওদের দেখে মহাখুশি। গদগদ গলায় বললে—আমার স্টুডিওটা খুব ছোট। আপত্তি না থাকলে সেখানে কোনরকমে মাথা গুঁজতে পারো।

আস্তাবল পেলে বর্তে যাই, তোমার স্টুডিও তো আমাদের স্বপ্ন-রাজ্য। কথাটা বলে পাবলো পালারে আর কাজাজেমার সম্মতির জন্য ওদের দিকে তাকালো।

ননেল-এর স্টুডিওতে জিনিসপত্র কোনরকমে রেখে ওরা বেরিয়ে পড়ল সস্তার একটা কাফের খোঁজে। গরম কফি আর পাউরুটি পেটে যেতেই শরীর ওদের চাঙ্গা হয়ে উঠল।

পাবলো বললে—আমি একটু শহরে ঘুরে বেড়াবো। তোমাদের ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে ভিড়তে পারো।

না ভাই আমি এখন ননেল-এর স্টুডিওতে ফিরে লম্বা একটা ঘুম দেব। সারারাত্রে ট্রেনে যা ধকল গেছে—বললে কাজাজেমা।

পাবলো শহর পরিক্রমা করতে একাই বেরিয়ে পড়ল। ঘুরতে

ঘুরতে এসে দাঁড়ালো ল্যুভর মিউজিয়ামের দরজায়। বহুদিনের স্বপ্ন এই ল্যুভর। গ্রীক, রোমান এবং মিশরীয় শিল্পের ঘরগুলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার কেটে গেল। তবুও আশা মেটে না। এ শিল্পের প্রভাব তার প্রাক্-কিউবিস্ট ও পরে আলেকজান্দ্রিয়ান রীতিকে আলোড়িত করেছিল। লুক্সেমবুর্গ গ্যালারি ঘুরে সে দেখলো ইম্প্রেশনিস্টদের কাজ।

ল্যুভরে যাওয়ার পথে রু লাফিৎ-এর ছবি কারবারীরা তার নজর এড়ালো না। রু লাফিৎ তখন ছিল প্যারিসের ছবি বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র। গ্যালারিতে, গ্যালারিতে ঝুলছে বোনার, মরিস ডেনিস, তুলোজ-লত্রেক, স্টেনলেনের চিত্র। তুলোজ-লত্রেক আর স্টেনলেন তার মনকে এমন নাড়া দিল যা তার নীল পর্যায়ের ছবিতে ছায়ার মত ঘুরতো। যাচাই করা হল সেজান, গ্যগাঁ, ভ্যানগথকে। মন জুড়ে তবুও রইল লত্রেক আর স্টেনলেন। সারাদিন কাটে তার ঘুরেফিরে, বিচিত্র অনুভূতির আলোড়নে।

সন্ধ্যার সময় পাবলো নির্দিষ্ট কাফেতে এসে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়। আলোচনা চলে তুলোজ-লত্রেকের দুরন্ত, উন্মত্ত, ক্লাব, ক্যাবারে, সাইকেল রেসও নাচঘরের সমকালীন জীবনকে নিয়ে আঁকা ছবি ঘিরে। শিল্পীর স্বকীয়তায় যেখানে রেখা ছন্দোবদ্ধ, রঙ উজ্জ্বল।

কাফেতে বসেই পাবলোর একদিন আলাপ হল মিসেস এলিস দেরেয়াঁর সঙ্গে। একসময় এলিসের স্বামী তাকে ও ব্রাককে কিউবিজমের জ্যামিতিক রেখাগুলি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

তারপর রাত?

তাও কোন কোন দিন নিশ্চিন্তে কেটে যায় ক্যাবারেতে নাচ দেখে।

মমার্তে কয়েকদিন কাটাবার পর বার্সেলোনার শিল্পপতির ছেলে ছবি কারবারী পেদ্রো মনিয়াকের সঙ্গে পাবলোর পরিচয় হল। মনিয়াক বললে—তুমি এসেছো ছবি এঁকে কিছু রোজগার করতে, আমিও তোমাদের আঁকা ছবি বিক্রী করে অন্নের খোঁজে এসেছি।

উদ্দেশ্য সকলেরই এক। কিছু হাতিয়ে নেওয়া। ইচ্ছে করলে প্লেস পিগালের কাছে আমার ছোট গ্যালারিতে চলে এসো। তোমায় যদি কিছু সুযোগ করে দিতে পারি।

পাবলো ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। এরপর সময় পেলেই সে মনিয়াকের গ্যালারিতে গিয়ে বসে।

একদিন সন্ধ্যার আলো সবে জ্বলে উঠেছে। মনিয়াকের গ্যালারির ছবিগুলিও জ্বলজ্বল করছে। এক বৃদ্ধা সেখানে ঢুকে মনিয়াককে বললে—আমি গোটা কয়েক ছবি কিনতে চাই।

মনিয়াক পাবলোর দিকে তাকিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে—এই ভদ্রমহিলার নাম মিসেস বের্ত ভেই। ছবি কারবারী। বয়স প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই করছে। তোমার ছবি ওঁকে বিক্রী করতে পারো।

পাবলো নিজের পোর্টফোলিও খুলে কয়েকটা স্কেচ বার করে বের্ত ভেইয়ের সামনে মেলে ধরল।

বের্ত ভেই স্কেচ দেখে পাবলোর মুখের দিকে কিছু সময় তাকিয়ে কি পড়তে চেষ্টা করল সেটা শুধু সেই জানে। তারপর তিনটি ষাঁড়ের লড়াইয়ের স্কেচ নিয়ে পাবলোকে নগদ একশো ফ্রাঙ্ক দিল।

হাত প্রায় শূন্য হয়ে এসেছিল। বের্ত ভেইয়ের টাকাটা খুব উপকারে আসবে ভেবে কৃতজ্ঞতায় পাবলো বললে—আমার ছবি আপনার পছন্দ হলে আমি সব সময় ছবি বিক্রী করতে রাজী।

বেশ কিছুদিন মেলামেশা করে পাবলো বুঝতে পেরেছিল ভদ্রমহিলার এ কারবার সম্বন্ধে মোটেই প্রখর বুদ্ধি নেই। সে মাতিস, ত্যুফি উৎরেলো, মদিলিয়ানি, দেরেয়াঁর ছবি অল্প দামে বেঁচে দিত। মনিয়াক সে সব ছবি সংগ্রহ করে সুযোগ বুঝে বেশী দাম হাঁকতো। পাবলো বেশী দুঃখ পেয়েছিল যখন সে জানতে পেরেছিল এই ছবিপ্রেমিকা ছিয়াশী বছর বয়সে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে কবরে যাবার টাকাটুকুই মাত্র সম্বল রেখে পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছিল।

মিউজিয়াম, প্রদর্শনী আর গ্যালারি ঘুরে ঘুরে পাবলো তার ছবি

আঁকার ধারা প্রায় ঠিক করে ফেললো। কিন্তু যত গোল বাঁধালো খাড়া নাক, চাপা চিবুক, শীর্ণদেহ কাজাজেমা। প্যারিসে এসে সে এক তরুণীকে মনপ্রাণ সঁপে দিল। তরুণী তাকে আমল দেওয়া দূরে থাক তার প্রেমনিবেদনকে উপহাস করে উড়িয়ে দিল।

প্রত্যাখ্যাত কাজাজেমা প্রেমে উন্মাদপ্রায়। নিজের মৃত্যু কামনায় ও সারাদিন মদের নেশায় বন্ধুদের সে অস্থির করে তুলল। এ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য কাজাজেমাকে নিয়ে পাবলো বার্সেলোনাতে ফিরতে মনস্থ করল। ঠিক হল মাসিক একশো পঞ্চাশ ফ্রাঁঙ্কের বিনিময়ে তার সব ছবি পাঠিয়ে দেবে মনিয়াককে। তাই আর পাবলোর প্যারিসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। ফিরে চলল বার্সেলোনাতে। মাত্র তিনমাস তারা প্যারিসে কাটালো।

বার্সেলোনাতে ফিরে কাজাজেমা পাবলোকে বললে—আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না আমার ভালবাসার কথা। আমাকে কেন সে উপেক্ষা করল! আমি তাকে বিয়ে করে ঠিক সুখী করতে পারতাম। সে সুযোগ আমি পেলাম না।

পাবলো বললে—তোমার প্রেমে নিষ্ঠা আছে। তুমি তাকে মন প্রাণ সঁপে দিয়েছো—এ সবকিছুই মানছি। কিন্তু যে তোমাকে স্বীকার করে না, সম্মান দেয় না তার কথা তোমার ভুলে যাওয়া উচিত।

কাজাজেমা অপ্রসন্নমুখে বললে—ভুলে যাও বললেই যদি ভোলা যেত তাহলে আমার এত দুঃখ থাকবে কেন? আমাকে তোমরা বুঝতে পারছো না।

আঘাত মানুষকে বাঁচার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তুমি তোমার শিল্পের মধ্যে বাঁচার চেষ্টা কর।

কাজাজেমা বিরক্ত হয়ে বললে—ওসব তত্ত্বকথা থাক। আমি আবার প্যারিসে যাব। তাকে নতুন করে জানাবো আমার ভালবাসা।

পাবলো বুঝলো কিছুতেই কাজাজেমাকে সে ফেরাতে পারবে না। তাই ঠিক করল ভাগ্য পরীক্ষা করতে একাই যাবে মাদ্রিদে।

এদিকে কাজাজেমা তার প্রেয়সীকে মনোরঞ্জনের বাসনায় ছুটলো প্যারিসে। আবার সে ব্যর্থ হল। চূড়ান্ত অপমানের জ্বালা জুড়াতে বুলভার দ্য ক্লিশীর একটা কাফেতে সে আত্মহত্যা করল।

কাজাজেমার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছুলো পাবলোর কাছে। প্রেমের পরিণতি দেখে গভীর শোকে পাবলো এঁকে ফেললো বন্ধুর অনেক স্কেচ। সেই সঙ্গে আঁকলো 'কাজাজেমার 'সমাধিস্থকরণ ও জীবন'। এ বিষাদের ছাপ তার নীল পর্যায়ের ছবিতেও সুস্পষ্ট।

মাদ্রিদে পাবলো কিছুদিন নিজ পরিবারে কাটালো। তবুও ভাল লাগে না। আলাদা বসবাস করার প্রবল ইচ্ছায় সে চলে গেল ক্যালে জুবারনোতে। ঘরের নড়বড়ে চৌকিটাতে সে বিছিয়ে দিল একটা তোষক। একটা টেবিল, একটা চেয়ার, বোতলের মুখে বসানো একটা বাতি দিয়ে সে স্টুডিও সাজিয়ে ফেললো। জ্বালানী দিয়ে ঘর উত্তাপ রাখার সঙ্গতি নেই। মাদ্রিদের ছ'মাস শীত—ছ'মাস নরক বাসের আয়োজন। বরফঝরা শীতে পাবলো প্রাদো আর টলেডোতে ঘুরে বেড়ায়। টলেডোর সর্বত্র যেন এলগ্রেকোর ছবি। স্মৃতি ভরে থাকে এলগ্রেকোর লম্বা ধরণের মূর্তিগুলিতে।

রাজধানী মাদ্রিদের ওপর ভরসা ছিল অনেকখানি। সেখানেও অর্থাগমের কোন সুযোগ হল না। তাকে ফিরতে হল বার্সেলোনা। সেখান থেকে আবার প্যারিস।

প্যারিস আর বার্সেলোনায় যাতায়াত হল বারকয়েক। শেষে পাবলো হল প্যারিসের বাসিন্দা। প্যারিসের জীবন স্রোতে সে নিজেকে ভাসিয়ে দিল। সহায় সম্বল বলতে কিছু নেই। বাড়ি থেকে আসে সামান্য কিছু মাসোহারা দিন কয়েকের সম্বল। আবার সে যাচাই করল সেজান, দ্যগা, রেনোয়া, অডিলঁ রিডঁ, গ্যগাঁ, বোনার, ভ্যানগখ, তুলোজ-লত্রেক।

প্রায় কপর্দক শূন্য পাবলো। মমার্তের অলিতে-গলিতে উদ্‌ভ্রান্ত

দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় প্লাস ডু থিয়েতে। এখানে ওখানে শিল্পীরা দাঁড়িয়ে ছবি আঁকে। এক যুবক শিল্পী নিয়মিত আসে রঙ-তুলি নিয়ে।, পথচারীদের প্রতিকৃতি আঁকাই তার পেশা। অফিস ছুটির পর ওর প্রেমিকা আসে খাবারের ঠোঙ্গা হাতে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, হাসিতে-খুশিতে ওদের প্রেমের জোয়ার। পাবলো নিশি পাওয়া মানুষের মত রোজ আসে ওদের দেখতে। ঘুরতে ঘুরতে গণিকালয়ের দরজায় উঁকি দেয়। ওদের জীবন দেখে হৃদয় ব্যথায় ভরে ওঠে। এরই ফাঁকে ফাঁকে মমার্ত্রতে একটা সস্তাদরে ঘরের সন্ধান চলে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর মমার্ত্র অঞ্চলে পাবলো একটা ঘর ভাড়া করল। ভাড়া ঠিক নয়—একটু আশ্রয় জুটলো কবি ম্যাকস্ জাকবের ঘরে। এক পায়া ভাঙ্গা খাট জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করা। তার ওপর এক জনের বিছানা।

জাকব বললে—সারাদিন তো কাজের তাগিদে আমাকে বাইরে কাটাতে হয় তখন তুমি তোমার ঘুমের পালাটা সেরে নিও।

পাবলো বললে—সে রকম একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা দরকার। আমার কাজকর্ম বলতে ছবি আঁকা—সেটা না হয় রাত্রেই হবে। দিনের বেলা ফাঁক মত স্কেচ করব। সুখ নিদ্রাটা না হয় রাত্রের বদলে দিনেই হবে। কি আর করা যাবে। হাল তো দু'জনের প্রায় এক।

জাকব একটু করুণ হেসে বললে—জানি তোমার খুব কষ্ট হবে। যতদিন একটা আস্ত ঘর না জোটাতে পারছো আমার এখানেই কাটিয়ে দাও।

এরপর নিয়মমাফিক পাবলো ঘুমায় দিনে আর রাত্রে আশ্রয় নেয় বন্ধুপ্রবর। সারাদিনে এক টুকরো রুটি জুটলে তাই যথেষ্ট। এরই মধ্যে একাগ্রচিত্তে সাধনা চলেছে পাবলোর।

একদিন পাশ ফিরে শুতেই জাকবের ঘুম ভেঙ্গে গেল খাটের

মচমচে আওয়াজে। তন্দ্রার ঘোরে তাকিয়ে দেখলো পাবলো স্থির হয়ে বসে আছে টুলটায়। সামনে সাদা ক্যানভাস। প্যালেটে রঙ।

জাকব বুঝলো ক্যানভাসে রঙ চাপাবার আগে সে গভীর মন দিয়ে ভেবে নিচ্ছে। নিশুতি রাত। জাকব ভাবলো, একটা বিছানা অগত্যা তাই পাবলো অত রাতেও ছবি আঁকছে।

জাকব বললে—পাবলো আমি তো খানিক ঘুমিয়ে নিলাম। তুমি এবার একটু বিশ্রাম কর।

পাবলো হাসলো।

আমার জন্য তোমার ভাবনার কিছু নেই। দিনের বেলা অনেক ঘুমিয়েছি। সারাদিন তোমাকে পরিশ্রম করতে হয়।

জাকবের ঘুম জড়ানো চোখ বুজে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে গভীর ঘুমে নাক ডাকতে আরম্ভ করল।

সাধনামগ্ন পাবলো। রাত কাটে উদগ্র প্রতীক্ষায়। কখন—কখন—পূবের আকাশে জাগবে ভোরের রেখা আর চারিদিকে সোনার আবির ছিটিয়ে দিয়ে কখন উঠবে রক্তপদ্মের মত সূর্য। পাবলোর দুর্যোগদিনের অবসান হবে কবে? পাবলো ছবি আঁকে আর সই করে মায়ের পদবী 'পিকাসো'। আগামী দিনের 'পিকাসো'।

নীল ও গোলাপী পর্যায় : প্রথম প্রণয়

ছবি কারবারী আঁব্রোস ভলারের সঙ্গে পিকাসোর বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। কাফেতে বসে পিকাসোকে সে একটা প্রস্তাব করল—তোমার একটা চিত্রপ্রদর্শনী করব।

প্রদর্শনীর আয়োজন ভলার করলে এতে আর আপত্তি করার কি থাকতে পারে ভেবে পিকাসো রাজী হয়ে গেল। পিকাসো বললে—ঠিক আছে আমি তোমায় কিছু ছবি বেছে দেব।

ভলার বললে—ছবি বাছাইয়ের ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

পিকাসো বুঝলো ভলার তার বাছাইয়ের ওপর পুরো আস্থা রাখতে পারছে না। বয়সে সে নবীন। শিল্পনগরী প্যারিসে যেমন তেমন ছবির প্রদর্শনী করলেই যে হৈ চৈ পড়বে এমন কোন কথা নেই।

পিকাসোর পঁচাত্তরটি ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হল। সাড়া জাগলো প্যারিসে। কিন্তু পিকাসোর অর্থাভাব ঘুচলো না। ওজেফাঁর সোচ্চার অভিনন্দন জানালো—প্রতিভাবান এই ছেলেটি জনতার ভীড়ে কোনদিন হারিয়ে যাবে না।

থমকে থাকার যুবক নয় পিকাসো। বারবার রিয়েলিজম ইম্প্রেশনিজম্, পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম্ দেখা তার শেষ হল। এবার বিস্মিত হবার পালা। তার ছবিতে নীল রঙ-এর টানটোন। কোবাল্ট ব্লু আর ইনডিগোই ছবির প্রধান রঙ।

শুরু হল পিকাসোর ছবির নীল পর্যায়। মমার্তের স্টুডিওতে সৃষ্টি হল 'হার্লেকুইন ও বন্ধুরা' আরো অনেক—অনেক প্রতিকৃতি।

পিকাসোর ছবিতে ঘনিয়ে এল নীল বিষণ্ণতা। নিজের প্রতিকৃতি, আঁকতে গিয়েও সেই নীল বিষণ্ণতার আচ্ছন্নতা। 'গুস্তাভ ককিয়েত,

'জেম স্যাবার্তে'—মদের পাত্রের ওপর স্বপ্নাতুর, 'বালক ও পায়রা' 'নীল ঘর' ছবিগুলিতে সেই নীল রঙ। 'পানশালায় দুই মহিলা'—ছবিটিতে সে দেখালো জীবনের দুঃখ-দুর্দশা। হতাশাকে ভুলতে চায় দুই নারী। ভোলার প্রয়াসে মদের পাত্র রয়েছে সামনে। 'ইন্দ্রিয়রতা' 'উলঙ্গ' 'পশ্চাতের দৃশ্য'—এমনি দারিদ্রের আর কষ্টের প্রতিচ্ছবি।

বছর তিনেক মমার্তে কাটিয়ে পিকাসো রু-দি-র‍্যাভিইঙতে একটি কাঠের সস্তাদরের ভাড়া বাড়ীতে উঠে এল। জাকবের সঙ্গে পিকাসো এখন একই ঘরের বাসিন্দা নয় তবুও জাকব প্রায়ই আসতো তার খোঁজে। এলেই গল্প জমে উঠতো।

জাকব বলতো—বাড়ীটা বড় বেশী ভাঙ্গাচোরা। জায়গাও বড় অল্প।

পাবলো মৃদু হাসতো। একদিন ঘরের চারিদিকে নজর বুলিয়ে বললে—সামর্থ্য অল্প। তার সঙ্গে মানিয়ে কিন্তু ঘরটা বেশ হয়েছে বলতেই হবে।

ঘরটা বেশ একথা আমি বলতে পারবো না। তবে বাড়ীটা দেখতে মন্দ নয়, যেন একটা ধোবার নৌকো। চলছে না অথচ ভাসছে —জাকব বললে।

সেই থেকে পিকাসোর আস্তানার নাম হল ধোবার নৌকো। যাকে কবি, শিল্পী সমালোচক সকলেই বলতো বাতো লাভোয়ার।

এখানে এসেও পিকাসো গভীর ভাবে নীল রঙে আচ্ছন্ন। সে আঁকলো 'দুই ভগিনী'। ক্যানভাস জুড়ে নীল রঙের প্রলেপে দু'বোনের করুণ, বিষণ্ণ চোখে ও অলস বসার ভঙ্গিতে হতাশা জর্জরিত জীবন মূর্ত হয়ে উঠল। সৃষ্টি হল 'স্বল্প-ভোজ'। এচিংটির পটভূমিকা একটি নিম্নমধ্যবিত্তদের কাফে। একটি রুগ্ন, দুঃখী লোক। তার হাড়সর্বস্ব হাত রয়েছে স্ত্রীর কাঁধে। ডান হাতটি টেবিলের ওপর। দুঃখী লোকটি জীবন যুদ্ধে পরাস্ত, ক্ষুধায় কাতর—বসে আছে কাঠের টেবিলের সামনে। তাদের সামনে খালি বোতল, খালি প্লেট। বিষণ্ণতার মূর্ত প্রতীক এই দম্পতিটির জীবন শূন্য, শুষ্ক।

রু-দি-র‍্যাভিইঙতে এসেও পিকাসো নিঃস্ব। প্রচণ্ড খিদের জ্বালা। এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় ঝড় ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে 'স্বল্প ভোজ' এচিংটি নিয়ে পিকাসো ঘুরলো ছবি কারবারীদের দরজায় দরজায়। মাত্র পাঁচ ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে ছবিটি কিনতে কেউ রাজী হল না। অগত্যা অসহনীয় পেটের জ্বালা নিয়েই পিকাসোকে ফিরে আসতে হল ঘরে। আশ্রয় নিতে হয় নড়বড়ে ডিভানে।

বসন্তের শেষে সেদিন প্যারিসে উঠেছিল ঝড়। পিকাসো স্টুডিও ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এল মেঘ। শুরু হল মেঘের গর্জন। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি। অব্যক্ত যন্ত্রণায় বাতাস আর্তনাদ করে চলেছে। ভয়ংকর শব্দে বজ্রপাত হল। এক ঝলক আলো নিমেষে ঠিকরে পড়ল বাদাম গাছে।

যখন আলো ঝলমলে, লোক গিস্‌গিস্‌ মহানগরী প্যারিসের চারিদিকে দুর্যোগ নেমেছে—ঠিক তখন—তখনই বৃষ্টি ঝরা নির্জন রাস্তা ধরে সে এগিয়ে চলেছে।

সে একা।

বড় একা। একক। নিঃসঙ্গ।

আবার মেঘের গর্জন। বৃষ্টি এল মুষলধারে। অক্লান্ত বর্ষণ সামলাতে না পেরে সে দৌড়ে এসে দাঁড়ালো সেই বারান্দায়। তার ঠোঁট পাংশু, বিবর্ণ। সর্বাঙ্গ ভিজে। তার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি। পিকাসো সেখানে পায়চারী করছিল।

তরল অন্ধকারে সমস্ত বারান্দা আচ্ছন্ন। তারি মাঝে পিকাসো এগিয়ে এল। হাসি হাসি মুখ। পাতলা ছিপেছিপে গড়ন। উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দু'চোখ। যেন খাপ খোলা একটা তলোয়ার। মাঝারি উচ্চতা। তার হাতে ছিল ঘন লোমশ ফ্রিকা—ছোট্ট কুকুর ছানা। বৃষ্টি মাথায় করে যে আগন্তুক এসে দাঁড়িয়েছে পিকাসোকে সে চিনেছে। দেখেছে

বহুবার কাফে আর প্রদর্শনী কক্ষে। আগন্তুকের মুখে চাপা হাসি ঝিকমিক করতে লাগল।

তারপর ?

তারপর ওরা অদৃশ্য হল···

ভাঙ্গা সিঁড়ি বেয়ে পিকাসোকে অনুসরণ করে চলেছে আগন্তুক।

ওরা দাঁড়ালো দোতলার বন্ধ দরজার সামনে। পিকাসো দরজা খুললো। আগন্তুকের সামনে উন্মুক্ত হল এক নীল জগৎ। শিল্পীর স্টুডিও। আগন্তুক স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল একি স্বপ্নের দেশ !

পিকাসো তাকে ভিতরে আহ্বান করল। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে গেল। একটা হলঘর, তারি সংলগ্ন ছোট একটা শোবার ঘর। মাঝে মাঝে আস্তর খসে পড়া ধূসর রঙের দেওয়াল। জানলার কাঁচে কোথাও বা নীল রঙের প্রলেপ, কোথাও বা নীল কাগজ। ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে নীল বিবর্ণ আলো আর ঠাণ্ডা বাতাস। ঘরের এককোণে ভাড়াটেদের সাবেক আমলের একটা টেবিল। জানলার ঠিক নীচে ঈজেল। সেখানে আঁটা ক্যানভাসে উলঙ্গ এক নারীমূর্তির পশ্চাতভাগ। ছবিতে রয়েছে নীল রঙের এক আবেশ। মেঝের ধুলোতে গড়াগড়ি যাচ্ছে কাগজের বাণ্ডিল। গোটা ঘরে ক্যানভাসের গাদা।

হলঘরটি পেরিয়ে শোবার ঘর। সেটা জুড়ে একটা ডিভান।

সেখানে ঢুকল ওরা দু'জন।

তুমি কে—পিকাসোর মৃদু কণ্ঠস্বর।

ফেরানডে অলিভিয়ের—আগন্তুক বললে।

ফেরানডের তামাটে কেশ বেয়ে জল পড়ছে। জামাটা গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। দেহের বঙ্কিম রেখায় ফুটে উঠেছে উদ্ধত যৌবন। শীতে তার শরীর কাঁপছে। সিক্ত বসনে ফেরানডে একটু উষ্ণতার কাঙাল। অধরটি স্পর্শাতুর !

পিকাসো তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। অপলকে সে ফেরানডেকে দেখছে। চোখে তার স্বপ্নছায়া। মদির আবেশ। অমোঘ আকর্ষণে

পিকাসো এগিয়ে এল একেবারে তার পিঠের কাছে। আলতো হাতে ফেরানডের কেশগুচ্ছ মুছতে লাগল। মাঝেমাঝে পিকাসোর অসাবধান হাত তার গাল, গলা কাঁধ ছুঁয়ে যায়। নিটোল দেহের পরিপূর্ণ উষ্ণতা। পিকাসো ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠল। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে কামনার জোয়ার আঘাত হানতে লাগল। পিকাসো ভাবলো —আর নয়, আর নয়, ফেরানডের যৌবন সম্ভারকে আর উপেক্ষা নয়।

পিকাসোর বাহুবন্ধনে ফেরানডে থরথর করে কেঁপে উঠল।

পিকাসো ফিসফিসিয়ে বললে—এতদিন কোথায় ছিলে ফেরানডে?

ফেরানডের মুখটা মলিন হয়ে গেল নিমেষে। কাতর গলায় বললে —আমার কি থাকার কিছু ঠিক আছে। দিন চালাই অতিকষ্টে।

পিকাসো তাকে নিয়ে বসল ডিভানে।

বল, বল ফেরানডে। তোমার জীবনের সব কথা আমি শুনবো।

জন্মেছিলাম এক গরীব কারিগর পরিবারে। ছোটবেলায় কাকার সঙ্গে এলাম ল্যুভর মিউজিয়াম দেখতে। বাড়ী আর ফেরা হল না। মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে অভাবের তাড়নায় বাধ্য হলাম এক প্রবীণ ভাস্করকে বিয়ে করতে। কিছুদিনের মধ্যেই স্বামী মারা গেলেন। আবার হলাম নিঃসঙ্গ। বাঁচার জন্য সংগ্রাম চলল।

পিকাসো ফেরানডের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—তাহলে তোমার খুব কষ্ট। কেমন করে তোমার দিন কাটে?

ছবি আঁকতে আমি জানি। আমার কয়েকজন শিল্পীবন্ধু আছে। বিপদের দিনে ওদের সাহায্যেই ব্যুত্-এর শিল্পীদের মডেল হয়েছিলাম।

তোমাকে তাহলে শিল্পীবন্ধুরা বেশ উপকার করেছে?

ওথআঁ ফ্রিস্ ও ছ্যাকির মিসট্রেস হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। লুক্সেমবুর্গের ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীমহলে ক্রমে পরিচয় হয়েছিল। তাছাড়া ফরাসী ভাষাটাও ভাল রপ্ত করেছি। সেটা শিখিয়েও বিদেশী শিল্পীদের কাছ থেকে বাড়তি কিছু উপার্জন করেছি।

পিকাসো ফেরানডের দুঃখের কাহিনী শুনে নিজের কষ্টের কথা প্রায় ভুলতে বসল। মনে মনে ভাবলো!—এমন যার রূপ, এমন সুঠাম যার গড়ন তার কপালে এত দুঃখ কেন!

ফেরানডে ভাবছে অন্যরকম। কি অদ্ভুত শিল্পীর খেয়াল! ক্যানভাসের নীল রঙ গোটা ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছে। যে দিকে তাকানো যায় বিচিত্র নীল আর নীল রঙ। আর ছবির মানুষগুলি কি ভীষণ দুঃখী, জীর্ণ, দীর্ণ।

ফেরানডের সঙ্গে আলাপ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হল পিকাসোর। ফেরানডে হল তার হারেমের ফুল। সে পিকাসোর অভাব অনটন দেখে ভীত নয়। সব কিছুকে মানিয়ে চলতে সে অনেক ছোটবেলা থেকেই শিখেছে।

পিকাসোর ছবি আঁকার বিরাম নেই। নীল পর্যায়ে আঁকা 'বৃদ্ধ গীটার বাদক' এমনভাবে মাথা নীচু করে সুরের মূর্চ্ছনায় আচ্ছন্ন, যা আগামী দিনের কিউবিজমের নিঃশব্দ পদচারণা পূর্বাহ্নে ঘোষণা করল। বাদকের বসার ভঙ্গির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কাটা কাটা বাঁক। কতকগুলি বাঁক বা কর্মের ঐক্যে একটি পরিপূর্ণ কম্পোজিসন।

যে মানুষ একা, দুঃখী, নির্যাতিত, অপমানিত তারাই পিকাসোর নীলপর্যায়ে আপন হয়ে উঠেছে। রুয়োর ছবির আর্তনাদ যদিও ততটা ভয়াবহভাবে নীলপর্যায়ে শোনা গেল না, তবুও সেই বিষণ্ণতা আবার নতুন করে ছবির জগতে ফিরে এল। তার ছবির বিষয়বস্তু ভবঘুরে, ভিখারী, রূপোপজীবিনী।

কিন্তু কত কাল আর দুঃখ!

দুঃখ। দুঃখ থেকে চাই মুক্তি। বাঁচার চাই অধিকার। চিত্রের আঙ্গিকে এল পরিবর্তন। নীলপর্যায়ের অসুখী মা, অন্ধ ভিক্ষুকের দল, অসুস্থ শিশু, উপবাসী ভবঘুরে পরিবর্তিত হতে থাকলো ভাঁড়, দড়া-বাজিকর, ধীরে সুস্থে হেঁটে বেড়ানো খেলোয়াড়ের দলে। এদের মধ্যে রইল না আর নীল পর্যায়ের দারুণ যন্ত্রণা, আছে নিদারুণ যন্ত্রণা

থেকে বাঁচার অভিলাষ। স্বপ্ন আর সুন্দরে গড়া পৃথিবীতে ফিরে যাবার বাসনা, দুঃসাহস। তাদের করুণ, বিমর্ষ চাহনিতে আছে এক কাব্য, রোমাঞ্চ।

বিষয়বস্তু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছবিতে নীল রঙের ব্যবহার কমে এল। গোলাপী রঙ ছবির প্রধান হয়ে উঠল। বিষয়বস্তু আর রঙ নির্বাচনে দেখা গেল ভাব আর টেক্‌নিকের পরিবর্তন। গোলাপী পর্যায়ে ছবির রেখা ও স্টাইল হয়ে উঠল নমনীয়, ধ্রুপদী ও ত্রিমাত্রিকতাপূর্ণ। 'সালতিবাঁকে পরিবার' চিত্রের মানুষগুলি গোলাপী রঙে আচ্ছন্ন। তাদের চোখে স্বপ্ন।

সার্কাস ও গোলাপী পর্যায়ে পিকাসোর ছবিতে এল গতি। গোলাপী রঙে ছবি হল কাব্যময়। একটা স্বাচ্ছন্দ্য, ছন্দ ঘুরে বেড়াতে লাগল ছবির ক্যানভাসে। ভিক্ষুকের দল, বৃদ্ধ বাদক এরা সবাই ধীরে ধীরে রঙীন হয়ে উঠতে লাগল। স্থান নিল সার্কাসদলের ক্লাউনের সজ্জায়, ভাঁড়ের পোশাকে। জাপানী ছবির হালকা রহস্যময় আবহাওয়ায় তারা যেন সবাই আচ্ছন্ন।

বাতো লাভোয়ার

তীব্র শীত। সমস্ত শহর জুড়ে হু-হু করে বাতাস বয়ে চলেছে। বাতো লাভোয়ারের শত ছিদ্র ঘরে সে বাতাস ছড়িয়ে পড়েছে অসীম শীতলতায়। জ্বালানী নেই। তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত সে শীত বিঁধতে লাগল পিকাসো ও ফেরানডের গায়ে। কাজের অবসরটুকু বিছানায় শুয়ে নিজেদের উষ্ণ রাখা ছাড়া উপায় নেই। সে উষ্ণতার ঘোরও কেটে যায়—শীত এত নিষ্ঠুর।

ফেরানডে উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে আকাশ দেখতে চেষ্টা করল। ঘোলাটে আকাশ চুঁইয়ে পড়ছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। নিজের মনেই সে নীচুস্বরে বললে—এমন দুর্যোগের দিন বহুকালের মধ্যে দেখা যায়নি।

পিকাসো তার কথা শুনে বললে—হয়তো এ দুর্যোগ আমাদের পরীক্ষা করছে।

ফেরানডে মিষ্টি হাসলো।

—ভালবাসার পরীক্ষায় আমরা হারতে নারাজ। যত কষ্টই হোক আমি তোমার পাশেপাশে রয়েছি। আপাততঃ একটু জ্বালানীর ব্যবস্থা করা দরকার।

পিকাসো বললে—এবার বোধ হয় শীতে আমরা জমে যাব।

ফেরানডে বুদ্ধিমতী। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে স্টুডিও পার হয়ে সে দরজা খুলে বারান্দায় উঁকি দিল। দেখলো অত শীতেও সেই ছোট ছেলেটি বারান্দায় গুঁটিশুটি মেরে বসে আছে। ছেলেটার বাবা মায়ের পাত্তা নেই। এর ওর ফরমাশ মত কাজ করে কোন রকমে তার চলে যায়।

ফেরানডে তার হাতে একটা চিরকুট দিয়ে বললে—সামনের দোকানে এটা দেখালেই ওরা তোমায় জ্বালানী দেবে। তুমি সেটা নিয়ে আসবে।

ছেলেটি চলে গেল।

ফেরানডে এসে বসলো পিকাসোর পাশে। আলতো হাতে পিকাসোর চুলে বিলি কাটতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যে জ্বালানী নিয়ে ফিরে এল ছেলেটি। ফেরানডে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জ্বালানীটুকু ঘরে তুলে তার কাছে দামের রসিদ চাইলো।

ছেলেটি বোকা চোখে তার দিকে তাকালো। শূন্য হাত ঘুরিয়ে জানিয়ে দিল দোকানদার কোন দাম চেয়ে পাঠায় নি।

ধন্যবাদ ভগবান—বলে সে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করতে এগিয়ে গেল। মনে মনে ভাবলো, জ্বালানীর দোকানের মালিক একবার তাকে প্রেম নিবেদন করতে এসেছিল। আহা রে, বেচারার বুকে এখনও ভালবাসাটা আছে। স্বেচ্ছায়ই সে দামের রসিদটা পাঠাতে ভুলে গেছে। ফেরানডেও তাই চেয়েছিল।

সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল মধুর উত্তাপ। শীতের ভয়াবহতা কাটলো কিন্তু পেটের জ্বালা যে অসহ্য।

গল্পে গল্পে এরা ভুলতে চাইলো সেই জ্বালা। কতক্ষণ যে কেটে গেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ দরজায় একটা মৃদু করাঘাত উঠল। ফেরানডে গা ঝেড়ে ত্বরিতগতিতে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে দেখলো কেউ নেই অথচ ফল ভর্তি একটি ঝুড়ি। সে খুশিতে ফলের ঝুড়ি তুলে নিয়ে বললে—অন্ততঃ দিন দুই এতে আমরা খিদে মেটাতে পারব। মনে মনে ভাবলো, কি আশ্চর্য জ্বালানীর সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে খাবারেরও যোগাড় হল।

পিকাসো ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্মিত। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই সে চীৎকার করে উঠল—আমি জানি পাকো দীরিও আমাদের উপহার দিয়েছে। আমাদের কষ্ট ও সহ্য করতে পারে নি। দীরিও উদার, দীরিও আমার বন্ধু।

দীরিওর উপহারে কোন রকমে পেট চলল দু'দিন। আবার

খিদের যন্ত্রণা। ফেরানডে এক উপায় বার করলে। খাবার এলে এক বারে দাম পাঠিয়ে দেবার কথা জানিয়ে কাছের রেস্তোরাঁতে সে খাবার অর্ডার দিল। বয় খাবার নিয়ে এলে ফেরানডে বন্ধ দরজার ভেতর থেকে বললে—খাবারটা বাইরে রেখে যাও বাছা আমি পোশাক পাল্টাচ্ছি। দামটা পরে পাঠিয়ে দেব।

বয় খাবার রেখে চলে গেল। দামটা আর পাঠানো হল না। দিন কয়েক চলল এভাবে। ফেরানডের ফন্দি বুঝতে দোকানের মালিকের বেশীদিন লাগলো না। সেও খাবার পাঠানো বন্ধ করে দিল।

পিকাসোর এতেও ছবি আঁকার বিরাম নেই। হাত রিক্ত। আঁকার রঙ কেনাও অসম্ভব। আঁকতে আঁকতে ভারী গলায় সে বললে —একটু সাদা রঙ পেলে ফুলের গুচ্ছটা আজই আঁকা শেষ হত। সত্যিই কি খারাপ দিন চলছে আমাদের। না আছে পেটের খিদে মেটাবার সামর্থ্য না আছে মনের। জাগতিক তৃপ্তির জন্য ক্ষুধানিবৃত্তির প্রয়োজন। মনের তৃপ্তি দেবে অপার্থিব সুখের এক অনাবিল আনন্দ। সৃষ্টির মধ্যেই সেই আনন্দ।

ফেরানডে মাঝে মাঝে একটু ব্ল্যাক পুডিংয়ের আয়োজন করে। তাতে খিদে যতটা না মেটে বাড়ে অনেকগুণ।

ফেরানডে পিকাসোকে অনুরোধ জানিয়ে বললে—আমাকে তুমি বাইরে বেরুতে দাও একবার। কিছু উপার্জন করে আনতে পারব নিশ্চয়ই। এ যে বড় কষ্ট।

পিকাসোর তাতে ঘোরতর আপত্তি। পাছে রূপসী ফেরানডে তার হাতছাড়া হয়ে যায়। তেমন দরকার হলে পিকাসো নিজেই থলে নিয়ে ছুটতো বাজারে।

এদিকে ফেরানডেকে লাভের জন্য পিকাসোকে অনেকে ঈর্ষা করতে লাগল। তারা সুযোগ পেলেই বলতো—ফেরানডে সত্যিই সুন্দরী যদিও বয়সে বড়।

পিকাসো গম্ভীর হয়ে বলতো—সে যে সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্যারিসে লম্বা দাড়ি রাখার একটা জোয়ার এল। নতুন ফ্যাসান। পিকাসো তৎপর হল এই ফ্যাসানকে গ্রহণ করে তার দাড়ি পর্যায় ঘোষণা করতে। নিজেও রাখলে দাড়ি। দাড়ি সমেত নিজের মুখ সকলকে দেখিয়ে বলতো—আমাকে লিঙ্কনের মত লাগছে তো?

বাতো লাভোয়ারের জীবনে দুঃখ, দুর্যোগের অন্ধকার থাকলেও পরিবেশ ছিল জমজমাট। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে চুম্বকের শক্তি। শিল্পী বন্ধুদের হাট বসত তার বাড়ীতে। আসতো তার সেই পুরনো-দিনের বন্ধুরা—কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সমঝদারেরা। মানোলো, কবি আপোলিনের, শিল্পী ব্রাক, মারি লোরেঁ সি, পাকো দীরিও, জেরি পিয়েরে সকলেই বাতো লাভোয়ারের ভুবন বিখ্যাত আড্ডার নিয়মিত সভ্য ছিল।

পাকো দীরিও ছুটি কাটাতে চলল বিলবাও। তার স্টুডিওতে গ্যগাঁর খানকয়েক ছবি ছিল। সে সেই স্টুডিও দেখাশোনার ভার দিয়ে গেল মানোলোর ওপর।

মানোলো অত্যন্ত ধূর্ত। কালো চুলের মত মনটাও ছিল তার নিকষ কালো। দীরিওর অনুপস্থিতিতে সুযোগ বুঝে গ্যগাঁর ছবিগুলি বিক্রী করে দিয়ে সে অর্থ আত্মসাৎ করল।

ছুটি শেষে দীরিও স্টুডিওতে ঢুকে আঁতকে উঠল। তার অত সখের গ্যগাঁর ছবির স্থানগুলি খাঁ খাঁ করছে। মানোলোকে সে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলে—গ্যগাঁর ছবি কোথায়?

মানোলো এ প্রশ্নে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে গম্ভীরভাবে জবাব দিল—আমার সামনাসামনি মৃত্যু আর গ্যগাঁ। আমি তাই গ্যগাঁকেই বেছে নিলাম।

ভালমানুষ দীরিও মানোলোর নির্লজ্জ উত্তরে মর্মাহত হল, কিন্তু প্রতিবাদ করল না। দীরিওই একসময় পিকাসোকে নিজের স্টুডিওতে এনে সযত্নে গ্যগাঁর ছবি দেখিয়েছিল। এদিকে মানোলোর সঙ্গে পিকাসোর সম্পর্ক ছিল ছোট ভাইয়ের মত।

স্পেনের পীরেনীজ পর্বতে গোসোল একটা ছোট গ্রাম। সমুদ্র থেকে চার হাজার মাইল উঁচু গোসোলের পাহাড়ী পথে যাত্রীকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র বাহন খচ্চর। পিকাসো গোসোলে বেশ কিছুদিন কাটালো। কাঠকয়লা, প্যাস্টেল ও তেল রঙে চাষীদের ড্রয়িং করা ছাড়াও সে নানাধরনের স্কেচে খাতা ভরিয়ে তুললো। তার আঁকা ছবিগুলি হল সোজা, সরল। স্পেনের কাটালনিয়া অঞ্চলের আদিম শিল্প ও রোমানেসক্ ঐতিহ্যের ছাপ পড়ল ছবিগুলিতে।

পিকাসো গোসোল থেকে ফেরার পর মাসকয়েক সবে কেটেছে। তার আলাপ হল ডাচ্ লেখক শিল পেরুর্তের সঙ্গে। পিকাসোকে হল্যাণ্ডে যাবার জন্য বারবার সে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল।

দেশ আর মানুষ দেখার নেশায় পিকাসো বরাবরই পাগল। একমাসের জন্য সে ছুটলো হল্যাণ্ডে। সেখানকার ভূমির সমতলভাব ও বিত্তশালিনী মেয়েদের মাথা এবং লম্বা গলা দেখে সে মুগ্ধ হল। সে দেশের মেয়েদের গড়ন তার চেয়ে অনেক দীর্ঘ। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে সে তাদের আঁকতে লাগল। তার ভাস্কর্য ও চিত্রের গঠনশৈলী পালটে গেল। ডাচ্ মেয়েদের লম্বাগড়নের ছাপ পড়ল তার শিল্পে। 'ডাচ্ বালিকাটি' চিত্রে নগ্ন মূর্তিটির গড়ন লম্বা ধরনের আর মাথা ঢাকা লেসের টুপি দিয়ে। সারা ছবিতে ধূসর আর গোলাপী রঙ ছড়ানো।

গোসোল আর হল্যাণ্ড ঘুরে পিকাসোর চিন্তাধারা কিছু পাল্টালো। নিজের স্টুডিওতে নজরে পড়ল গারট্রুড স্টেইনের অর্ধসমাপ্ত একটা প্রতিকৃতি। রিয়েলিস্টিক্ প্রতিকৃতির কাজ আর পছন্দ হল না। গারট্রুড স্টেইনকে ফের মডেল হয়ে বসতে হল।

অনেকক্ষণ একটানা বসার পর গারট্রুড বিশ্রাম নিতে একটু ছুটি পেল। সে ফাঁকে প্রতিকৃতি দেখে সে প্রতিবাদ জানিয়ে বললে— আশি বার বসে শেষে আমি আমার চেহারা চিনতে পারছি না। এ তুমি কি আঁকছো?

পিকাসো বললে—একদিন দেখবে এটাই তোমার আসল চেহারা। কতদিন আর পুরনো ধারাকে একটানা অনুকরণ করা যায়!

প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য ও রোমানেসক্ শিল্পের প্রভাব পড়ল প্রতিকৃতিটিতে। সে সঙ্গে মুখের হাড়গুলি হল অনেক স্পষ্ট।

গারট্রুড স্টেইনের প্রতিকৃতির প্রভাবে সে নিজের একটি মুখাবয়ব আঁকলো—যেখানে রেখা ও রঙ সাবলীল, স্পষ্ট। চোখ প্রকাণ্ড, নাক চাপা।

সালোঁ দ্য'তম্ ফোভগোষ্ঠীদের মস্ত আড্ডাখানা। সেখানে হৈ-হৈ, তর্কাতর্কির একটা ঝড় উঠেছে।

সিয়ঁাক ক্ষেপে গিয়ে বললে—আপনাদের স্পর্ধাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না।

ভ্লামিঙ্ক বললে—তাহালে কি মঁসিয়ে, লুই ভাসেলের সমালোচনাই সানন্দে গ্রহণ করছেন?

সিয়ঁাক আরো গলা চড়িয়ে বললে—সালোঁ দ্য ইনডিপেন্ডানসে আপনারা যে ছবির প্রদর্শনী করেছেন তাতে শুধু রঙের ছড়াছড়ি। ড্রয়িংয়ের কোন বাঁধুনি নেই। লুই ভাসেল আপনাদের ঠিক বলেছেন —ফোভ···খাঁচা ভর্তি জন্তু ছাড়া তো ছবি দেখে আমার আর কোন ধারণাই হয় নি!

দেরেয়ঁা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার সে বললে, আমরা এমন কি অপরাধ করলাম ছবি থেকে প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে? পরিসর আর বর্ণবিন্যাসের জন্যই ক্যানভাস। সেখানে প্রকৃতিকে অনুকরণ করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই রাস্তার রঙ সবুজ, বাড়ীগুলি নীল,

গাছগুলি হলুদ, ফুটপাত মেরুণ রঙের হতে অসুবিধা কোথায় ? গোটা ছবিতে উজ্জ্বল রঙের সরল, স্বচ্ছন্দ গতি; রেখা আর নকশা দিয়ে মনের আবেগ, ঘাত-প্রতিঘাতকে ব্যক্ত করতে পারলেই তো সার্থক সৃষ্টি হল। চোখে দেখা জগতের সঙ্গে অমিল থাকলেও নিজের নিয়মে সেগুলি সুন্দর ও মহৎ।

সিয়াঁক দেরেয়াঁর কথা শুনে রেগে লাল। একধারে গারট্রুড স্টেইন বসেছিল সেও ফোভ গোষ্ঠীদের কীর্তিকলাপ তেমন পছন্দ করত না। দাঁড়িয়ে উঠে বললে—চল ভাই সিয়াঁক এঁদের এই আসরে থেকে কাজ নেই।

ওরা সালোঁ থেকে বেরিয়ে গেল।

ফোভগোষ্ঠীদের দলনেতা অরি মাতিস এল একটু বাদে। ঘরের থমথমে ভাব দেখে বললে, কি ব্যাপার সব যে একেবারে ঠাণ্ডা ?

দেরেয়াঁর উত্তেজনা তখনও কমেনি।- তার গলার স্বরটা আপনা থেকে চড়ে গেল—কি বেরসিক এই সিয়াঁক। আমাদের কথা সে কিছুতেই বুঝতে চায় না।

গারট্রুড স্টেইন ফোভগোষ্ঠীদের আঁকার ধরনধারণ ততটা পছন্দ না করলেও নিজে তাদের কয়েকটি ছবি সংগ্রহ করে রেখেছিল। তা ছাড়া সালোঁ দ্যু'তমে পিকাসোকে এনে মাতিসের সঙ্গে সে-ই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। অচিরেই পিকাসোর ছবিতেও পড়েছিল ফোভিজমের প্রভাব।

পরে ফোভগোষ্ঠীর বন্ধুরাই পিকাসোকে নিগ্রো ভাস্কর্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আদিম ভাস্কর্যের সরলতা দেখে পিকাসো মুগ্ধ। তার অঙ্কনরীতিতে হল কিছু পরিবর্তন। ফর্মের দিকে তার মনোযোগ গেল বেড়ে। ছবির উদ্দেশ্য ও ভাষা দৃঢ়তাব্যঞ্জক ও গতিশীল হল। প্রদর্শিত হল 'লা দোমোয়াজেল দ্য আভিইঙ'। পাঁচটি নারীমূর্তির ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃত। কি ভয়ংকর তাদের রূপ। কতকগুলি জ্যামিতিক রেখা দিয়ে ছবিটি আঁকা। প্রাচীন আইবেরিয়ান ভাস্কর্যের প্রভাব রয়েছে বাঁদিকের তিনটি নারীমূর্তিতে। শিল্পী ছবির মধ্যে প্রকাশ

করল আদিম শিল্পের অভ্যন্তরীণ গতিবেগও বলিষ্ঠতা। কিউবিজমের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

সরগরম বাতো লাভোয়ার। বিরামহীন আড্ডা। কবি আপোলিনের ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিকাসোর স্টুডিওতে বসে কাটিয়ে দেয়। বেলজিয়ান্ যুবক গেরি পিয়েরের সঙ্গে তার বেশ ভাব।

পিয়েরে ইনিয়ে-বিনিয়ে মন ভোলানো কথা বলে আপোলিনেরকে খুশি করত। সশব্দ হাসিতে আসর জমাতেও সে ওস্তাদ। মানোলোর চেয়েও সে অনেকবেশী ধূর্ত। আপোলিনের তার চালাকি ধরতে পারলেও পিয়েরেকে একেবারে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ভেবে সে এড়িয়ে যেতে পারত না। পিয়েরে একদিন আপোলিনেরকে বললে, আপনার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা আর ভালবাসা জানাতে আমি কিছু উপহার দিতে চাই। এমন উপহার দেব যা আপনাকে দারুণ খুশি করবে।

এরপর পিয়েরে গেল ল্যুভর মিউজিয়মে। প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টিকে এড়িয়ে ছোট ছোট কয়েকটা মূর্তি চুরি করে সরে পড়ল। ফিরে এসে মূর্তিগুলি আপোলিনেরকে দিয়ে সে চুপিচুপি বললে, যত্ন করে এগুলি লুকিয়ে রাখুন। কাউকে আর দেখাবার দরকার নেই। এগুলি শুধু আপনারই।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না আপোলিনের। সে তারই একটা মূর্তি দিল পিকাসোকে।

তারপর কয়েকবছর পিয়েরে বেপাত্তা। সকলেই প্রায় তার কথা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন পিয়েরে ধূমকেতুর মত প্যারিসে উপস্থিত হল। বেশভূষায় বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আপোলিনেরের সঙ্গে দেখা করে সে বললে—আমেরিকা থেকে ভাগ্য-লক্ষ্মীকে বন্দী করে এনেছি।

আবার মাস কয়েকের জন্য পিয়েরে হঠাৎ-ই কোথায় উধাও হয়ে গেল। ফিরে আবার সে এল আপোলিনেরের কাছে। এবার ভাগ্যলক্ষ্মী তার খাঁচাছাড়া হয়েছে। রুটি জোগাড়ের পয়সাটুকু পর্যন্ত নেই।

একটা কিছু কাজ না পেলে হয়তো অনাহারে মরতে হবে—আর্জি নিয়ে আপোলিনেরের কাছে সে হাজির হল।

আপোলিনেরের মন বেশী সায় দিচ্ছিলো না। কিছু করব না করব না ভেবেও শেষ পর্যন্ত পিয়েরের করুণ মুখ দেখে তাকে নিজের সেক্রেটারীর পদে নিয়োগ করল। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস হঠাৎ 'মোনালিসা'র চোর ধরা পড়ল। সে সঙ্গে ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে পিয়েরে যে সব মূর্তি সরিয়েছে তার জন্যও একটা সোরগোল উঠল।

বেগতিক দেখে পিয়েরে রাতারাতি প্যারিস জার্নালে বছর কয়েক আগে যে সব মূর্তি চুরি গেছে তার ওপর এক রোমহর্ষ তথ্য প্রকাশ করল।

আপোলিনের প্যারিস জার্নাল হাতে নিয়ে পথেই কাঁপতে আরম্ভ করল। প্যারিসের পথে ঘাটে সর্বত্র শুধু পিয়েরের তথ্যের আলোচনা। সে বাড়ী ফিরে এল। হাতদু'টি পিছনে নিয়ে অস্থিরপায়ে দ্রুত পায়চারী করতে লাগল। মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলছে দপদপ করে। বন্ধুবান্ধবের কাছেও একথা বলার উপায় নেই। তার দিন-রাত্রের একই ভাবনা—সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ঘেরাও হয়ে সে জেলে চলেছে।

এদিকে পিকাসো ছুটির দিনগুলি সেরে কাটিয়ে ফিরলো। খবর পেয়ে আপোলিনের দৌড়ে এসে বললে—পিকাসো, প্যারিস জার্নালটা একবার দেখ। আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। হাতকড়া পরতে হবে।

পিকাসোও জার্নালের খবরে ভয় পেল। আপোলিনের যে তাকেও একটা মূর্তি দিয়েছিল।

পিকাসো বললে, একমাত্র বাঁচার পথ হল মূর্তিগুলিকে সেইন নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া।

কি করে? কখন ভাসাবো? —আপোলিনের কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করল।

রাতের অন্ধকারে আমরা দু'জন গোপনে যাব নদীর ধারে। এক এক করে মূর্তিগুলিকে ছুঁড়ে দেব জলে—ভীতস্বরে জবাব দিল পিকাসো।

উদ্‌ভ্রান্ত তাদের দৃষ্টি। ফিস্‌ফিস্ কথার বিরাম নেই। পিকাসো ঘরময় ঘুরতে লাগল।

নিশুতি রাত।

তারা দু'জন।

দু'টি ছায়ামূর্তি।

রাতের অন্ধকারে দু'টি ধূর্ত অভিসন্ধির ছায়ার মত তারা নিঃশব্দে নেমে এল রাস্তায়। রাত্রির বাতাসে স্নান করে তারাগুলি আরো উজ্জ্বল, আরো স্নিগ্ধ। তারা এগিয়ে চলল। হঠাৎ একটা তীব্র আলো এসে ঠিকরে পড়ল। একটু থমকে দাঁড়িয়েই তারা দ্রুত পা চালালো। মনে হল, বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেছে। বুকের ভিতরের ঢিবঢিব শব্দ যেন কানের কাছে বাজছে। তমসাস্তীর্ণ সেইন নদী ছুরির মত ঝিকমিক করছে। জলের কাছে তাদের দাঁড়াবার মতও সাহস নেই। হঠাৎ হু হু করে যেন একটা শীতল জলের স্রোত বয়ে চলল তাদের মেরুদণ্ডের হাড়ে হাড়ে। কিছুতেই মূর্তিগুলিকে নদীর জলে ফেলতে হাত উঠল না। কেন যেন হাত দু'টি ধীরে ধীরে অবশ হয়ে এল। নির্জন জনমানবহীন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে তারা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। স্যুটকেশ হাতে ক্লান্ত পায়ে তারা ফিরে এল। ঘামে ভেজা মুখ। চোখের কোণে কোণে কালি। তাদের এ ঘটনার একমাত্র সাক্ষী ফেরানডে। নির্বাক।

সে কালরাত্রিও ভোর হয়।

সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই আপোলিনের শ্রান্ত দেহে হাজির হল প্যারিস জার্নালের অফিসের দরজায়। জার্নাল অফিসের

সকলেই তার পূর্ব পরিচিত। একে একে মূর্তিগুলি ফিরিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা গোপন রাখতে সে অনুরোধ করল ব্যাকুল হয়ে। শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরলো।

সে ঘটনার সবে চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়েছে। কবির বুকের ভিতরটা তখনও ধুক্‌ধুক্‌ করছে। পুলিশের ভারী বুটের আওয়াজ। দরজায় করাঘাত। সমস্ত ফ্ল্যাট তছনছ হল। তারপর কবিকে পুলিশ ভ্যানে তুলতেও দেরি হল না।

আপোলিনের হয়েছে গ্রেপ্তার, উঠেছে পুলিশভ্যানে, কয়েদীদের নামের তালিকায় তার নাম জুড়ে দেওয়া হবে, অপরাধীদের পাশেই তার ঠিকানা, টাই-স্যুটবিহীন কয়েদীদের পোশাক—ভাবতে ভাবতে কবি ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ল।

কবিকে গ্রেপ্তারের জন্য পরদিন কাগজে কাগজে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। আঁদ্রে বিলি ও আঁদ্রে স্যালমঁ কবিপক্ষ সমর্থন করে আপীল করল কোর্টে। বিমর্ষ আর কালিমাড়া চেহারা নিয়ে আপোলিনের কোর্টে দাঁড়িয়ে সব কিছু স্বীকার করল অকপটে।

পিকাসোকেও জবানবন্দীর জন্য কোর্টে হাজির হতে হল। বিচারকের সামনে এসে কাঠগড়ায় সে দাঁড়ালো। আপোলিনেরের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, মলিন বর্ণ দেখে পিকাসো নিজেকে সংযত করতে পারলো না। আপোলিনেরেরও সেই এক অবস্থা। বন্ধুকে কাঠগড়ায় দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। কাঁদলো পিকাসো অঝোরে।

সমস্ত কোর্ট স্তব্ধ! দু'বন্ধু শিশুর মত সরল। বিচারকের জেরা নীরব হল কবি আর শিল্পীর চোখের জলে।

আপোলিনের বিনা শাস্তিতেই ফিরে এল পাঁচদিন পরে। কিন্তু এ ঘটনা কবির জীবনে আনলো এক বিরাট পরিবর্তন। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া আর নয়। সমাজে চাই নতুন প্রতিষ্ঠা। আপোলিনের নিজের সৃষ্টির মধ্যে ডুবে গেল।

তুআনীয়ের রুশোর সম্মানে একটি ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। স্থান বাতো লাভোয়ার। পিকাসোর আর্থিক অনটনের দুর্যোগ কেটেছে।

রুশোকে পিকাসো আবিষ্কার করেছিল ক্লিমেন্সের প্রতিকৃতি দেখে। ক্লিমেন্স রুশোর প্রথমা স্ত্রী। প্যায়ার স্থুলিয়ের দোকানে মাত্র পাঁচ ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে সে এসেছিল ক্লিমেন্সের ছবি বিক্রি করতে। প্রতিকৃতিটিতে গতানুগতিকতার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখে পিকাসো মুগ্ধ হয়েছিল। আলাপ জমিয়েছিল রুশোর সঙ্গে। একরকম প্রায় জোর করেই সেদিন সে রুশোকে নিয়ে এসেছিল নিজের বাড়িতে।

প্রথম আলাপের দিন থেকেই রুশোকে পিকাসোর বেশ ভাল লেগেছিল। সেই বৃদ্ধ রুশোকে সম্মান জানাতে আজ এই ভোজসভা। আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হল তুহামেল, ব্রঁসে এলবানে, রেমি গু গুরমঁ, পিসারো, সিয়ঁাক, ম্যাকস্ জাকব, ব্রাক, আপোলিনের, দ্যলনে, কয়েকজন জার্মান ব্যবসায়ী ও রুশোর জনাকয়েক ব্যক্তিগত বন্ধু। সকলে চেয়ারে উপবিষ্ট হল। মনে হল একটি বক্তৃতা সভা।

উৎসব কক্ষের প্রবেশপথে একটি পতাকায় লেখা 'রুশোর প্রতি সম্মান।' ভোজকক্ষ জুড়ে টাঙ্গানো ছোট ছোট পতাকা আর গাছের সবুজ পাতা। তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে চীনা লণ্ঠন।

রুশো প্ল্যাটফরমে উঠে হাতজোড় করে বললে—উপস্থিত মাননীয় মহাশয়েরা আমি আমার সম্বর্দ্ধনা সভার উদ্বোধন করছি। আমার কথা শুনুন। বুড়ো হলেও আমি সহজে ক্লান্ত হই না।

শুরু হল তার হাসির গান। প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে গানের সঙ্গে সে বেহালা বাজাতে আরম্ভ করল।

আসর জমে উঠল।

মারি লোরেঁসি বসেছিল একধারে। ফেরানডে বসেছে তার পাশে। চুপিচুপি লোরেঁসিকে বললে—কি উচ্ছ্বাস। সামনে হেলে না পড়লে রুশোর বয়স বোঝার উপায় ছিল না।

উত্তরে মারি লোরেঁসি বললে—কথাটা ঠিক বলেছেন। রুশোর মুখের মধ্যে কেমন একটা হতবুদ্ধি ভাব, অথচ প্রশান্তির ছায়া।

শ্রান্তিহীন রুশো। সে ক্রমাগত নেচেই চলেছে। ফুর্তিতে যখন সবাই মশগুল হঠাৎ ফেরানডের খেয়াল হল ফেলিক্স পোটিঁকে খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়নি।

তার মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। পিকাসোকে কানে কানে বললে—ভোজসভার খাবারের ব্যবস্থা করতে বেমালুম ভুলে গিয়েছি। যে করেই হোক একটু খাবারের ব্যবস্থা কর।

পিকাসো তড়িঘড়ি ছুটলো দোকানে। সঙ্গে নিমন্ত্রিত আরো দু'জন।

রাত নেহাত মন্দ হয়নি। পিকাসো খাবার নিয়ে ফিরে এল। ফেরানডে থালায় সাজিয়ে ফেললো টার্কির টুকরো আর হ্যাম, চিনির পাতলা আবরণে মেরাংগে আর ম্যাকারুণ রাখলো অন্য একটি পাত্রে। প্যাস্ট্রি, পাউরুটি, কেক, জেলি, চাটনী রইল টেবিলের ওপর।

ফেরানডে অতিথিদের উদ্দেশ্যে বললে—আসুন, সকলে মিলে রুশোর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ডিভানের ওপর ছড়াছড়ি আহার্য বস্তু। পেগের পর পেগ গলায় ঢেলে মারি লোরেঁসি একেবারে বেসামাল। স্টুডিওতে সে গড়াগড়ি শুরু করল। জেলি, মাখন, পাউরুটিতে নিজেকে এমন কিম্ভূতকিমাকার করে সাজালো তাই দেখে সকলে হেসে অস্থির। নেশার ঘোরে সে যাকে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরে। মত্ত লোরেঁসিকে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হল তার মায়ের কাছে।

রুশোর অবস্থাও বেগতিক। সেও নেশার ঘোরে নাচে উন্মত্ত। তার টুপির ওপর লণ্ঠনের মোম ক্রমাগত জমতে লাগল। টুপিটা দেখতে হল অদ্ভুত। ঠিক যেন জোকারের টুপি। হঠাৎ সেই টুপিতে আগুন ধরে গেল। বৃদ্ধের তবু হুঁশ নেই। বিচিত্র তার নাচের ধরন।

ব্রাক বাজালো অ্যাকর্ডিয়ন। আপোলিনের আবৃত্তি করল নিজের

কবিতা। কেউ বা গান গাইলো, কেউ বা নেশার ঘোরে বেতালেই পা ফেলতে লাগল।

আঁদ্রে স্যালমঁও ক্রেমনিৎস ক্রমাগত কাঁপতে কাঁপতে প্রলাপ বকতে লাগল। তারা গারট্রুড স্টেইন ও তার মার্কিনী বন্ধুদের অসুস্থতার ভান করে ভয় দেখাতে চাইলো। ওদের দেখে কিছুক্ষণের জন্য আসর থমকে থাকলো। আসলে পানাসক্ত হয়ে তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। স্যালমঁ অবশ্য নিজের লেখায় একথা কিছুতেই স্বীকার করেনি। পরদিন সকালে এলিস টকলাসের টুপি থেকে ঝরে পড়া পালকের ওপর স্যালমঁ ঘুমের ঘোরে গড়াগড়ি যাচ্ছিলো।

রুশোও সেদিন কারো থেকে পিছিয়ে ছিল না। নেশায় বুঁদ। উৎসব শেষে চেয়ারে বসে টলতে লাগল।

পিকাসো অগত্যা তার ফেরার কোন লক্ষণ না দেখে গাড়ি ডেকে পাঠালো। রুশোর সঙ্গী হল গারট্রুড স্টেইন।

গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে বৃদ্ধ টলতে টলতে বললে, ধন্যবাদ পিকাসো। শুভ রাত্রি। পৃথিবীতে আমরা দু'জন সবচেয়ে বড় শিল্পী—তুমি ঈজিপ শন্ আর আমি মডার্ণ আর্টের।

পিকাসোর জীবনে ক্রমে এল আর্থিক স্বচ্ছলতা। প্রতিষ্ঠার পথ মসৃণ। ফেরানডে প্রাচুর্যের সঙ্গে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। নিত্য নতুন বায়নার তার অন্ত নেই। পিকাসোকে একদিন সে বললে—একশিশি সুগন্ধি ফুমির জন্য আমার একশো ফ্রাঙ্ক চাই।

পিকাসো বললে—একশো ফ্রাঙ্ক! মনে মনে ভাবলো ধোঁয়া রঙের ফুমিতে এমন কি মনমাতানো সৌরভ!

সুদৃশ্য ও দুর্মূল্য ফার কোট ফেরানডের পছন্দ। আর এক মস্ত শখ দামী কুকুর পোষা। এজন্য ব্যয় হত প্রচুর। ভিন্ন জাতের কুকুরের সহবাসে সংকরজাতির যে কুকুরের জন্ম হত সে সম্বন্ধে ফেরানডের অসীম কৌতূহল ছিল।

পিকাসো তাই নিয়ে মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠত। শুধু কি তাই! রুটিন বাঁধা ছিল সপ্তাহে অন্ততঃ দু'দিন নিজের খরচে দলবল নিয়ে সিনেমা দেখা। সিনেমায় নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদের পর মিলন হলে দর্শকদের হাততালির সঙ্গে ফেরানডে প্রাণভরে হাসতো। এও তার এক অদ্ভুত ধরণের নেশা।

ফেরানডে নিঃসন্তান।

অবসর সময় সুন্দরভাবে ঘরে কাটানোর জন্য ফেরানডের একটি পালিত কন্যা গ্রহণের খেয়াল হল। পিকাসো এ ব্যাপারে কোন আপত্তি জানালো না।

অনাথাশ্রম থেকে ফেরানডে নিজে একটি বালিকা পছন্দ করে নিয়ে এল। মায়ের স্নেহ দিয়ে মেয়েটিকে সে পালন করতে লাগল। পরীর মত মেয়েটি বাতো লাভোয়ারকে আলো করে ঘুরে বেড়াতো। ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মত তার রূপ।

ম্যাকস্ জাকবের সঙ্গে মেয়েটির বেশ ভাব জমে উঠল। জাকব তাকে একটা ছোট্ট পুতুল দিল। স্যালমঁ দিল একবাক্স লজেন্স।

কিছুদিন কাটতেই ফেরানডে বললে—জাকব, আমি আর পারছি না। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনি ওকে দয়া করে অনাথাশ্রমেই রেখে আসুন।

কথাটা শুনে পিকাসো বিরক্ত হল। মনে মনে ভাবলো ফুলের মত মেয়েটিকে নিয়ে ফেরানডে এরই মধ্যে কেমন করে ক্লান্ত হল। তবুও মুখ ফুটে কিছু বলল না।

অগত্যা মেয়েটিকে ফিরিয়ে দেবার গুরুদায়িত্ব বইতে হল জাকবকে। অনাথাশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ভদ্রলোক জাকবকে জানালো—একবার ফেরত দিলে ওর ওপর আপনাদের আর কোন অধিকারই থাকবে না।

ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছিল এরই মধ্যে মেয়েটি জাকবের বেশ অনুরক্ত হয়ে উঠেছে।

ঐটুকু মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে জাকবের গলা জড়িয়ে ধরে বললে—পাপা ম্যাকস্, পাপা ম্যাকস্, আমায় তুমি ছেড়ে যেও না।

জাকবেব চোখেও জল ছলছল করছিল। মেয়েটিকে খুশি করতে রেস্তোরাঁ, পার্কে, নদীর ধারে সে সারাটা দিন কাটিয়ে দিল। সন্ধ্যা হতেই দু'জনের মুখে নামলো ভয়ের কালো ছায়া।

মেয়েটি কাতর হয়ে জানালো—আমাকে তুমি সঙ্গে নাও। আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না।

জাকব বললে—সে কেমন করে হয়?

কেন হবে না? তুমি জানো আমাকে কেউ নিতে চায় না। আমার কেউ নেই।

আমিও তোমার মত···, বলে জাকব মেয়েটির তুলতুলে গাল টিপে দিল। তারপর অবশ্য মেয়েটির একটি আশ্রয় জুটেছিল।

কিন্তু কে জানে সেটা কোথায়!

ওদের জীবনে এই দুঃখের মুহূর্তগুলি জানলো শুধু সেক্রে ক্যর বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী।

বুলভার দ্য ক্লিশী

ফেরানডে সংসারবন্ধন থেকে অনেকটা মুক্ত হল। নতুন আর পুরনো বন্ধুদের সঙ্গলাভের বাসনা তার মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল। সংসার অবহেলা করে আড্ডার নেশায় তার অনেক রাত ঘরের বাইরে কাটতে লাগল।

পিকাসো ক্ষুব্ধ। কতদিন আর মুখ বুজে থাকা যায়? জীবনটা মনে হল তার মধ্যাহ্নের তপ্ত মরুভূমি। পিকাসো ফেরানডের খেয়াল-খুশিতে প্রতিবাদ করল। ভুল বোঝাবুঝি শুরু হল।

ফেরানডে অসহিষ্ণু। বাঁধাধরা কলহে ফেরানডে পিকাসোকে ছেড়ে চলে গেল অন্যত্র। বিলাসী ফেরানডে ফরাসী ভাষা শিখিয়ে যা উপার্জন করতে আরম্ভ করল তাতে তার দিন চলা অসম্ভব। দিন কয়েকের মধ্যেই সে একটি অলংকার বন্ধক রেখে কিছু অর্থ সংগ্রহ করল। অলংকারটা পিকাসো ভলারের থেকে টাকা ধার করে তাকে কিনে দিয়েছিল।

এদিকে ফেরানডে ছাড়া পিকাসোরও দিন কাটানো খুব কষ্টের বলে মনে হল। সে ফেরানডেকে ফিরে আসতে অনুরোধ জানালো।

ফেরানডেও নিরুপায়। স্বচ্ছল জীবনধারনের বাসনায় একটা শান্তির শর্ত করে ফিরে আসতে রাজী হল।

পিকাসো যেন হাতে চাঁদ পেল। ফেরানডেকে সুখী করতে গরমকালটা স্পেনের হেরতা দু এব্রোতে কাটাতে চলল। তাদের দু'জনের সাময়িক সন্ধিও শান্তিতে সৃষ্টি হল 'হেরতার বাড়ির অভ্যন্তর'।

হেরতা দু এব্রো থেকে ফিরে পিকাসো বুলভার দ্য ক্লিশীর নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এল। বুর্জোয়া ফ্ল্যাট। জল, গ্যাস, আলোর কোন কার্পণ্য নেই। বাড়ির মালিক ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিওফিল দেলকাসে।

প্রায়ই সে এসে দোতলায় থাকতো। অত সুন্দর আসবাবপত্র সজ্জিত ফ্ল্যাটে পিকাসো বাতো লাভোয়ার থেকে কিছু কিছু পুরনো আসবাব-পত্র নিয়ে এল। তাই দেখে প্রতিবেশীরা অবাক। তাদের ধারণা হল এগুলিতে নিশ্চয়ই মূল্যবান জিনিষ অথবা প্রচুর টাকাপয়সা আছে, নতুবা বুর্জোয়া ফ্ল্যাটের আসবাবপত্রের পাশে এগুলির এত কদর কেন ? তখন তারা জানতো না পিকাসো লক্ষপতি হয়েও পুরনো জিনিষের প্রতি মায়া কোনদিন কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই সে লুই ফিলিপ্পি আমলের মত সেকেলে একটা লাল ভেলভেটে মোড়া ডিভান কিনে ফেললো।

বুলভার দ্য ক্লিশীর স্টুডিও থেকে আলো ঝলমলে উঠান, বাগান নজরে আসতো। দরজাগুলি সাজানো বাহারী পর্দায়। পিকাসো কোরোর 'সুন্দরী মহিলার মুখ' চিত্রটি দেওয়ালে টাঙ্গালো। নিগ্রো মুখোশ ও কাঠ খোদাই সাজালো টেবিলে। তাছাড়া এখানে ওখানে পছন্দমতো বাদ্যযন্ত্র গুছিয়ে রাখলো। বাতো লাভোয়ারে আঁকা কিছু ছবি রইল একপাশে স্তূপ করা। বাকি সব ছবির স্থান হল এরমিটেজে নতুন ভাড়া করা স্টুডিওতে।

ফেরানডে শোবার ঘর দেখে উচ্ছ্বসিত। ব্রোকেটের গদি আঁটা পিতলের রেলিং ঘেরা খাট। ঘরে সার্টিনের পর্দা।

বৈঠকখানায় সুদৃশ্য আসবাবপত্রের সঙ্গে মানিয়ে ফেরানডে তার পিয়ানো সাজিয়ে রাখলো। ফেরানডের চালচলনে বিলাসী জীবনের ছাপ সুস্পষ্ট।

ফেরানডে বরাবরই স্বাধীনচেতা। বুর্জোয়া ফ্ল্যাটে এসে সে হতে চাইলো সোসাইটি লেডি। এ বাসনা তার হয়ে উঠল দুর্বার। যোগাযোগের সীমানা হল প্রসারিত। তাই মাঝে মাঝে সে বন্ধুদের চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে অকারণ হুল্লোড়ে সারাটা দিন কাটিয়ে দিত।

পিকাসো আবার মৃদু আপত্তি তুলতে শুরু করল।

ফেরানডের সাঁতার কাটার বাসনা হল। পিকাসোকে সে

বললে—অনেকদিন সাঁতার কাটা হয় নি। কালকেই আমি একটু জলে নামবো।

ঠিক আছে। সে ব্যবস্থা আমি করব। আমি পোয়ারকে খবর দেব—পিকাসো ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিল।

পরদিনই ফেরানডে দীর্ঘসময় পোয়ারের সঙ্গে জলেই কাটিয়ে দিল। পিকাসো তার সোনার এমব্রয়ডারী করা স্কার্ফ হাতে নিয়ে অপেক্ষা করল নৌকোয় বসে।

বুলভার দ্য ক্লিশীর পরিচারিকার কাজের বোঝা কোনদিনই বেশী নয়। মনিব যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে টু শব্দটি করার উপায় নেই। তিনমাসে পিকাসো একদিন তার ছবির সব সরঞ্জাম সরিয়ে দিয়ে ঘর ঝাড়পোঁছের ব্যবস্থা করে দিত।

ফেরানডের অফুরন্ত অবসর। টারকিশ সিগারেট, চা আর লাইব্রেরীর বই—এ নিয়ে তার দিন কাটে। ইচ্ছে হলে রঙ তুলি নিয়ে বসে। অফুরান অবকাশ আবার তাকে বাইরের নেশায় পাগল করে তুললো। সংসারের প্রতি বাড়তে লাগল অনীহা। ফেরানডের অবহেলা, অন্যমনস্কতা ও মানসিক অশান্তিতে পিকাসো ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। এবার সে অভ্যাসের কিছুটা রদবদল করতে বাধ্য হল। দিনের বেলায় কখনোসখনো বাড়িতে বসে ছবি আঁকতো নয়তো এরমিটেজের স্টুডিওতে।

সন্ধ্যা হলেই পিকাসো বাড়ির বাইরে। ঘরে তার আর আকর্ষণ নেই। ফেরানডে তখন বাইরে। পিকাসো আর্ট গ্যালারি ঘুরে কাফেতে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা সেরে নতুন স্টুডিওতে কাটিয়ে দিত। যে রাত্রে বুলভার দ্য ক্লিশীর বাড়িতে সে ফিরতো ফেরানডের সঙ্গে মামুলী দু'চারটে কথা হত।

জীবন ও চিন্তাধারার ব্যবধান দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়ে তুলতে লাগল। তবুও প্রকৃতির নিয়মে দিন বয়ে চলল। ঠিক এসময় লুই মারকুশ ও তার স্ত্রী মারসেল উমবেয়ার হল ওদের সঙ্গী।

ফেরানডে ভাবলো ওদের সান্নিধ্যে যদি নিজেদের সম্পর্কের ফাটলটা বুজিয়ে দেওয়া যায়।

লুই মারকুশ ও মারসেল উমবেয়ার প্রায়ই তাদের বাড়িতে আসতো। একদিন ফেরানডে বললে—চল না ঘরে বসে গল্প না করে একটু ঘুরে আসি।

লুই মারকুশেরও সেই ইচ্ছা। সে বললে—চলুন, এই সুন্দর বিকেলটাকে স্মরণীয় করতে মেড্রোনায় যাই।

ওরা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। মেড্রোনায় বসে পিকাসোকে বেশ উৎফুল্ল মনে হল। সে বললে—কি চমৎকার! মনে হচ্ছে জন্মভূমিতে ফিরে এসেছি। ঐ ছেলেটা আর মেয়েটা কি অপূর্ব নাচছে।

ফেরানডে বুঝলো মেড্রোনায় স্পেনীয় স্টাইলের নাচ দেখে পিকাসোর স্বদেশের কথা মনে পড়ছে। এভাবে মেড্রোনা শেষে প্রায়ই তারা রেস্তোরাঁ না হয় এরমিটেজের স্টুডিও ঘুরে বাড়ি ফিরতো।

নতুন বন্ধুদের সঙ্গ লাভে পিকাসো ও ফেরানডের পারিবারিক কলহ অনেকটা কমে এল। ফেরানডে একটু শান্তি পেল।

পিকাসোর মনের ভাবনা বইছে তখন ভিন্নখাতে। তার শিল্পী মন—যে মন প্রতিনিয়ত রূপ-রসের সন্ধানী, যে মন প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনের আশায় লালায়িত, সে মনের শান্ত, নরম, মিষ্টি, তন্বী-গড়নের মারসেল উমবেয়ারের নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন হতে সময় বেশী লাগল না। পিকাসো মারসেলের স্বভাবের মধ্যে এক অনাবিল মাধুর্যের সন্ধান পেল। হৃদয়ে মারসেলের জন্য হাহাকার। ফুলের মত মারসেলকে ঘিরে তার কামনা বাসনা আলোড়িত।

দ্বিতীয় প্রণয়

ইতালী থেকে কয়েকজন ফিউচারিস্ট শিল্পী এল। তারা প্রায়ই আসতো পিকাসোর এরমিটেজের স্টুডিওতে। পিকাসো তাদের কাছে পেলে আর ছাড়তে চাইতো না। শিল্পী জিনো স্যাভিরিন, উবালদো অপি ফিউচারিস্ট চিত্রাদর্শের প্রচারে বেশ তৎপর ছিল। বহুদিন থেকেই পিকাসো সম্বন্ধে উবালদোর জানার একটা প্রচ্ছন্ন বাসনা ছিল। এবার সে সুযোগ পেয়ে কখনো এরমিটেজে কখনো বুলভার দ্য ক্লিশীর বাড়িতে আনাগোনা করত। একদিন উবালদোর সঙ্গে ফেরানডের আলাপ হল।

ফিউচারিস্ট শিল্পীরা উগ্র গঠনমূলক মনোবৃত্তি অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা আর তার শক্তির জয়গানে মুখর। তারা গতির পূজারী। তাদের সঙ্গে শিল্প আলোচনায় পিকাসোর দীর্ঘসময় কেটে যেত। তারও তাই কাম্য। ফেরানডেকে আর তার পছন্দ নয়। ঘরের বাইরে সময় কাটাতে পারলেই সে খুশি।

এরমিটেজে চলল তার নিভৃত সাধনা। মডেল তার মারসেল উমবেয়ার। ফেরানডের এরমিটেজে যাওয়া তখন প্রায় নিষিদ্ধ।

সেদিন গোধূলি ধূসর। প্রকৃতি প্রায় অন্ধকারের ছায়াঘেরা। গারট্রুড স্টেইন যাচ্ছিলো এরমিটেজের স্টুডিওর পাশ দিয়ে। একবার সে পিকাসোর স্টুডিওতে উঁকি মারলো। পিকাসো তখন আত্মস্থ হয়ে বসে আছে একটা অসমাপ্ত ছবির সামনে। ছবিটিতে একজায়গায় কাব্য করে লেখা—ও মানঁ মা জলি মঁ ক্যর তে দি বঁঝুর অর্থাৎ ও আমার মিষ্টি হৃদয়, তোমাকে সুপ্রভাত জানাই।

গারট্রুড স্টেইন নিঃশব্দে পিকাসোর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—মিষ্টি হৃদয় কে ?

পিকাসো যেন স্বপ্নের আবেশে উত্তর দিল—আমার হৃদয়, আমার কল্পনা, আমার প্রেমিকা।

গারট্রুড স্টেইন পিকাসোর স্বপ্নভঙ্গ করতে চাইলো না। সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল।

পিকাসোর এই কাব্যের কথা ফেরানডের জানতে বেশী সময় লাগল না। মারসেল উমবেয়ারের হদিশও সে আজকাল ঠিকমত পাচ্ছিলো না। মারসেলকে নিয়েই যে পিকাসোর কাব্য এ ব্যাপারে ফেরানডে সুনিশ্চিত হল।

আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত জানিয়ে কালবৈশাখীর মেঘ ফেরানডের সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করতে লাগল। হতাশা আর ঈর্ষায় সে জ্বলে উঠল। প্রতিশোধের স্পৃহায় সে জানিয়ে দিল—সপ্রতিভ, সুন্দর, মিষ্টভাষী উবালদো অপিকে আমি পছন্দ করি। সে আমাকে ভালবাসে।

পিকাসোও তাকে বললে—শান্তি পেলাম, নিশ্চিন্ত হলাম।

ফেরানডে বললে—তোমার সংসারের দায়দায়িত্ব আর আমি নিতে পারবো না। উবালদোকেই আমি চাই।

ফেরানডে উবালদো অপির সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা শুরু করল। ভাবলো, পিকাসোকে তুষের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করতে হবে। সে প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠবে, আবার সে ফিরে আসবে তার কাছেই। মনে মনে তার প্রতিজ্ঞা যে করেই হোক পিকাসোকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

সব ভাবনাই কি সার্থক হয়? অলক্ষ্যে সেদিন বিধাতাপুরুষ হেসেছিলেন।

উবালদোর সঙ্গে ফেরানডের মেলামেশায় পিকাসো খুশিই হল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পরিবেশ বদলে উদ্‌যোগী হয়ে সে মারসেলকে নিয়ে সেরে চলে গেল।

পিকাসো আদর করে মারসেলকে ডাকতে লাগল ইভা। ইভা তখন পিকাসোর চোখের মণি।

মারসেলের স্বামী হতভাগ্য শিল্পী মারকুশ ঘটনার বিন্দুবিসর্গ আঁচ করতে পারে নি। মারসেলকে ভালবেসে সে ডাকতো 'পেপে'। সেই 'পেপে'র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তার কাছে গন্ধধূপের মত সুরভিত করে রইল খানকয়েক ফটো—তন্বী, জাপানী পোশাকে উজ্জ্বল গড়ন, শান্ত, ধীর দৃষ্টি, পাংশু ঠোঁট, প্রাচীন রোমান মেয়েদের মত কেশবিন্যাস। আর রইল—

রইল—ভালবাসা আর বেদনার বুক ভরা অশ্রু।

সেরের আকাশে বাতাসে তখন বসন্তের সমারোহ। নীল আকাশ। সবুজ পাতার গাছে গাছে বিচিত্র ফুলের সম্ভার। ইভাকে নিয়ে পিকাসো তখন নির্জনতার জন্য লালায়িত। অথচ সেরের ছোট ছোট বোহেমিয়ান কলোনীগুলিতে ইতিমধ্যে মমার্তের শিল্পীগোষ্ঠীর অনেকে এসেছে হাওয়া বদলের লোভে। জুয়াঁ গ্রি, ব্রাক ও তার তরুণী স্ত্রী মারসেলও সেরে এসেছে।

ফেরানডে দিনকয়েক বাদে সেরে এসে হাজির। পিকাসোকে সে জানালো গভীর হতাশার কথা। ফেরানডেকে অসম্মতি জানিয়ে পিকাসো গারট্রুড স্টেইনকে চিঠিতে লিখলো—ফেরানডের সৌন্দর্যের প্রশংসা করি। কিন্তু ওর খামখেয়ালীর সঙ্গে নিজেকে আর মানিয়ে নেবার কথা ভাবতে পারি না।

সেরে থাকাকালে পিকাসোকে কেউ কেউ ফেরানডের কথা তুলে বিব্রত করত। তাই সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে গোপনে পিকাসো ইভাকে নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সের আভিইঙতে চলে গেল। এরপর পিকাসোর সঙ্গে ফেরানডের আর কোনদিন দেখা হয় নি।

শুরু হল ফেরানডের বৈচিত্র্যহীন জীবন। মিসেস গারট্রুড স্টেইনকে সে পছন্দ করত। মনের দুঃসহ জ্বালার কথা জানিয়ে ফেরানডে তাকে চিঠিতে লিখলো, কেমন করে নিজের কথা বলি, আত্মগ্লানির অসহনীয়

বেদনা। আমি ক্লান্ত। বড় ক্লান্ত। ওদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ইভা নিশ্চয়ই পিকাসোকে ভালবাসে।

সামনের পথ পিছল। বিপুল অর্থাভাব। এলোমেলো, মলিন পোশাক। অতি সাধারণের মত ফেরানডের দিন কাটতে লাগল। বিচ্ছেদের চব্বিশ বছর পরে নিজের জীবনের সমস্ত আবেগ, অফুরন্ত ভালবাসাকে উজাড় করে দিয়ে সে লিখলো 'পিকাসো এবং তার বন্ধুরা'। এঁকে দিল বিগত জীবনের প্রেমিকের চরিত্র।

জীবনের শেষ আট বছর আর ফেরানডের কাটতে চায় না। বাত আর নিউমোনিয়ায় সে শয্যাশায়ী। চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল অসীম দুঃখ, দুর্দশা। আত্মগ্লানির অপচ্ছায়ায় ও বিক্ষোভে ছটফট করতে করতে বললে—আমি হতভাগিনী। ভগবানের কি নির্মম পরিহাস। আমাকে বাঁচাও। মুক্তি দাও। আমি আর এ কষ্টের বোঝা বইতে পারছি না। আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। আমাকে মুক্তি দাও। ভগবান, আমি মুক্তি চাই।

ব্রাকের স্ত্রী পিকাসোকে অনুরোধ জানালো, ফেরানডেকে কিছু আর্থিক সাহায্য পাঠাবার জন্যে। হয়তো সে সাহায্যেই তার জীবনের শেষ দিনগুলি কেটেছিল। এমনও হতে পারে পিকাসো তাকে সাহায্য করার কথা মোটেই আমল দেয়নি। বার্ধক্যভাতার ওপর নির্ভর করে অসুস্থ, পঙ্গু, নিঃস্ব ফেরানডে মৃত্যুর দিনটির অপেক্ষায় প্রহর গুণছিল।

দু'চোখে জ্বালা। জ্বালা ফেরানডের সমস্ত শরীরে। ঘুম নেই। রোগজীর্ণ দেহ। ছেঁড়া জামা। নীরবে, নির্জন ঘরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সে একদিন চোখ বুজলো। শুকিয়ে যাওয়া বেগুনী ঠোঁটে বিচিত্র হাসি। লোভনীয় সেই চুল পাটের দড়ির মত বিছানায় ছড়িয়ে পড়ল। সারা ঘরে মৃত্যুর হিম-শীতলতা। অবশ ডানহাতে মণিমুক্তাখচিত একটা আয়না। সুখের দিনের পিকাসোর উপহার। তবে কি সে কারো ফেরার প্রতীক্ষায় ছিল?

ফেরানডে মুক্তি পেল। মুক্তি পেল তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। কবরের স্নিগ্ধ ছায়ায় নিশ্চিন্তে সে ঘুমালো। জুড়ালো তার সকল জ্বালা।

কিউবিজম্

সেরে ছেড়ে পিকাসো এবং ইভা তখন আভিইঙতে। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের মনে হল আভিইঙর পরিবেশ নিতান্ত শুষ্ক। কোন আকর্ষণ নেই। ছ'মাইল উত্তরে সরগী যাবার জন্য আবার তারা ট্রেনে উঠল। দু'পাশে সারি স্যারি কমলালেবু গাছ। পথঘাট নিরিবিলি। যানবাহনের কর্কশ শব্দ নেই, দ্রুত গতি নেই। তারা ঘর ভাড়া করল নব্বুই ফ্রাঙ্ক দিয়ে লে ক্লোসেতে। এরই কাছাকাছি একটি ভিলাতে ব্রাকদম্পতিও এসে হাজির হল। ম্যাকস্ জাকবও কিছুদিন পরে মিলিত হল এদের সঙ্গে।

ইভাকে পেয়ে পিকাসো তখন আনন্দে ভরপুর। ব্রাকের সঙ্গে প্রায়ই সে মিলিত হত।

চোখে তাদের নতুন আঙ্গিকের স্বপ্ন।

শুরু হল পিকাসো ও ব্রাকের নেতৃত্বে কিউবিজমের ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তারা পৃথক কাজ করত। ভিন্ন স্টুডিও। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপ্লব, চিন্তায় নতুন বলিষ্ঠতা। বস্তুর গভীরতা থেকে বেরিয়ে এল আবেগ। নানা ফর্মের প্রকাশ হল প্রধান ও সহজ। ছবি হয়ে উঠল বস্তুনির্ভর। ফলের প্লেট, ম্যানডোলিন, তামাকের প্যাকেট, বাঁকা নল রূপকে প্রকাশিত হল। আলোর ভূমিকা গেল কমে। তারা নিগ্রো আদিম ভাস্কর্যের অনুশীলন করে যে কিউবিক রীতির সন্ধান পেল তার সঙ্গে যুক্ত হল সেজানের বস্তুর বিশেষ উপলব্ধি। সেজানের ছবিতে যে ছোট ছোট সমতল বা স্তরের ভাগ ছিল পিকাসো সেগুলিকে করল আকারে বড়। তাই বিষয়বস্তু কতকগুলি কিউব, কোণ, সিলেণ্ডারে ভরে গেল। মানুষের নাক হল একটা প্রিজম, চোখদুটো ত্রিকোণ। কপালে বা গালে যে রঙের তাল রইল তাতে

ছোট বড় অনেক সমতল। জ্যামিতিক আকার এল ছবিতে। ছবির বিষয়বস্তুকে টুকরো টুকরো করা হল। এই টুকরোগুলি ক্রমে করল তাদের স্থান বদল। কানের স্থানে চোখ, চোখের স্থানে নাক। শেষ পর্যন্ত আসল চেহারার সঙ্গে রইল না আর সাদৃশ্য। সোজা সোজা কতগুলি রেখা দিয়ে বাঁধা রইল রঙের টুকরো। তারা ভাবলো শক্তিই সৌন্দর্য। বক্ররেখার চেয়ে সরলরেখা অনেক শক্তিশালী।

কাঠকয়লা দিয়ে পিকাসো পর পর কিছু স্কেচ করল। এরপর শুরু হল রঙীন কাগজ কেটে রঙের সংক্ষেপ করে চিত্র রচনা। শিল্পী ব্রাকের কাজও একই ধারায় বইতে লাগল। একযোগে তারা শিল্পের এক নতুন দরজা খুলে দিল। পিকাসো ও ব্রাক কিউবিজমের পুরোধা হিসেবে স্বীকৃতি পেল।

রঙীন টুকরো কাগজ থেকে আবিষ্কৃত হল বিভিন্ন ফর্ম, নানা ডিজাইন, ছায়া ও বুনট। সৃষ্টি হল কোলাজ কিউবিজম্। কালো কাগজ কেটে গীটারের ছায়া দেখিয়ে আসল গীটারের ইলিউঝন্ সৃষ্টি করা হল। বিভিন্ন বস্তুর আকারকে নানা রঙ ও নানা আকারের কাগজ কেটে বোঝাতেই শিল্পীর ঝোঁক গেল বেড়ে। কখনো কখনো এই ছবির ওপর অক্ষর বসিয়ে দেখতে লাগতো অনেকটা তামাকের প্যাকেটের লেবেলের মত। নানা রকম রূপক, হাসি-ঠাট্টার একটা মিষ্টি আমেজ ছড়িয়ে পড়ল ছবির মধ্যে। 'বেতের-চেয়ারে স্টীল লাইফ' ছবিটির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন অক্ষর মিলিয়ে 'জানালিস্ট' শব্দটি। কিছু রঙীন কাগজের টুকরো। আস্তে আস্তে ছবি বাস্তবধর্মিতা থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। ফলে কিউবিজমের মাধ্যমে বিমূর্ত বা এ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণাগুলি ক্রমশঃ প্লাসটিক আর্টে রূপান্তরিত হল।

রঙ এখন গঠন বা আলোর প্রকাশক। পরবর্তীকালে এ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রে রঙ হল মুখ্য—গুরুত্বের দিক দিয়ে বিষয়বস্তুর সঙ্গে রইল সমান ওজন।

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য হোক অথবা নতুন প্রেমের উত্তেজনায়ই

হোক পিকাসো আবার নব উত্তমে শিল্পের গবেষণায় ডুবে গেল। সে কানওয়েলারকে চিঠিতে লিখলো—আমার আদরের ইভা, ইভাকে আমি ভালবাসি। আমার ছবির মধ্যে সে অমর হয়ে থাকবে। এখানে রান্না ঘরের দেওয়ালেও আমি ইভার একটা ছবি এঁকেছি।

পিকাসো ইভার ন'টি ছবির মধ্যে কোন কোনটাতে কাব্যের ছন্দে লিখলো—'পাবলো ইভা', 'জলি ইভা', 'মা জলি' এমনি আরো ইভার কত প্রশস্তি।

লে ক্লোসেতের রান্নাঘরের দেওয়ালে ইভার যে ছবিটি ছিল সেটা পিকাসো মুগ্ধ হয়ে দেখতো। একদিন বেরসিক বাড়িওয়ালার নজরে সেটা পড়ল। সে পিকাসোর কাণ্ডকারখানা দেখে রেগে আগুন। ভাবলো দু'চারদিনের জন্য ভদ্রলোক হাওয়া বদলে এসে তার কি সর্বনাশটাই না করলে। অত ঝকঝকে রান্নাঘরের দেয়ালটাকে দিল নষ্ট করে। ভদ্রলোকের শাস্তি হওয়া উচিত। বাড়িওয়ালা রান্নাঘরের দেওয়ালে চুনকামের জন্য পিকাসোকে জরিমানা করে বসল।

ওদিকে পিকাসোর চিঠি পেয়ে কানওয়েলার একদল বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে দিল লে ক্লোসেতে। তারা রান্নাঘরের দেওয়ালের ছবিটির অনুলিপি সংগ্রহ করতে এসেছিল।

লে ক্লোসেতে বসেই পিকাসো কিউবিজমের অনেক বিস্ময়কর সৃষ্টি করল। আবার তারা ফিরলো সেরে। সেরে থাকাকালে স্পেনের সান্নিধ্য তাকে পাগল করে তুললো। ম্যাকস্ জাকবকে নিয়ে মাঝে মাঝে সে সীমান্ত পার হয়ে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যেত। এরই ফাঁকে পিকাসো এবং তার বন্ধুরা কিছুদিন এক ভ্রাম্যমান সার্কাস দলের ভাঁড় ও মেয়েদের নিয়ে মেতে রইল। কিউবিজম্ পদ্ধতিতে এদেরও কিছু কিছু চিত্র সৃষ্টি হল।

আর তখন—ঠিক তখনই ভরপুর আনন্দের মাঝে বার্সেলোনা থেকে সংবাদ এল পিকাসোর পিতা আর ইহলোকে নেই।

বিশ্বযুদ্ধ : হতাশা

বেজে উঠল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা। পিকাসো সেরে ছেড়ে ইভাকে নিয়ে আবার আভিইঙর পথে পা বাড়ালো। এবার তাদের সঙ্গী ব্রাক ও দেরেয়ঁা।

যুদ্ধ ঘোষণা হতেই ব্রাক ও দেরেয়ঁা পিকাসোকে জানালো— আমরা বিদায় নিচ্ছি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের যেতে হবে। মহাযুদ্ধ থেকে ফিরলে আবার দেখা হবে।

তল্পিতল্পা গুটিয়ে তারা রওনা হল রাজধানীর উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে যুদ্ধের নির্দেশে যেখানে যেতে হয়। পিকাসো অশ্রুসিক্ত চোখে ভারাক্রান্ত মনে বহুকষ্টে বন্ধুদের বিদায় দিল।

পিকাসো জন্মেছিল স্পেনে, বাস করত প্যারিসে। প্রতিভার স্ফুরণ যদিও ঘটেছিল প্যারিসে তবু সে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার কোন তাগিদ অনুভব করেনি। হয়তো বা ইভার প্রতি গভীর প্রেম তাকে এ সর্বনাশা যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বন্ধুদের বিদায় দিয়ে পিকাসো অসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে বন্দী হয়ে রইল। ইভাই তার একমাত্র সঙ্গিনী। সে ইভাও তখন ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত।

বন্ধুরা চলে গেল যুদ্ধে। সেই নিঃসঙ্গতায় যা সৃষ্টি হল তাকে সমালোচকেরা বলল—'রকোকো কিউবিজম্'। চিত্রগুলি থেকে হাস্য-রসিকতার হালকা পরিবেশ সরে গিয়ে মানুষের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যহীন বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। শিল্পের এই বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ সুররিয়ালিজম্ চিত্রাদর্শের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেল।

আভিইঙ ছেড়ে পিকাসো এবার আর মমার্ত অঞ্চলে ফিরলো না। নতুন করে বাসা বাঁধলো মঁপারনেসে ২৪২ নং বুলভার রাসপেইয়ে। মাত্র কয়েকমাস এখানে কাটিয়ে আবার উঠে গেল রু শলসেরে বিরাট স্টুডিও সংলগ্ন বাড়ীতে।

ইভা বিমর্ষ, মলিন। পিকাসোর অত আদরের ইভা বিছানায় শয্যাশায়ী, সর্দিতে প্রায় রুদ্ধ শ্বাস। পিকাসো তখন ইভার প্রেমে অস্থির, উদ্বেল।

এদিকে প্যারিসের সব কিছুই পিকাসোর মনে হল অপরিচিত। সর্বত্র সর্বনাশা যুদ্ধের বিভীষিকা। কোথাও একটু শৃঙ্খলা নেই। এক-ফোঁটা শান্তি নেই। যুদ্ধের নতুন নতুন খবরে সকলেই ভীত, সন্ত্রস্ত। ইভার অবস্থা অবনতির শেষ ধাপে।

ইভার রোগনির্ণয় হল। এতদিনের ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসা ভুল বলে প্রমাণিত করে ডাক্তার বললে—ইভার শরীরে ক্ষয়রোগের বিষাক্ত বীজাণু বাসা বেঁধেছে।

পিকাসো কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—ক্ষয়রোগ! আমার ইভা কি তবে আর বাঁচবে না? উৎকণ্ঠায় পিকাসোর চোখের কোণে বিষণ্ণ কালিমা।

ডাক্তার রোগীকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টায় ব্যর্থ হল। পিকাসোর কাব্যময় জীবন থেকে ইভা হারিয়ে গেল চিরকালের মত।

বন্ধুরা সকলেই প্রায় বিচ্ছিন্ন। সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। গভীর শোকে মিসেস্ গারট্রুড স্টেইনকে দু'ছত্র লিখে পিকাসো জানালো—আমার ইভাকে হারিয়েছি। তাকে বাঁচাতে পারলাম না। আমি পারলাম না। কি যে হল। আদরের ইভা আমার পরম বিশ্বস্ত ছিল। মাত্র ছ' সাতজনের উপস্থিতিতে ইভাকে আমি অন্তিম শয্যায় শুইয়ে এলাম।

রু শলসেরে ইভা নেই। নেই তার মৃদু পদসঞ্চরণ। পিকাসো একা। চারিদিকে গভীর শূন্যতা। মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম। ছবি আঁকতেও তত ভালো লাগতো না। বন্ধুদের অনেকেই তখন বিশ্বযুদ্ধের নির্ভীক সৈনিক। ব্রাক কারেঁসীতে অসুস্থ। আপোলিনের বেরী অ বাকে মাথার আঘাতে আহত অবস্থায় ফ্রাঙ্কো-ইতালীয়ান

হাসপাতালে। একে ইভার মৃত্যু তার ওপর বন্ধুদের এ সংবাদে পিকাসো উদ্বেগে চঞ্চল। দরিদ্র জুয়াঁ গ্রি রইল মমার্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। গ্লীজ, হুলনে, মারি লোরেঁসি ও তার স্বামী স্পেনে গিয়ে ছোট্ট একটা কলোনী গড়ে তুললো। একমাত্র কানওয়েলার তখন নিরাপদ আশ্রয়ে সুইজারল্যাণ্ডে।

কানওয়েলার ওদিকে সুইজারল্যাণ্ডে বসে পিকাসোর কথা ভাবছিল, যুদ্ধের ডামাডোলে শত্রুপক্ষ যদি পিকাসোর সব ছবি বাজেয়াপ্ত করে নিজেদের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে তাহলে কি হবে?

পুরনো বন্ধুদের কাছ থেকে পিকাসো একেবারে বিচ্ছিন্ন। নতুন শিল্পীদের সান্নিধ্য খুঁজলেও কিছুতেই তাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলো না। বাদামী রঙের বর্ষাতি গায়ে, মাথায় কাপড়ের একটা টুপি চড়িয়ে সন্ধ্যার সময় সে হাজির হত কাফে রাতঁদে। স্বল্পান্ধকার ঘরে বসে নিঃশব্দে সকলের আনাগোনা লক্ষ্য করত। কখনো সখনো নিজের মনেই দু' চারটি কথা গুনগুনিয়ে উচ্চারণ করত। নয়তো বা বিড়বিড় করত পাশের লোকটির উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার কথা কে শুনলো আর না শুনলো সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। হাসি তো তার মুখ থেকে সেই কবেই ইভার মৃত্যুর পর নিঃশেষে মিলিয়ে গিয়েছে।

গাব্রিয়েল ফুরনিএর একদিন পিকাসোকে দূর থেকে লক্ষ্য করল। সেদিন পিকাসো গভীর নিঃসঙ্গতার অতলে ডুবে ছিল। বাইরের চেতনা লুপ্ত। হঠাৎ তার চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল। দেখলো একজন কমরেডের জামায় পিন করা রঙীন ফিতে। পিকাসো নিজের মনেই বললে—সবুজ ডুরের মধ্যে হলদে রঙটা আমার চোখে লাল ঠেকছে। নিশ্চয়ই ওটা লাল।

গাব্রিয়েল তখন পায়ে পায়ে পিকাসোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমগ্ন হল।

এ সময়ের নিঃসঙ্গ আর একক ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যে একমাত্র

ভাস্কর গারগালোই তার আন্তরিক বন্ধু। মাঝে মাঝে সে পিকাসোকে রুশ অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিত। গারট্রুড স্টেইনও এসময় ইংল্যাণ্ডে কিছুদিন কাটিয়ে প্যারিসে ফিরে এল।

ইভার মৃত্যুর পর রু শলসেরে বাস করা পিকাসোর কাছে অসহ্য। বাড়ী বদলের চেষ্টা করে মরুজে ছোট বাগান ঘেরা একটা বাড়ীতে সে উঠে এল। তবুও দুঃসময় তার প্রতি পদে পদে জড়িয়ে চলল। এখানে বাড়ী বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্ট কয়েকটি ভাস্কর্য নষ্ট হয়ে গেল। কিছু পোশাক-পরিচ্ছদও চুরি হয়ে গেল। পিকাসো বেশ হতাশ হয়ে পড়ল। ভাবলো পোশাকের বদলে কয়েকটি ছবি চুরি হয়ে যাওয়াই বরং ভাল ছিল। তাতে নিজের খ্যাতি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকতো না।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দিনকয়েকের জন্য সে স্পেনে ঘুরতে গেল। ফিরে এসে দেখে তার স্টুডিওতে এক হাঁটু জল। নতুন করে আবার সে বিষণ্ণবোধ করল। একাকীত্বের অসীম বোঝাটা পাথরের মত বুকে চেপে রইল। ছবিগুলি হল ভালবাসার আবেগ বঞ্চিত। ইনগ্রেসের রীতিতে আঁকলো ম্যাকস্ জাকবের মুখাবয়ব। ককতোর মুখাবয়বে পড়ল কিউবিজম্ চিত্রাদর্শের ছাপ।

পাহাড়ী মেয়ে ইরেন আর সুন্দরী পাকুয়েরেট মাঝে মাঝে আসতো পিকাসোর কাছে। তারা আসতো তাদেরই যৌবন-সম্ভার উজাড় করে শিল্পীকে খুশি করতে। কিন্তু সেই দুর্জ্ঞেয় মনের সহচরী তো তারা হতে পারে না। সম্ভব নয়।

তাই পিকাসো—

একা।

বড় একা।

অশান্ত, বিক্ষুব্ধ আর নিরাকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন তার জীবন।

তৃতীয় প্রণয় : ব্যালের জীবন : পরিণয়

গ্রীষ্মের দাবদাহে উত্তপ্ত, রুক্ষ আর নীরস পৃথিবীকে স্নিগ্ধ ও সরস করে তুলতেই আসে বর্ষা। আকাশ জুড়ে আষাঢ়ের মেঘে মেঘে দেখা যায় বর্ষার অভিসার। সেই অঝোরধারা যেমন বিধাতার স্নিগ্ধ করুণার মত অবিরল ধারায় নেমে আসে তেমনি—ঠিক তেমনি মর্তের অভিশাপের ভেতর স্বর্গের আশীর্বাদের মত নেমে এল জঁা ককতো। শীতের শুরুতে হঠাৎই সে প্যারিসে উপস্থিত হল।

ককতো চিরসবুজ। আঠাশ বছরের তরুণ—তীক্ষ্ণ নাক, উজ্জ্বল গভীর নীল চোখ, ঘন ভ্রূ, চওড়া কপালে গোলাকার চুলের ছাঁট। ককতো উচ্চাকাঙ্খী, খ্যাতির প্রতি লালসাদুর্বল, বাক্যবাগীশ, কবিতার দক্ষ যাদুকর। সমবয়সীদের আসর জমিয়ে রাখতো মিষ্ট কথায় আর রসিকতায়। হতাশাক্লিষ্ট পিকাসোর মনে সে ফিরিয়ে আনলো জীবনের গতি। ককতো তাকে রুশ ব্যালে দলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে পোশাক ও মঞ্চসজ্জার গুরুদায়িত্ব দিল। সেই সুবাদে পিকাসো চলল রোমে।

ঈর্ষা, খামখেয়ালী, হাস্যরসিকতায় পরিপূর্ণ ব্যালের জীবন। সম্পূর্ণ তার অপরিচিত। তবুও শিল্পীর নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢেউ উঠল। মহড়ার মুহূর্তগুলিতে বসে বসে সে মূর্তি গড়ত! মঞ্চ ও পর্দার দৃশ্য আঁকতো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই ককতো, দিয়াঘিলেফ এবং মাসিনের একত্র সমাবেশ ঘটত। আলোচনা চলত মূর্তি, পোশাক ও মঞ্চসজ্জার অঙ্কন দেখে। কিউবিজমের ধারা এখানেও চলল মঞ্চসজ্জা ও পোশাক রচনায়। কিন্তু তা অল্পকালের জন্য।

রোমে এসে পিকাসো সিস্‌তিন ও ভাটিকান্ গীর্জা দেখার সুবর্ণ সুযোগ পেল। এ সুযোগের অবহেলা করার সাধ্য তার নেই। সরাসরি পরিচয় হল তার মিকেলানজেলো ও রাফাইলের সঙ্গে।

নিগ্রো ও পলেনেশিয়ান শিল্পের প্রভাব মন থেকে সরে গেল। রাফাইলের কাজের মধ্য দিয়ে ইনগ্রেস রীতিতে সে ফিরে এল। পালাজো থিওডোরির দেওয়াল বাস্তবধর্মী ড্রইং-এ ভরে তুললো। রোম আর নেপল্‌সের প্রভাব পড়ল তার চিত্রে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অল্পদিনের মধ্যে সে ফ্লোরেন্স দেখা সেরে ফেললো। পম্পাই ও ফ্লোরেন্সের স্মৃতি তাকে নতুন ভাবে উৎসাহিত করে তুললো। কিউবিজমের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা থেকে সে ফিরে এল ধ্রুপদী বাস্তবতায়।

অল্পদিনের রোম বাস তার শিল্প ও ব্যক্তিগত জীবনের ধারাকে বইয়ে দিল ভিন্নখাতে। দিয়াঘিলেফের দলের ব্যালে নর্তকী অল্‌গা কথ্‌লভার সঙ্গে তার আলাপ হল। অল্‌গা মার্কিনী একটি মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য নির্বাচিতা হয়েছিল। গোলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষের মেয়ে। জাতে রুশ। তার নিরীহ চালচলন আর পরিমিত ব্যবহার পিকাসোর মনকে নাড়া দিল। আলাপ ক্রমশঃ পরিণত হল গভীরতায়।

কথায় কথায় অল্‌গা পিকাসোকে বললে—আমি বেশ কিছুদিন আনডালুশিয়াতে ছিলাম। মালাগাতে আমার অনেক আত্মীয়-স্বজনেরা এখনও রয়েছে।

পিকাসো অল্‌গার মধ্যে জন্মভূমির নির্যাসে তৃপ্ত হল।

দিয়াঘিলেফ অল্‌গার সঙ্গে পিকাসোর এই মেলামেশা মোটেই পছন্দ করল না। পিকাসোকে দিয়াঘিলেফ পরিহাসচ্ছলে বললে—তুমি কি একজন রুশ নর্তকীকে বিয়ে করতে চাইছো?

নর্তকীর আন্তরিকতা সম্বন্ধে দিয়াঘিলেফের সন্দেহ ছিল। কিন্তু সেদিন পিকাসোর আর কারো কথা শোনার অবকাশ ছিল না। মন দেয়ানেয়ার কাজ তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

ব্যালে নৃত্যের অনুষ্ঠান শেষ হল। আরো সকলের সঙ্গে পিকাসোকে ভালমন্দ নানা সরব সমালোচনার ভাগীদার হতে হল।

কিন্তু কোন কিছুই আর তার মনে রেখাপাত করে না। অল্‌গার চিন্তায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন। সে-সঙ্গে স্পেনের আহ্বানে মন চঞ্চল।

অল্‌গাকে নিয়ে সে স্পেনের পথে পা বাড়ালো। পিতার মৃত্যুর পর এই প্রথম সে স্পেনে এসে পৌঁছুলো। বৃদ্ধা মা মারিয়া ছেলেকে আদরে বুকে টেনে নিল, কিন্তু সন্দিগ্ধদৃষ্টি বোলাতে লাগল অল্‌গার দিকে।

পিকাসো তাকে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে—অল্‌গা কথ্‌লভা তোমার ভাবী পুত্রবধূ।

মারিয়া ছেলের মতোই অল্‌গাকে আদর করে বুকে টেনে নিল ছেলেকে খুশি করতে। কিন্তু মায়ের মন সন্তুষ্ট হল না। অল্‌গার বুর্জোয়াস্বভাব লক্ষ্য করে মারিয়া দিনকয়েকবাদে নিরিবিলিতে তাকে বললে—অল্‌গা তুমি কি সত্যিই পিকাসোকে বিয়ে করবে?

অল্‌গা কথা শুনে সলজ্জদৃষ্টি মাটিতে নামিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল—আমি পিকাসোকে পছন্দ করি। তাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

মারিয়া বললে—পিকাসোকে তুমি পছন্দ কর সন্দেহ নেই কিন্তু তার বোহেমিয়ান স্বভাব মানিয়ে চলতে পারবে তো?

এবার অল্‌গা হেসে উত্তর দিল—আমি তার স্বভাব আমূল বদলে দেব। আমার মত তাকেও বুর্জোয়া ধাঁচে গড়ে নেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা সুখী হব।

মারিয়া বুঝলো পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে তার শংকিত হবার কোন কারণ নেই। তাদের ভালমন্দ বোঝার মত যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। তবুও মায়ের মন কেন জানি আশংকায় কেঁপে উঠল।

পিকাসো অল্‌গাকে 'চার বিড়ালি' কাফের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল! স্পেনের নানাস্থানে ঘুরিয়ে তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করল। শেষে প্যারিসে রু-দারুর রুশ গীর্জায় করুতো, দিয়াঘিলেফ ও আপোলিনেরের উপস্থিতিতে পিকাসো অল্‌গাকে স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি

দিল। গীর্জার গোঁড়া নিয়মকানুন মেনে সাক্ষী তিনজন বর ও কনের মাথায় সোনার মুকুট তুলে ধরল। উৎসবটি নির্বিঘ্নে শেষ হল।

উচ্ছ্বসিত সুখে তারা বিভোর। মধুযামিনীর দিনগুলি কাটাতে তারা চলল বিয়ারিৎজ। সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করল যুদ্ধকালে পিকাসোর সবচেয়ে বড় ছবি কারবারী মাদাম ইরাজুরির কাছে। ইরাজুরি বাস করত চিলিতে। যুদ্ধের প্রাক্কালে সে চলে এসেছিল বিয়ারিৎজ।

বিয়ারিৎজের সমুদ্রের ধারে যুদ্ধের কোন কোলাহল নেই। পিকাসো-দম্পতি এখানে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বিয়ারিৎজে তখন ছবি কারবারী পল রোজেনবার্গ এসেছিল সপরিবারে। পিকাসোর সঙ্গে এদের দেখা হত প্রত্যহ। কারুকার্যকরা একটা চেয়ারে মিসেস্ রোজেনবার্গকে শিশু কোলে বসিয়ে পিকাসো তার ছবি আঁকলো। আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি সে আঁকলো—'স্নানরতা বালিকারা'। তাদের পশ্চাৎভাগে বিয়ারিৎজের লাইট হাউস। বালিকাদের কৃত্রিমভঙ্গি তার ম্যানারিস্ট ছবিগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। একটি দাঁড়ানো বালিকার শরীর এমন অদ্ভুতভাবে দুলছে যার সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ দর্শকের সামনে প্রকাশিত! শরীরের এই গতি ও ভঙ্গি অবশ্য তার পূর্বের ম্যানারিস্ট ছবিগুলিতে নেই।

বিয়ারিৎজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবি 'স্নানরতা'। রেখার কমনীয়তা, সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবিধি তাকে পৌঁছে দিল উন্নত ক্ল্যাসিক্যাল গ্রাফিক আর্টে। ছবির জমিতে পনেরোটি বিবস্ত্রা বালিকা সহজ ও সুন্দরভাবে ঘোরাফেরা করছে অথচ কোথাও কোন অবান্তর ভীড় বা জটিলতা নেই। অবশ্য কিছু জটিল ড্রয়িং সে এ সময় আঁকলো, তার বিষয়বস্তু প্রণয়িনীর জানলার নীচে প্রেমিকের গান গাওয়া।

এরপর পিকাসো সাদা দেওয়ালে কিছু ম্যুরাল ছবি আঁকলো। দুটি নগ্ন নারীমূর্তির মাঝখানে একটি ফুলদানী—সেখানে লেখা আপোলিনেরের কবিতার কয়েক ছত্র।

প্যারিস থেকে আপোলিনের এ খবর পেয়ে পিকাসোকে চিঠি লিখে জানালো—তোমার স্ত্রী নিশ্চয়ই ভাল। তুমি বিয়ারিৎজের দেওয়াল সার্থকভাবে এঁকে সেখানে আমার কবিতা লিখেছো জেনে খুব খুশি হয়েছি। আমার কবিতার সঙ্গে তোমার ক্ল্যাসিক্যালধর্মী কাজের বেশ একটা মিল রয়েছে।

অল্‌গাকে পেয়ে পিকাসো যখন মনে প্রাণে সজীব হয়ে উঠল তখন যুদ্ধ প্রায় শেষ। দেশবাসী আসন্ন যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনায় আনন্দিত। সংবাদ এল আপোলিনের গুরুতর অসুস্থ। যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া মাথার কঠিন আঘাতটা সে প্রায় কাটিয়ে উঠেছিল, কিন্তু শরীর দুর্বল ছিল। দুর্বল শরীরে কোথা থেকে নিউমোনিয়া আর ফ্লু এসে জাঁকিয়ে বসল। ভগ্নস্বাস্থ্যে রোগের সঙ্গে লড়াই করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

পিকাসো স্নানঘরে ছিল। স্নানের আগে সেখানে দাঁড়িয়েই সে দাড়ি কাটার পর্বটা সারছিল। হঠাৎ টেলিফোনের আওয়াজ গোটা বাড়ীর নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে কর্কশ গলায় বেজে উঠল। অল্‌গাই রিসিভার তুলে কানের কাছে ধরল আলতো করে—কে যেন ফিস-ফিসিয়ে জানিয়ে দিল গীওম আপোলিনের আর নেই।

কলঘর থেকেই এ সংবাদ শুনলো পিকাসো। মনে মনে ভাবলো, সদ্য বিবাহিত আপোলিনেরের যুবতী স্ত্রী জ্যাকুলিন কবের কি হবে? বন্ধুর বিয়োগব্যথায় পিকাসো ভীষণভাবে চমকে উঠল। নিজের চমকে যাওয়া মুখের প্রতিচ্ছবি পড়ল আয়নায়। পিকাসো ক্ষিপ্রহাতে সে প্রতিচ্ছবির রূপ দিল রঙ তুলিতে। আপোলিনেরের মৃত্যু তাকে জানিয়ে দিল জীবনের সুন্দর বসন্ত ফুরিয়ে গেছে।

শোকার্ত আপোলিনেরের বন্ধুরা কিছুদিন পর তার একটি স্মৃতি-সৌধ তৈরি করার কথা ভাবলো। তারা অনুরোধ জানালো পিকাসোকে আপোলিনেরের একটি মডেল তৈরি করার জন্যে।

পিকাসো কয়েকটি ড্রয়িং ও ছোট একটি মডেল অনুমোদনের জন্য তাদের কাছে পাঠিয়ে দিল। মডেলটিতে কোথাও ঈশ্বরকে দেখানো হয়েছে মানবরূপে, কোথাও বা ধাতু দিয়ে তৈরি রেখায় বা খোদাই করা ভাস্কর্যে। মডেলটি বন্ধুদের নির্দেশমত না হওয়ায় নাকচ হল।

বন্ধুদের আচরণে পিকাসো কিছুটা ক্ষুব্ধ হল। পিকাসো বললে—ওরা কি চায় আমি হাতে টর্চ নিয়ে বিদ্যাদেবীকে মডেল হিসেবে দাঁড় করাই?

এখনও অনেকের আশা আপোলিনেরের সমাধিতে বন্ধু পিকাসোর ভাস্কর্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অল্‌গার সঙ্গে পিকাসোর সংসারজীবন সবে শুরু, সে কাজ আরম্ভ করল রু-লা-বোত্রতির স্টুডিওতে। মাঝে মাঝে সে শুঁড়িখানার জীবন দেখতে যেত, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিত। এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ বোহেমিয়ান। বুর্জোয়া অল্‌গার তখনও তার দিকে নজর দেবার অবকাশ হয় নি। সে তখন নিজের খেয়ালেই মশগুল। সংসারের কাজে তার সময় কাটে। অল্‌গা সুন্দরী, অল্‌গা সুগৃহিণী এই সুখ-ভাবনাতেই পিকাসোও পরিতৃপ্ত।

এলিস দেরেয়াঁ দূর থেকে অল্‌গার রূপের অনেক বর্ণনা শুনেছে। সেই কৌতূহলেই সে একদিন মরুজে এল। আল্‌গার কৃত্রিম চাল-চলন, কথাবার্তা তার তেমন পছন্দ হল না। বাড়ী ফেরার পথে সে মনে মনে ভাবলো—কি এমন অল্‌গার ছিরিছাঁদ, ধনীগৃহের ছিমছাম একজন পরিচারিকা হলে তাকে মানাতো ভাল।

রু-লা-বোত্রতির স্টুডিওতে কাজ করলেও পিকাসো বাস করত মরুজে। মাঝে মাঝে স্টুডিও থেকে রাতবিরেতে ফিরতো। মরুজের জনবিরল রাস্তায় হাঁটতে তার গা ছমছম করত। পল রোজেনবার্গ সপরিবারে থাকতো রু-লা-বোত্রতিতে। পিকাসো তাকে অনুরোধ করল সেখানে একটি বাড়ী খুঁজে দেবার জন্য।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর ২৩ নং রু-লা-বোত্রতিতে একটি পছন্দসই

ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গেল। সাততলার ওপরে পাঁচখানা বেশ বড় ঘরের সঙ্গেই একখানা রান্না ও খাবার ঘর। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অল্‌গা নিজের হাতে ডাচ্ বধূদের অনুকরণে ফ্ল্যাটটি সাজিয়ে ঝকঝকে করে তুললো। তাই দেখে পিকাসো বললে—অসাধারণ ক্ষমতা তোমার অল্‌গা। এতবড় ফ্ল্যাটটিকে একাই কেমন গুছিয়ে নিলে।

অল্‌গা খুশিতে ঝলমলে চোখ তুলে বললে—ড্রয়িংরুমে পুরনো-ধাঁচের কয়েকটা প্যানেলের সঙ্গে লুই ফিলিপ্পি আমলের চেয়ারগুলি সাজাবো। দরজা-জানলায় টাঙ্গাবো নানারঙের সিল্কের পর্দা। ঘরের এককোণে ফেরানডের পিয়ানোটাও গুছিয়ে রাখবো।

পিকাসো ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। এ কয়দিনের একত্রবাসে সে বুঝেছে অল্‌গা নিজের মতে চলতে ভালবাসে। কারো কথাই সে কানে তুলবে না।

অল্‌গার দ্বিতীয় রাজত্ব খাবার ঘর। গৃহকর্তার আঁকা চিত্রের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল রেনোয়া, কোরো ও সেজানের ছবি। কেমন অগোছালো —অল্‌গার খামখেয়ালী মনের মত এলোমেলো সব টাঙ্গানো। তাই দেখে পিকাসো বললে—ছবিগুলি একটু মানিয়ে, গুছিয়ে টাঙ্গালে ভাল হত। এগুলি দেখলে সকলেই বুঝবে গৃহিণীর শিল্পবোধ নেই।

কথাটা শুনে অল্‌গা বিরক্ত হল। গম্ভীর মুখে যেমন কাজ করছিল তেমনি করে যেতে লাগল। পিকাসোর কথামত কোন কিছু রদবদল করার চিন্তাও তার মাথায় এল না।

অল্‌গার ঘরদোর গোছাবার কাজ শেষ। এবার তার মনে হল কৃত্রিমতায় ভরিয়ে তুলে পরিবেশকে অভিজাত করতে হবে। হাঁটা-চলা কথাবার্তা সবেতেই অল্‌গা অত্যন্ত সচেতন। তার কঠোর নিয়মকানুনের একফোঁটা নড়চড়ে হবার উপায় নেই। এবার সে ঠিক করল বোহেমিয়ান স্বামীকেও তার মনোমত চলতে হবে। পিকাসোর এতে দারুণ কষ্ট। সে মুক্ত পাখীর মত স্বাধীনতা ভালবাসে।

ভাগ্য তখন সুপ্রসন্ন। অল্পায়াসেই পিকাসো বাসগৃহের সর্বোচ্চ তলার পাঁচটি ঘরের দখলদার হল। তার নতুন স্টুডিও। মস্তবড় স্টুডিও জুড়ে তার শিল্পসাধনা চলল ত্বরিতগতিতে। একের পর এক ঘর ছবির স্তূপে ভরাট হল। আবার ফিরে এল কিছুটা বাতো লাভোয়ারের পরিবেশ। ড্রয়িং-এর বাণ্ডিল, ভাস্কর্য, কাগজের টুকরো, টিনের পাত্র—সব অব্যবহার্য জিনিষ পিকাসোর একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে জড়ো হতে থাকলো! সে সঙ্গে জমা হতে লাগল রাশিকৃত সিগারেটের প্যাকেট আর ধূলোর পুরু আস্তরণ। মেঝে পরিষ্কার করার কথা শুধু দুঃস্বপ্ন। কুড়ি বছর পরে টেলিভিশন বসাবার জন্য পিকাসো যখন ফ্ল্যাটটি ছেড়ে ছিল, সেবার স্যাবার্তে ছবি ছাড়া স্টুডিওর গাদা সরাতে সত্তরটি বড় বড় প্যাকেট বাঁধতে বাধ্য হয়েছিল।

শিল্পসাধনার সঙ্গে রইল পিকাসোর সংসারজীবন। ব্যালে নর্তকী অল্‌গা পিকাসোর মত বড় শিল্পীকে বিয়ে করে ভাবলো হাত-পা গুটিয়ে বাড়ীতে বসে সময় কাটাবার কোন অর্থ নেই। তাই সে পিকাসোকে আদুরে গলায় বললে—আমি সোসাইটির একজন নাম-জাদা মহিলা হতে চাই। এভাবে বসে বসে সময় কাটাবার কোন অর্থ নেই।

পিকাসো চমকে উঠল। ফেরানডের কথা তার মনে হল। তবুও ধীরগলায় বললে—ঠিক আছে।

সম্মতি পেয়ে অল্‌গার খুশি উপচে পড়ল—তুমি দেখবে একদিন আমি সোসাইটি লেডিদের মধ্যমণি হবোই।

কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে অল্‌গা আর বেশী সময় নিল না। দিয়াঘিলেফ, এবং আরোও অনেকের সাহায্যে শিল্পী সাহিত্যিক ও গাইয়ে মহলে তার যাতায়াত শুরু হল। পিকাসোকেও তার সঙ্গে থাকতে হল। সেও নতুন এক জগতের সন্ধান পেয়ে ক্যানভাস ও স্কেচে তাদের রূপ দিতে লাগল।

পিকাসোকে নিয়ে অল্‌গা বাইরের জগতে মিশতে যত তৎপর হল ততই তার দৃষ্টি পড়ল স্বামীর পোশাকের দিকে। পিকাসোকে বললে—এবার তোমায় সেকেলে বেশভূষা ছাড়তে হবে। বোহেমিয়ান স্বভাব আমার পছন্দ নয়। টাইট স্যুট, গলায় বো-টাই, সোনার বেষ্টনে ঘড়ি, পকেটে সাদা রুমাল—এই সাজে আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।

বোহেমিয়ান পিকাসো হল মঁসিয়ে পিকাসো।

পিকাসো নতুন সমাজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পেল সোসাইটি পেইন্টারের সম্মান। সে সম্মান রক্ষার জন্য তাকে কেতাদুরস্ত হয়ে যেতে হত বিভিন্ন পার্টিতে।

অল্‌গার মন আর নতুন সমাজ রাখতে গিয়ে পিকাসোর মমার্তের নিকট বন্ধুরা হল পর!

ম্যাকস্ জাকব সময় পেলেই যে তার খোঁজ করতে আসত সেটাও আজকাল আর তার তত পছন্দ হল না। জাকব একদিন বললে—ব্রাকের একটা ছবি খুব চড়া দামে বিক্রী হয়েছে শুনেছো নিশ্চয়ই?

কথাটা শুনেই পিকাসো রেগে উঠল—জর্জ ব্রাক! ব্রাকের ছবি যত চড়া দামেই বিক্রী হোক না কেন আমার ছবির চেয়ে তার ছবির দাম কোনদিনই বেশী হতে পারে না। ব্রাক তো 'মাদাম পিকাসো'।

ম্যাকস্ জাকব বড় গলা করে কথাটা বলতে গিয়ে কেমন বোকা বোকা চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

এদিকে আবার কিছুদিনের মধ্যে পিকাসো খবর পেল ম্যাকস্ জাকব অভাবের তাড়নায় তারই উপহার দেওয়া একটা ছবি বেচে দিয়েছে। সংবাদটা পেয়েই পিকাসো মনে মনে জ্বলে উঠল। জাকবকে অপরাধ স্বীকার করিয়ে সে ছবিটি আবার নিজেই নিল কিনে। নিজের কোন জিনিষের হেলা-ফেলা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না।

জুয়াঁ গ্রির সঙ্গে পিকাসোর সম্পর্ক দাঁড়ালো আদায়-কাঁচকলায়।

পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক যেমনই হোক না কেন সে ভালবাসার উত্তেজনায় ও সৃষ্টির আনন্দে বিভোর। শিল্পজগতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল তার স্থান। আধুনিক চিত্রশিল্পের ওপর নানাভাবে পড়ল তার প্রভাব। যুবক শিল্পীরা সকলেই প্রায় তার কিউবিজমের অনুরক্ত ও অনুকরণে প্রয়াসী হয়ে উঠল। মরিস সাশ 'নভেল রেভ্যু ফ্রাঁসে'তে লিখলো—'সমকালীন সকল অলৌকিক ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ছবির যাদুকর পিকাসোর চিত্রকলা। রাফাইল তার যুগকে চিত্রকলার সৌকার্যে যেমন চিহ্নিত করেছিল পিকাসো রাফাইল অপেক্ষা আরও উন্নত ধরনের শিল্পসৌন্দর্যে প্রত্যেকটি মানুষকে বিস্মিত করে শিল্পজগতে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করল। শিল্পজগতে সে একজন মহান বিপ্লবী। অনায়াসে তার শিল্পকলাকে আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত করা যায়। তার এ শিল্পকলা সাহিত্যরসেও পুষ্ট। নীল, গোলাপী, নিগ্রো, বিশ্লেষণমূলক কিউবিজম্ এবং ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায় শিল্পকর্মকে নিত্য নতুনভাবে রূপায়িত করার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যাদুকর পিকাসো করেছে চিরন্তন বিস্ময় সৃষ্টির রহস্যকে উন্মুক্ত।'

অল্‌গাকে জীবনসঙ্গিনী করার পর থেকেই পিকাসো ব্যালের পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রাচীন শিল্পের উৎসাহে শিল্পের পুনর্বিন্যাসে মেতে উঠল। দিয়াঘিলেফ, মাসিন ও এরিক সাতির সহযোগিতায় সে প্রতিবছরই ব্যালের মঞ্চসজ্জার রূপান্তর ঘটিয়ে চলল।

এই ব্যালেদলের সঙ্গে পিকাসো চলল লণ্ডন। ব্যালে প্যারেডের পর ম্যানুয়েল ভ ফালার 'ত্রিকোণ টুপি'র জন্য আলহামব্রা মঞ্চের নক্‌শার চিন্তায় সে তন্ময়। এই নক্‌শা তার মঞ্চসজ্জাগুলির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র কাজ। এরমধ্যে সে আবার গোলাপী ও হলুদ রঙের আমেজে ফিরে গেল। সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুললো স্পেনের গ্রাম্যরঙের বৈশিষ্ট্যগুলি।

কয়েকবছরের মধ্যে পিকাসো ইনগ্রেস রীতি থেকে শুরু করে নব-

আলেকজ্যানড্রাইন স্টাইল পর্যন্ত একের পর এক চিত্রাঙ্কনের দিক-গুলিকে করল আরও প্রসারিত। যে স্টাইলের প্রতি তার একবার আগ্রহ হত তাকেই সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠত। সেণ্ট রাফাইলের জানলায় তার আঁকা দীর্ঘাকৃতি রমণীদের চিত্রগুলিতে একটি বিশেষ ভঙ্গিমার সৃষ্টি হল—ছবিগুলি কিছুটা অস্পষ্ট। কিন্তু এরমধ্যে একটা শান্তভাব আর প্রাচীন সৌন্দর্যের প্রতি তার আগ্রহ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল।

এর ঠিক পরেই তার ছবির সমুদ্র-উপকূলের স্ত্রীলোকেরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। চিত্রগুলির মধ্যে পাওয়া গেল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতকরণের সন্ধান। কোথাও কোথাও হাত পা দেহের তুলনায় অসম্ভব বড়। পিকাসো অল্গার চেহারাকে কেন্দ্র করে তার ছবির মূর্তিগুলিকে নানাভাবে অঙ্কন করতে লাগল। যুবতী স্ত্রী অল্গার গতানুগতিক রুচিকে চরিতার্থ করতে গিয়ে পিকাসো বাধ্য হল এ ধরনের ছবি আঁকতে। কিন্তু সমালোচকদের কাছে এগুলির মান নেমে গেল।

অল্গা হল সন্তানের জননী। জন্ম হল পলোর। পিকাসো ধ্রুপদী বাস্তবতায় ফিরে এসে নতুন পরিবেশে গোলাপী পর্যায়ের মা ও সন্তানের চিরন্তন বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকতে আরম্ভ করল। উন্নত বক্ষের মায়ের রূপ হল অনেকটা দানবীর মত। দু'হাতে উঁচু করে ধরে আছে তার শক্তিশালী সন্তানকে। এসব কাজের মধ্যে কোন উঁচুদরের শিল্পকৌশল আর রইল না। এরই সঙ্গে সে কিউবিজম্‌কে একেবারে পরিত্যাগ করল না বরং কিউবিজম্‌ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল তার চিত্রে। 'তিন বাদ্যকর' ছবিটিতে দু'টি রীতি দেখা গেল। এই ছবির মধ্যে রস ও কবিতা জীবন্ত হয়ে উঠলো। সে এ্যাবস্ট্রাক্ট ধরনের এই মূর্তিগুলিতে ইতালীয়ান হাস্যরস পরিবেশন করল।

গরমকালে সে পুত্র ও স্ত্রীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে দিনার-এ বেড়াতে

গেল। এখানকার আঁকা স্টীললাইফগুলিতেও কিউবিজমের প্রভাব পড়ল।

বছর কয়েক পরে এরই পরিণত রূপ দেখা গেল তার 'তিন নর্তকী' ছবিটিতে। ছবির স্কেচগুলি সে এঁকেছিল মঁতে কারলোতে থাকতে। ছবির মূর্তিগুলির মুখগুলি খণ্ডিত। একটি মূর্তিতে রয়েছে একটি মাত্র চোখ। ছবির ক্যানভাসে মূর্তিগুলি লম্বাভাবে দাঁড়ানো। ছবিটির প্রতিক্রিয়া হল 'লা দোমোয়াজেল দ্য আভিইঙ'র মত সুদূরপ্রসারী। ছবিতে এল বিকার, বিলাপ, পীড়ন।

'তিন নর্তকী' থেকে ক্রমশঃ এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের সূচনা হল। আরেক ধাপ সে এগিয়ে গেল যখন স্নানঘরের পুরনো ছেঁড়া কাপড় এনে জুড়ে দিল ক্যানভাসে। তাতে আঁটলো তিনটি সুতো। ছবিটির নাম হল 'গীটার'।

দাদাইজম্ : সুররিয়ালিজম্

দীর্ঘদিন প্যারিস বাস হল। এবার একটু হাওয়া বদলের প্রয়োজন ভাবতেই পিকাসো অল্‌গা ও পলোকে নিয়ে আবার দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করল। এবার লক্ষ্য আঁতিবে। আঁতিবের স্বচ্ছ বাতাস, প্রকৃতির উদার রঙবেরঙের খেলা তার মনকে বারবার টানতো। নিরিবিলি পাইনের প্রান্তর। পিকাসো তন্ময় হয়ে বসে থাকতো সেখানে। সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ত পাড়ে। ঢেউ-এর মাথায় কখনো সবুজ, কখনো আবির, কখনো বা রূপোলী রঙের দোলা। দেখতে দেখতে সে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যেত। সেখানে সমুদ্রের জলে গা ভাসিয়ে রাখতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আঁতিবে তার স্বপ্নরাজ্য।

আঁতিবে এসে অল্‌গা কয়েকদিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠল। তার বারবার মনে হতে লাগল আঁতিবের লোকেরা তখনও প্যারিসের মানুষের মত সুন্দর করে সাজতে শেখে নি। চলাফেরায় তাদের নেই কোন আভিজাত্যের ছাপ। আরও ভাবলো বড়দিনের পর কান্ আর মঁতে কারলোতে স্থায়ী বাদিন্দারা ছাড়া একমাত্র উন্মাদেরাই থাকতে পারে। অল্‌গা হয়তো পলোর জন্ম দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

আঁতিবে এসেছিল কবি আঁদ্রে ব্রেতঁ। তার সঙ্গে পিকাসোর আলাপ হল। পরিচয় হতেই পিকাসো আঁদ্রে ব্রেতঁর তীক্ষ্ণ ও স্পন্দনশীল একটা প্রতিকৃতি এঁকে ফেললো। আঁদ্রে ব্রেতঁ তখন দাদাইজমের প্রভাবমুক্ত হয়ে সুররিয়ালিজমের আদর্শে মেতে উঠেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তরুণ রুমানিয়ান যুবক ত্রিস্তিন জারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল সুইজারল্যাণ্ডে। জুরিকের ক্যাবারে ভলতেয়ার নামে

রেস্তোরাঁয় সে নিজের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নতুন এক শিল্প আন্দোলন 'দাদাইজম্' নাম দিয়ে হৈ-হুল্লোড় শুরু করল। বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের বিশ্বাস, নীতি, আশা, মমত্ব-বোধ বিপন্ন হল ধ্বংসের কাছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষের মনে বেশী আঘাত দিয়েছিল। যুদ্ধের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা বহু সাধারণ মানুষকে এমনিতেই পাগল করে তুলেছিল। কবি, শিল্পীদের মধ্যেও তার প্রভাব দেখা দিল স্বাভাবিক-ভাবেই। খেয়ালখুশি মত কাজ করাই হল দাদাইজমের মূলকথা। ত্রিস্তিন জারার উক্তি—'সব নিয়মের অভাবও একটা নিয়ম এবং সেটাই শ্রেষ্ঠ নিয়ম।' আঁদ্রে ব্রেতঁর মনকেও তা গভীরভাবে নাড়া দিল। কিন্তু ত্রিস্তিনের এ মতবাদ অল্পদিনেই একঘেয়ে হয়ে গেল। আঁদ্রে ব্রেতঁ তার দলবল নিয়ে সরে দাঁড়ালো। প্রকাশিত হল সুররিয়ালিস্ট ইস্তাহার। সুররিয়ালিস্টের মূল বক্তব্য—শিল্পীকে হতে হবে দ্রষ্টা। সে শুধু ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করবে না, গভীরভাবে উপলব্ধি করবে নিজের অন্তঃকরণ, ছায়া, মগ্ন, চৈতন্য, হৃদয়ে জাগবে বেদনা, স্বপ্ন। স্বপ্নে সম্ভব অসম্ভবের কোন সীমানা নেই। মানুষ ও পশু, স্বর্গ ও পৃথিবী একাকার। আকার হয়ে ওঠে কিম্ভূত কিমাকার। ফ্রয়েডের অবচেতন মনের ধারণাই এক শিল্পাদর্শে প্রধান হয়ে উঠল।

পিকাসো দাদাইজমের সরব সমালোচনায় মুখর হল। সুররিয়া-লিস্টের ইস্তাহারে প্রকাশিত হল তার সমালোচনা। আঁদ্রে ব্রেতঁ শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হল। পিকাসোর আঁকার ছন্দে সে উপলব্ধি করল এক গভীর প্রতিজ্ঞা। পিকাসো সুররিয়ালিজমের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শের সঙ্গে হল পরিচিত। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে কিছু ছবি আঁকল। গ্যালারি পিয়েরেতে আয়োজিত সুররিয়া-লিজমের প্রথম প্রদর্শনীতে তার কিছু ছবি দেখা গেল। এর কয়েক-বছর পরেও সে এই আদর্শেই কতকগুলি ছবি এঁকেছিল। আবার কোথায় যেন এ আদর্শের সঙ্গেও তার বিরোধ বাধে।

বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে পিকাসো একটি বাইসাইকেলের হাতল ও জিন উল্টোদিকে ঘুরিয়ে সেটা আবার জোড়া লাগিয়ে 'ষাঁড়ের মাথা'র এক বিস্ময়কর ভাস্কর্যের রূপ দিল। দর্শকেরা পিকাসোর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল।

আঁতিবে থাকতে অল্‌গার আর পছন্দ নয়। সে প্যারিসে ফেরার জন্য উতলা। অল্পদিনের মধ্যেই তারা ফিরে এল প্যারিসে।

হাঙ্গেরীর উত্থানে রাশিয়ার লালবাহিনী যখন তা দমনে ব্যস্ত তখন পিকাসো নিজের কর্মপন্থা নিয়ে করছিল ইতস্ততঃ। আঁদ্রে ব্রেতঁ পিকাসোকে বারবার অনুরোধ জানিয়ে লিখলো—প্রতিবাদে একটু সরব হোন। আপনার অনুভূতি ও অন্তঃকরণ কি নষ্ট হয়ে গিয়েছে!

সংশয় : সন্তানস্নেহ

ক্ললা বোত্রতির বৈঠকখানা। সময় অপরাহ্ণ। আখরোট কাঠের গোলটেবিল। ঝালর দেওয়া টেবিল ক্লথ। টেবিলের ওপর একটা নিগ্রো মুখোশ। টেবিল ঘিরে সোফা। মেঝেতে বিরাট বিরাট ফুলের ঝাড়ের ঘন কারুকার্যকরা গালচে। জানলা দিয়ে আসছিল স্নিগ্ধ বাতাস। পিকাসোর মুখ শান্ত। গা এলিয়ে সোফায় বসেছিল। গারট্রুডস্টেইন ছিল আরেকটি সোফায় বসে। বেশ কয়েকমাস পরে দু'জনের দেখা। পিকাসো বললে—বাতো লাভোয়ারের কথাটা আজ সারাদিন ভেবেছি। সেখানে কি ভয়ংকর শীত ছিল।

সে যাই হোক আমাদের আড্ডা জমাতে কোন অসুবিধা হত না—গারট্রুডস্টেইন টেনে টেনে বলল।

অল্‌গা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো। তার পাউডার ব্লু রঙের গাউনটায় সোনালী সুতোর জমকালো কাজ। মাথার চুল দু'হাতে ফাঁপিয়ে তুলে অল্‌গা বেশ আরাম করে তাদের মাঝখানে বসল।

পিকাসো বললে—বাতো লাভোয়ারের অত হৈ-চৈ ফেরানডের দারুণ পছন্দ ছিল। ওর মুখে কোনদিন কোন অভিযোগ শুনিনি।

তার উত্তরে গারট্রুডস্টেইন বললে—যেদিন দুআনীয়ের রুশোর সম্মানে ভোজসভায় আমাদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে ফেরানডে নিজেই খাবারের আয়োজন করতে ভুলে গিয়েছিল সেদিন…

কথা শেষ করতে না দিয়েই পিকাসো গলা ছেড়ে হাসতে লাগল। বন্দীজীবনের হাত থেকে মুক্তি পেতে মাঝে মাঝে পুরনোদিনের কথা বলে সে একটা সুখ পেত। হাসিমুখেই পিকাসো বললে—অতিথিরা কিন্তু সেদিন খালিমুখে কেউ ঘরে ফেরে নি। একটু রাত হলেও গৃহিণী শেষপর্যন্ত খাওয়ার আয়োজনটা ভালই করেছিল।

পিকাসোর কথায় সায় দিয়ে গারট্রুডস্টেইন বললে—এ ব্যাপারে ফেরানডের হাতযশ ছিল।

অল্‌গা ওদের কথার মাঝখানে জুতো দিয়ে কার্পেটে সজোরে পা ঠুকে দিল। মুখটা তার বিকৃত হয়ে উঠল। ফেরানডে, ফেরানডে, বলতে বলতে সে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় গারট্রুডস্টেইন একেবারে বোবা। পিকাসো অল্‌গার চলার পথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সে বুঝলো ফেরানডের নাম শুনেই অল্‌গা ঈর্ষায় জ্বলে উঠেছে। কিছুতেই সে স্বামীর অতীত প্রেমিকাদের নাম সহ্য করতে পারে না। গারট্রুডস্টেইনের আড্ডা আর জমলো না। মনমরা হয়ে তাকে বাড়ী ফিরতে হল।

গারট্রুডস্টেইন চলে যাবার পর পিকাসো সোফায় বসেই ডাকলো —অল্‌গা, অল্‌গা এদিকে একবার এসো।

কোন সাড়াশব্দ নেই।

পিকাসো অল্‌গার স্বভাব বেশ ভাল করেই জেনেছে, রাগ ভাঙ্গাতে হলে অল্‌গাকে কতটা সাধ্যসাধনা করতে হয় সেটাও তার অজানা নেই।

গলার স্বর মোলায়েম করে পিকাসো আবার ডাকলো—অল্‌গা এদিকে এসো। বাতো লাভোয়ার নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, ফেরানডেকে নিয়ে নয়।

পর্দা সরিয়ে অল্‌গা ঘরে ঢুকে সোফায় বসল। রাগে তার মুখ লাল, সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

পিকাসো অনুনয়ের সুরে বললে—ফেরানডের কোন হদিস আমার জানা নেই, তুমি অকারণে রাগ করছ অল্‌গা।

অল্‌গা মাথা নিচু করে বললে—তাহলে বল তুমি আর কোনদিন ফেরানডের নাম উচ্চারণ করবে না।

পিকাসো নানাভাবে অল্‌গাকে শান্ত করতে চাইলো। মনে মনে ভয় পেল অল্‌গার ভয়ংকর জেদ দেখে।

দিন যায়। অল্‌গার স্বভাবের অন্ধকার দিকটা ক্রমশঃ পিকাসোর সামনে উন্মোচিত হতে থাকে। পিকাসোর সব কিছুই সে করতলগত করতে চায়। তার মনের চাবিকাঠিও জমা রাখতে হবে স্ত্রীর কাছে এমনই সন্দিগ্ধ মন অল্‌গার। পিকাসোর চিঠি এলে সেটা খুলে নেড়ে চেড়ে দেখাও কুটিল অল্‌গার কাজ।

একদিন জ্বলনের চিঠি এল পিকাসোর নামে। অল্‌গা ভাল করে দেখে ছিঁড়ে ফেললো খামের মুখ। চিঠি পড়েই ভাবলো কি আশ্চর্য, জ্বলনের চিঠিতেও ফেরানডের নাম। অসহ্য, অসহ্য ওরা কি কেউ ফেরানডের নামটা ভুলতে পারবে না। পিকাসোর চোখের সামনে এনে চিঠিটা সে মেলে ধরল। তারপর বললে—যেখানে ফেরানডে তার পরিণতিটা একবার দেখ। চিঠিটা সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বিছিয়ে দিল গালচের ওপর।

পিকাসো নীরব দর্শক। ভাবলো কি নিষ্ঠুর হৃদয় অল্‌গার। জ্বলনের চিঠিটা তাকে পড়তে দিল না। অল্‌গা মুখে একটা পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে পিকাসোকে দেখলো অনেকক্ষণ। তারপর ঈর্ষার অশ্রু ঝরাতে শোবার ঘরে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল।

পিকাসো গভীর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিঠির টুকরোগুলি জড়ো করে বুকের কাছে চেপে ধরল। চিঠির ভাষা রইল অজ্ঞাত। মুখ হয়ে উঠল তার করুণ ও বিষণ্ণ। তবুও ক্ষোভ নেই তার। অল্‌গার প্রেমে সে মুগ্ধ, আচ্ছন্ন। অল্‌গা পলোর জননী। পলো তার একমাত্র সন্তান।

এত সহনশীলতার বিনিময়েও অল্‌গার মনে ছিল না কোন শান্তি। পিকাসোর উপস্থিতিটুকুও মাঝে মাঝে তার অসহ্য মনে হত। তাকে সন্দেহে উত্যক্ত করতে পারলেই অল্‌গার যত আনন্দ। ক্লাব, পার্টি সামাজিক সব পাট চুকিয়ে দিয়ে সে পিকাসোকে নজরবন্দী করে রাখলো।

অল্‌গা ক্লান্ত, ক্ষুব্ধ, বিপন্ন। স্বামীর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে

গিয়ে সে ক্ষতবিক্ষত। পিকাসোর সংসারজীবনে আবার ঝড় উঠল। ক্ষোভের অশান্ত মেঘ জমলো অল্‌গার মুখে।

পিকাসো মনে মনে ভাবলো, অল্‌গা সংকীর্ণমনা, রগচটা, ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর। তবুও অল্‌গা তার সন্তানের জননী। অশান্তির জ্বালায় অল্‌গার সঙ্গে বিচ্ছেদ করে পুত্রস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়া অসম্ভব। অল্‌গা যতই নিষ্ঠুর হোক পলোকে চোখের আড়াল করা সম্ভব নয়।

আশাহতের যন্ত্রণা বন্য একটা পশুর মত পিকাসোর বুকের খাঁচায় তোলপাড় শুরু করল। নিঃশব্দে তাই সে প্রতিবাদের ভাষা ফুটিয়ে তুললো ক্যানভাসে। অন্তরের গোপন অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল বিশাল বিশাল দৈত্যাকার মূর্তিতে। সংসারজীবনের অশান্ত, অতৃপ্ত, তিক্ত ভাবাবেগ শিল্পীর তুলিতে ঝড় তুললো। 'বসা দুই মহিলা', 'মা ও শিশু' ছবিগুলির নারীদেহের সুউন্নত বক্ষ, মাংসল দেহ, হাত-পায়ের স্থূল গড়নে মানুষের মূর্তিকে সে দানবের বিশালতায় রূপ দিল। নারী আর লাবণ্যময়ী নয়। নারীর সৌন্দর্য, কৌমার্য লুণ্ঠিত হল দানবতায়।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত ফ্রান্সেও হল ঘোরতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়। সোনা মজুত করাই তখন ফ্রান্সের মূল লক্ষ্য। ছবি কারবারীরা আর ক্রেতা খুঁজে পেল না। মর্ডান আর্টের জাঁদরেল ক্রেতারাও চুপচাপ। দিনান্তে ছবি কারবারীরা হতাশ হয়ে ঘরে ফেরে। তাদের বিষণ্ণ ধ্যান ভাঙ্গাতে সারাদিনে কোন ক্রেতার আনাগোনা নেই। দুর্যোগ ঘনিয়ে এল শিল্পীদের জীবনে। শহুরে শিল্পীরা অনেকে বিরাট বাড়ী, গাড়ী, ভৃত্যের বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে ফিরে গেল প্রথম দিকের সংগ্রামীর জীবনে। কোথায় রইল তাদের ঐশ্বর্যে ভরা সুসজ্জিত স্টুডিও!

কানওয়েলার তাদের এ চরম সংকটে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। অনেকের স্থান হল তার স্টুডিওতে। বাঁচার লড়াইয়ে কানওয়েলার শিল্পীবিশেষে সংসার নির্বাহের জন্য কিছু কিছু অর্থের

বরাদ্দ করল। পানাসক্ত শিল্পীদের জন্য গোঁড়া কানওয়েলার বিশেষ কোন ব্যবস্থা করতে রাজী হল না। আর যারা তার গ্যালারির বাইরে রইল তারা নিজেদের নাম লেখালো মমার্তে ও মঁপারনাসের ক্যান্টিনে। তারা ছোট একটা বাজারে নিয়মিত ঝোলাতে শুরু করল নিজেদের ছবি।

ফ্রান্সের এ আর্থিক দুর্যোগ পিকাসোকে ততটা স্পর্শ করল না। মন্দার বাজারে একটি দু'টি করে তার ছবি বিক্রী হতে থাকলো। পিকাসোর তাতে কোন ভাবনা নেই। বিক্রী করার চেয়ে ছবি মজুত রাখতেই সে তখন ব্যস্ত। ব্যাঙ্কে ছিল তার নামে মোটা অঙ্কের টাকা। তাই ছবি মজুত রেখে সুযোগ বুঝে দাম চড়াতে তার কোন অসুবিধাই হত না। ব্যালে দলের পর থেকেই পিকাসোর ভাগ্য-লক্ষ্মী প্রসন্ন। চারিদিকে শিল্পীরা জীবনধারনের প্রতিনিয়ত সংগ্রামে যখন ক্লান্ত পিকাসো তখন বিলাসবহুল জীবনের প্রাচুর্যে ভরপুর। এই দুর্দিনেও পিকাসো গিজরে বিরাট এক বাড়ী কিনতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করল না।

ছবির দুর্মূল্য শুধু পিকাসোকে বিত্তবান করল না, ছবি কারবারীরাও অর্থবান হবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। পিকাসোর ব্যবসায়ী বুদ্ধিকে ডিঙ্গিয়ে তার ছবির খ্যাতি ও চাহিদাকে লক্ষ্য করে একজন স্পেনীয় ও একজন মার্কিনী ছবি কারবারী রাতারাতি ধনী হবার আকাঙ্খায় বার্সেলোনার ট্রেনে চেপে বসলো। সেখানে পৌঁছে দেখা করল পিকাসোর মাতা মারিয়ার সঙ্গে। অনেক কথাবার্তার পর তারা জানালো—পিকাসোর ছবি আমরা নগদ দামে কিনতে চাই।

মারিয়ার বয়েস হয়েছে। ছেলের খ্যাতি সম্বন্ধে নানা-কথাও নানাজনের কাছে শুনেছে। কিন্তু তার ছবির দাম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। অথচ বাড়ীর এখানে সেখানে গাদা করে ছবিগুলি নষ্ট করেই বা কি লাভ ভেবে ছবি কারবারীদের সে ছবি বিক্রী করতে রাজী হল।

ছবি কারবারীরা স্কেচ, তেল রঙ সব মিলিয়ে প্রায় চারশ ছবি কিনলো। অনভিজ্ঞা মারিয়া সেগুলি বেচে দিল জলের দামে।

এ ঘটনার দিনকয়েক বাদে মারিয়া ছেলেকে জানালো, তোমার ছবি কিনতে দু'জন ছবি কারবারী আমার কাছে এসেছিলেন। আমি স্কেচ আর তেল রঙ মিলিয়ে চারশ ছবি বেচে দিয়েছি। সেগুলির দাম আমার কাছে আছে।

সংবাদটা জেনে পিকাসোর মাথায় প্রায় বজ্রাঘাত হবার উপক্রম। সে শোকে বিহ্বল হল। তার সরল মাকে ঠকিয়ে অনেক—অনেক টাকার ছবি দু'জন ছবি কারবারী বেহাত করেছে জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সে মামলা দায়ের করল।

শিল্পজগতে পিকাসো কৃতী, সুপ্রতিষ্ঠিত। পারিবারিক জীবনে অল্‌গার নিষ্ঠুর একচ্ছত্র অধিপত্যে ভারাক্রান্ত। অল্‌গা যেন দুরন্ত, দূরত্ব অসীম। তার কাছে যেতে পিকাসোর ভয় করে। একমাত্র আদরের সন্তান পলোর প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ। তাকে উপেক্ষা করা যায় না। তার জন্য ঘরে ফিরতেই হয়।

বিচ্ছেদ : চতুর্থ প্রণয়

পিকাসোর মন তখন অস্থির। লাফিৎ গ্যালারিতে আলাপ হল সপ্তদশী মারি-থেরেসে ওয়ালটারের সঙ্গে। লম্বা গড়ন, সুঠাম তার দেহশ্রী, স্বর্ণাভ কেশ, শরীরে মধুর হিল্লোল। তাকে দেখে পিকাসো বুকজোড়া শান্তি পেল। মারি-থেরেসে ব্যায়াম, খেলাধুলা করতে ভালবাসে। শিল্পকলা সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতূহল নেই।

পিকাসোর সঙ্গে মারি-থেরেসের আলাপ নিছক খেলা। খেলার নিত্য অভ্যাসের মত দেখাশোনাটা শুরু হল রোজ। খেলার ছলে ভালবাসাও জমলো। পিকাসো তাকে দেখে ছবি আঁকতে আরম্ভ করল—শান্ত ধীর এক নারী। মারি-থেরেসে বলে চেনা যায়, আবার ঠিক মারি-থেরেসে নয়। তাই দেখে সে পিকাসোকে সরাসরি বললে—মহাশয়, কি যে আঁকলে বুঝতে পারছি না। ছবিটা আমার মত নয়।

পিকাসো বোঝাতে চাইলো কেন সে তাকে এভাবে এঁকেছে। ছবির রেখা আর রঙ নিয়েই আলোচনা করা তখন তার লক্ষ্য।

মারি-থেরেসে বললে—তোমাদের ওসব রঙ, রেখার ব্যাপার আমি বুঝতে চাই না। শিল্পের ওসব কচকচানি আমার ভাল লাগে না। তুমি আমাকে একটা ঘর দাও। সেখানে আমি ব্যায়ামের সব সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখবো।

পিকাসো হেসে বললে—অত ভাবনার কি আছে, তোমাকে বুলভার আঁরি কার্ত ফ্ল্যাটের একটা বড় ঘর ছেড়ে দেব। পঞ্চাশ বছরের পিকাসো মারি-থেরেসের শীতল প্রেমের ছায়ায় একটু সান্ত্বনা খুঁজলো।

পিকাসোর গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের কোন বাসনা নেই মারি-

থেরেসের। তবুও সে তাকে ভালবাসলো। ভালবাসলো গভীর নিষ্ঠায়। মারি থেরেসে তেমন একটা পিকাসোর শয্যাসঙ্গিনী হত না তাই মারি-থেরেসেকে বন্ধুমহলে পরিচয় করিয়ে দেবার কোন তাগিদও ছিল না তার। কানওয়েলার পিকাসোর অন্তরঙ্গ বন্ধু। পিকাসোর জীবনের বহু খুঁটিনাটি ঘটনা সে জানতো অথচ পিকাসোর জীবনে মারি-থেরেসের উপস্থিতি দীর্ঘদিন তার আজানা ছিল।

একদিন রেস্তোরাঁয় কফি খাওয়া শেষ হলে পিকাসো কানওয়েলারকে বললে—আজ তোমায় একটা দারুণ জিনিষ দেখাবো।

কানওয়েলার আগ্রহ দেখিয়ে বললে—চল, চল, দেরি করছ কেন?

তারা দু'জন এসে উপস্থিত হল বুলভার আরি কার্তের দরজায়। কানওয়েলার ভাবলো পিকাসো নিশ্চয় কোন আঁকা ছবি নয়তো মূর্তি দেখাবে। তাকে নিয়ে পিকাসো ড্রয়িংরুমে বসতেই মারি-থেরেসে এল হাসিমুখে। সে তো একেবারে হতবাক্। ব্যাপারটা সে একটুও আঁচ করতে পারে নি।

মারি-থেরেসের অবস্থাও তথৈবচ। পিকাসোর সঙ্গে একজন সঙ্গী দেখে সেও আশ্চর্য হল। তারও পিকাসোর কোন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করার বাসনা ছিল না। ঘটনাচক্রে মারি-থেরেসের সঙ্গে কানওয়েলারের পরিচয় হল।

এর কিছুদিন পর মারি-থেরেসেকে নিয়ে পিকাসো প্যারিসের বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। দীর্ঘদিন তারা কাটালো বিঅজগেলু ও ল্য ট্রমরে সুর-ম্যলদরে। বেড়ালো সানসিবাটিয়ান, মাদ্রিদ ও টলেডোতে।

মারি-থেরেসের বহুপূর্ব হতে পিকাসো নারী সঙ্গলাভে অভ্যস্ত। অল্‌গার উপস্থিতি ও সংঘর্ষে তার ছবিতে যে দানবীমূর্তিরা এসে ভীড় জমিয়েছিল এবার মারি-থেরেসের সাহচর্যে তারা একটু একটু করে সরে দাঁড়ালো। ছন্দোময় গড়নের মানুষের মূর্তিতে কারভড্ গ্রাফিজমের

সৃষ্টি হল। ছবি ঘিরে রইল এক মিষ্টিসুরের আমেজ। 'স্বপ্ন' ও 'ডিভানে মহিলা' মারি-থেরেসেকে কেন্দ্র করে আঁকা হল। কিছুদিনের মধ্যেই তার ছবিতে ফিরে এল নরম স্বাস্থ্যবতী নারী। পরবর্তী সময়ে বিঅজগেলুর ভাস্কর্যেও এই স্বাস্থ্যবতী নারীদেহ বারবার পিকাসোকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

পিকাসো মারি-থেরেসের সঙ্গে যত নিবিড় হয়ে মিশতে লাগল, আল্‌গার সঙ্গে তার সম্পর্ক তত শিথিল হতে লাগল। তাতেও নিস্তার নেই। অল্‌গার ক্রুদ্ধ ব্যবহারে ক্রমেই সে বিরক্ত হয়ে উঠল। এদিকে মারি-থেরেসে পিকাসোর সন্তানের জননী হতে চলেছে। মারি-থেরেসের সন্তান নিয়েই পিকাসো পিতৃহৃদয় তুষ্ট করবে ভেবে অল্‌গার কাছে বিচ্ছেদের প্রস্তাব পাঠালো।

প্রস্তাব পেয়ে অল্‌গা ক্ষুব্ধ। যা খুশি তাই বলে তাকে গালাগালি দিল। কিন্তু আইন আদালত করতে গিয়ে পিকাসো এক মর্মান্তিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। বিশ্বের সামনে উন্মোচিত হল পিকাসোর ব্যক্তিগত জীবনের কথা অথচ অল্‌গার সঙ্গে আইনত বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার ছিল না তার। সে বিয়ে করেছিল প্যারিসের রুশ গীর্জায়, নিজে ছিল স্পেনের নাগরিক, বিষয়বস্তু ছিল স্পেনীয় সমাজিক আইনের আওতায়—আর স্পেনে কোন বিবাহবিচ্ছেদের নিয়ম নেই। অতিকষ্টে আইনসঙ্গতভাবে উভয়ে পৃথক থাকার একটা অনুমতি পেল। ঠিক হল অল্‌গা আর পলোর দায়িত্ব বইতে হবে পিকাসোকে। কোর্টের এ নির্দয় রায় তার বুকে শেলের মত বিঁধলো।

আলাদা বাস করেও অল্‌গা তুষ্ট নয়। নিজে হাতে সে পিকাসোর স্টুডিওতে তালা লাগিয়ে দিল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল অল্‌গা আর পলোর ভরণ-পোষণের খরচকে কেন্দ্র করে। অবশ্য এ ব্যাপারটারও একটা মীমাংসা হল শেষ পর্যন্ত।

এত করেও অল্‌গার স্বভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন হল না। শাসন-তর্জনে বোঝাই করে নিয়মিত সে পিকাসোকে চিঠি পাঠাতে

লাগল। চিঠির ভাষা পড়ে পিকাসো কখনো রাগে, কখনো দুঃখে, কখনো বা গলা ফাটিয়ে একাই হেসে উঠত। আবার অল্‌গার চিঠি কোনদিন না এলে অকারণ বিষণ্ণতায় সে স্তব্ধ হয়ে থাকতো।

অল্‌গা তখন পিকাসোর পিছনে ছায়ার মত ঘুরছে। তার প্রদর্শনীকক্ষে অথবা যেখানে তার নিত্য যাতায়াত সেখানে অল্‌গার উপস্থিতি সুনিশ্চিত। সঙ্গে কোন যুবতী বান্ধবী থাকলে তো কথাই নেই। উপযাচিকা হয়ে আলাপ করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অপমানে অল্‌গা তাকে অতিষ্ঠ করে তুলতো।

ছুটির দিনগুলিতে পিকাসো ব্যাকুল হত পলোর জন্য। সুযোগ পেলেই তাকে নিয়ে ঘুরেফিরে সে বিকেলটা কাটিয়ে দিত। সেখানেও অল্‌গা ধাওয়া করত নিশাচরের মত। তার বিরামহীন বিরক্তিতে পিকাসো একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

অল্‌গা আর পলোকে কাছে না পেয়ে পিকাসো মাঝেমাঝে দুঃসহ নিঃসঙ্গতায় ডুবে যেত। কিছুই যেন তার আর ভাল লাগতো না। পলোর জন্য মন হাহাকার করত, তার ওপর অল্‌গার দুরন্ত অত্যাচার। পুত্র স্নেহে দুর্বল পিকাসো স্যাবার্তেকে লিখলো—এই বড় বাড়ীটায় আমি একা। সম্পূর্ণ একা। নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো কি ঘটে গেছে আর আমি একা একা কি করছি। অল্‌গা পলোকে নিয়ে চলে গেছে। আমার গোটা বাড়ীটাই ফাঁকা। কয়েকটা ঘরের তালা সে নিজের হাতে লাগিয়ে দিয়েছে। তাই কাজকর্মও প্রায় বন্ধ। জানো সে এখন রু-দ্য-বেরির ওটেল ক্যালিফোর্নিয়ার কাছেই আছে। আমার বাড়ী থেকে ওটেল ক্যালিফোর্নিয়ার দূরত্বটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছো? সেখান থেকে আমার ওপর নজর রাখতে তার কোন অসুবিধে নেই। অল্‌গা আমায় জ্বালিয়ে মারলে।

ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পিকাসো মারি-থেরেসেকে সঙ্গে করে বিঅজগেলুতে আশ্রয় নিল। প্যারিসের বাইরে রুয়ঁ যাবার পথে গিজর থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে বিঅজগেলু গ্রাম। সেখানে ছিল

সপ্তদশ শতকের ছোট একটা শাতো। শাতোর সদর দরজা পেরিয়েই মস্ত এক উঠোন। তারপর গথিক স্টাইলের সুন্দর একটা গীর্জা। ধূসর রঙের পাথরের দেওয়াল ঘেরা শাতোর ছাদ ছিল শ্লেট বর্ণের। সেটার জানলা দিয়ে চোখে পড়ত বড় বড় গাছ। প্রধান দালানের উল্টোদিকে ছিল আস্তাবল। একসময় ওখানে সারিসারি ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতো। বড় উঠোন পেরিয়ে স্টুডিও করার মত বিরাট এক চত্বর। লুই ফোর্ত তার এচিং-এর ছাপাখানা ঐ চত্বরে তুলে এনে পিকাসোকে বললে—কি আশ্চর্য, আমি ছাপার সব সরঞ্জাম নিয়ে আপনার কাছে হাজির হলাম আর আপনি দিব্যি হাত গুটিয়ে বসে আছেন ! এবার এচিং-এ হাত লাগান।

কথাটা পিকাসোর মনে ধরল। সে তো কখনো রঙ, কখনো পাথর কখনো এচিং প্রভৃতি হরেকরকম কাজ করতেই অভ্যস্ত। ফোর্তের প্রস্তাব সে সাগ্রহে গ্রহণ করলো। চল্লিশটি এচিং-এর মধ্য দিয়ে 'ভাস্করের স্টুডিও' মিনোটারের আবির্ভাব হল। এই ভয়ংকর মিনোটারের মূর্তিতে দু'রকমের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেল। একদিকে যেমন মূর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে শক্তির পরিচয় ও মানবিক চরিত্রে গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি অপরদিকে আবার এই মূর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে পাশবিক কাম চরিতার্থ করার প্রেরণা। এই এচিংগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মিনোটারের মদ্যপান' 'মিনোটার নিদ্রিতা রমণীর ওপর নতজানু' ও 'মিনোটারম্যাচি'।

এদিকে পুরনো ভাস্কর বন্ধু গনজালেজ পিকাসোকে প্রেরণা দিল মূর্তি গড়তে। ধাতুর কাজে গনজালেজ দক্ষ। সে পিকাসোকে বললে —মূর্তি গড়তে শুরু কর। বিঅজগেলুর মত এতবড় স্টুডিও প্যারিসের কোথাও মিলবে না। বড় বড় মূর্তি গড়তে এখানে কোন অসুবিধে নেই। ছবি আঁকার মত ভাস্কর্যের যাদুও তোমার হাতের মুঠোয়।

পিকাসো বললে—তোমার কথায় আমার পাথর কাটতে ইচ্ছে হচ্ছে।

পিকাসোর শিল্পীমনে আবার কিউবিজম্ চিত্রাদর্শ ঘুরতে লাগল। অপ্রয়োজনীয়, অব্যবহার্য জিনিষ বোঝাই ঘরের দরজা খুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে সে মনোমত কতকগুলি জিনিষ তুলে নিয়ে বিরাট এক ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ালো। তাল তাল বালি ছড়িয়ে দিল ক্যানভাসের রঙের ওপর, কোথাও বা বালির ওপর রঙ। ক্যানভাস থেকে ছবির জমি বেশ উঁচু হয়ে উঠল। তারপর পাঁচমিশেলী জিনিষ মিলিয়ে একটা পরিপূর্ণ ছবি আঁকা শেষ হল। ছবির মধ্যে এল হালকা করে খোদাই করার আশ্চর্য সুন্দর কৌশল। ভাস্কর্যের একটা আবেগ আর আবেদন রইল গোটা ক্যানভাস জুড়ে। ফিরে এল সে সিনথেটিক্ কিউবিজমে।

ক্যানভাসে ছবি আঁকা শেষ হলে সে আবার তন্নতন্ন করে খুঁজলো সেই মজুত ঘরের জিনিষ। একটা পুরনো ছাতা আর সেলাই মেসিনের একটা তক্তা দেখে চোখ দুটো তার খুশিতে উদ্ভাসিত হল। সেই দুটোকে বগলদাবা করে তাড়াতাড়ি ফিরে এল স্টুডিওতে। সুররিয়ালিস্ট কবিতার ছন্দে তাদের ওপর ছবি আঁকা হল। ছোটদের খেলনা, পুরনো দস্তানা, গাছের পাতা, হালকা ডাল—সব মিলিয়ে বড়বড় ক্যানভাসে সে নীচু করে খোদাই করা ভাস্কর্যের কৌশলে ছবি আঁকতে লাগল। বিরাট এক ক্যানভাসে জ্যামিতিক আকারের এক নারী মূর্তির মাথা যেন আকাশ ফুঁড়ে উঠল। মাথা থেকে ঝুলতে লাগল লম্বা তিনটে বিনুনি। মাঝখানে লম্বালম্বি মুখের গড়নে ধারালো দু'পাটি দাঁত। মূর্তিটি দেখলে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। সেটা দেখতে হল অনেকটা নিউ আয়ারল্যাণ্ডের ম্যালাংগানদের মত। ছবি আঁকা আর মূর্তিগড়ার ফাঁকে ফাঁকেই সে আক্ষেপে বলতে লাগল—একটু সুযোগ পেলেই কানের সমুদ্রের ধারে বিরাট এক মূর্তি গড়তাম।

পিকাসোর মত শিল্পীর এ আক্ষেপ আর কতদিনের! গনজালেজ

তাকে বারবার বলতে লাগল—পিকাসো আর দেরি নয়। হাতুড়িতে হাত লাগাও আমি সব ব্যবস্থা করছি।

বাক্যব্যয় নয়। অন্তর থেকে মূর্তি গড়ার প্রচণ্ড তাগিদ সে অনুভব করল। ছুরি দিয়ে ছোট ছোট কাঠের টুকরো খোদাই করে পিকাসো মডেল তৈরী করতে লাগল। পরে এগুলি বড় আকারে ব্রোঞ্জে ঢালাই হল। শুধু ব্রোঞ্জের মূর্তি নয়, লোহা-লক্কড়, বল্টু-স্ক্রু, সসপ্যান্, চালুনি সব আবর্জনা থেকে বেছে নিয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে জোড়াতালি দিয়ে সৃষ্টি হল আরো অনেক ভাস্কর্য। কোন উপকরণের আর পৃথক সত্তা রইল না। কোথায় যেন মিলেমিশে সব একাকার হয়ে মূর্তির মধ্যে হারিয়ে গেল।

পিকাসোর কাজের উন্মাদনা দেখে গনজালেজের আর ফূর্তি ধরে না।

একদিন পিকাসো খোলা জানলা দিয়ে বিদায়ী সূর্যের রক্তিমাভার দিকে উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। গনজালেজ আলতো করে ছুঁয়ে তার ধ্যান ভাঙ্গালো। গনজালেজ দেখল সামনের দীঘিতে কে যেন মুঠো মুঠো সিঁদুর রঙের তেলরঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। জলে রঙ ভাসছে। প্রকৃতি যেন অন্তরে বুলিয়ে দিচ্ছে প্রশান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ। গনজালেজ বললে—পিকাসো আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। তোমার মূর্তিগড়ার কৌশল অপূর্ব। বিঅজগেলুতে বন্ধুবান্ধবের কোন ভীড় নেই, গল্পগুজবে সময় হারাবার ভয় নেই—এখানে আমরা নিশ্চিন্ত মনে সাধনা করতে পারবো।

পিকাসোর মন মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল ঝলমলে প্যারিসের জন্য। ব্রাকের জন্য মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। কতদিন তার সঙ্গে ছবি আঁকার নতুন আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা হয়নি। কানওয়েলার আর মিশেল লেইরিসের কথা ভাবতেই বুকের মধ্যে হাতুড়ির আঘাত পড়তে লাগল। বিমর্ষভাবে সে গনজালেজকে বললে—প্যারিসের কথা ভুলতে পারছি না। পলোকে

দেখতে না পেয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। পলো আমার একমাত্র সন্তান।

এরপর মাত্র আর কয়েকটা দিন সে কাটালো বিঅজগেলুতে। অলসমুহূর্তে শহর প্যারিস এসে মনের আনাচে-কানাচে উঁকি দিত। রঙ-তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে খোলা জানলার দৃশ্য রূপ দিত ক্যানভাসে।

পিকাসো ভাবলো, আর নয়। বিঅজগেলুতে তো একটানা দীর্ঘদিন কাটালাম। কয়েকটা দিন প্যারিস ঘুরে আসি।

গনজালেজকে পিকাসো অনুরোধ জানালে—অন্তঃসত্বা মারি-থেরেসে তোমার ভরসায় রইল। আমাকে একটু রাজধানী ঘুরে আসার সুযোগ দাও।

শরৎকালে প্যারিসে ফিরে পিকাসোর আর কোন কাজে মন বসলো না। রু-লা-বোত্রতির চারপাশে অল্‌গার স্মৃতি। অল্‌গার সঙ্গে মধুর দিনগুলির কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। ভাবলো —অল্‌গা কি নির্দয়। পলোকে নিয়ে নির্দিষ্ট মাসোহারায় সে নিশ্চিন্ত সুখে দিন কাটাচ্ছে। নিজের স্টুডিওতে তার প্রবেশের অধিকার নেই। সেখানে অল্‌গা নিজের হাতে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

আরম্ভ হল রু-লা-বোত্রতিতে পিকাসোর অগোছালো জীবন। প্রতিটি আসবাবপত্রের ওপর বই, প্যাকেট, চিঠিপত্রের স্তূপ। আর স্তূপের কলেবর ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে ডাইনিং টেবিলের ফাঁকা জায়গাটাও দখল করল। নিরুপায় হয়ে রান্নাঘরের এককোণে তাকে খাওয়াটা সারতে হত। এই বিশৃঙ্খল জীবনের মধ্যে একসময় বিঅজগেলু থেকে পিকাসোর কাছে খবর এল মারি-থেরেসে একটি মেয়ের জন্ম দিয়েছে। খবর শুনে সে তার নাম দিল মেইয়া কিন্তু তখনই তাদের কাছে পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। মন তাই ভারাক্রান্তই হয়ে রইল।

বসন্তের শেষাশেষি স্যাবার্তে স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হল প্যারিসে। এখানে এসেই সে দেখা করল পিকাসোর সঙ্গে। পুরনো বন্ধুকে নির্ভর করে বাঁচার আকাঙ্খায় পিকাসো ব্যাকুল হয়ে বললে—আমার চিঠিতে অলসতার কথা জেনেছো নিশ্চয়ই। হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে আমি পঙ্গু হয়ে যাব। আর তুমিই বা কি করলে? তিরিশ বছর আগে তোমাকে কবি হিসেবে এঁকে আমি যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলাম সেটাও তো সার্থক হল না।

ম্লান হাসলো স্যাবার্তে। আক্ষেপের সুরে বললে—মানুষ যা চায় তাই বোধহয় পায় না। দক্ষিণ আমেরিকায় একটা জার্নালিস্টের কাজে তো জীবনের বহুসময় চলে গেল, কিছুই হল না। এবার এখানে যদি কিছু করতে পারি।

—ঠিক বলেছো স্যাবার্তে। থামলে চলবে না। এগিয়ে আমাদের যেতেই হবে।

স্যাবার্তে বললে—নতুন ঘরনী আমায় শিল্পে না বিলাসে ডুবিয়ে রাখবে সেটাই ভাবছি।

—ভালই করেছো স্যাবার্তে দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করে। নতুন প্রেমে সে তোমায় জাগিয়ে রাখবে, এগিয়ে দেবে লক্ষ্যের দিকে। আমিই যে অলস হয়ে বসে আছি।

স্যাবার্তে সান্ত্বনা জানিয়ে বললে—আমি তোমায় সব সময় সঙ্গ দিতে রাজী। আমেরিকার চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এসেছি। সেখানে ফেরার আর ইচ্ছে নেই।

স্যাবার্তে খুশিমনে পিকাসোর পাশে পাশে সর্বক্ষণ থাকতে শুরু করল। স্যাবার্তে তার অকৃত্রিম বন্ধু।

পলোর স্মৃতি : কবিতা লেখা

সেটা ছিল একটা ছুটির দিন। সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। স্যাবার্তে তার স্ত্রীকে নিয়ে এল রু-লা-বোত্রতিতে। ঘুরতে ঘুরতে ঢুকলো পলো ও তার পরিচারিকার ঘরে। পিকাসো সেখানে আনমনে বসেছিল। সামনে পলোর একটা ছবি।

স্যাবার্তে অবাক হয়ে বললে—প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর পিকাসো আজ পাথরের মত নিশ্চল কেন ?

পিকাসোর চোখ দু'টো ছলছল করে উঠল। ভারী গলায় বললে —পলোর ঘরটা ঠিক আমার হৃদয়ের মত ভয়ানক শূন্য।

ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে স্যাবার্তে বললে টেবিলের ওপর এতসব রঙীন কাগজ ছড়ানো কেন ?—'এস্' অক্ষরের মধ্যে রামধনুর রঙ। কি ব্যাপার ?

পিকাসো চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর উদাসগলায় বললে —আমি কবিতা লিখছি। না-না ওসব কিছুই নয়। আমার কবিতার কথা কাউকে জানিও না।

যুক্তিহীন অন্তরের ব্যথায় আচ্ছন্ন থাকতে থাকতে পিকাসোর মনে অহেতুক ভয়-ভাবনা এসে বাসা বেঁধেছিল। সংগোপনে সে কবিতা-গুলিকে বন্ধুদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতো। মাঝে মাঝে বন্ধুদের এড়িয়ে যাবার জন্য স্নানঘরে বসে নির্বিঘ্নে কবিতা লিখতো।

আমাকে কবিতা দেখাতে তোমার এত সংকোচ কেন ? দিনের কতঘণ্টা আমি রু-লা-বোত্রতিতে কাটিয়ে যাই তা তো তুমি জানো। কথা দিচ্ছি তোমার কবিতার কথা গোপন থাকবে।

পিকাসো কি ভেবে ধীরে ধীরে কবিতা লেখা একতাড়া কাগজ স্যাবার্তের হাতে তুলে দিল।

কবিতাগুলিতে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে স্যাবার্তে দেখলো লেখার মধ্যে কোথাও কোন পূর্ণচ্ছেদ নেই। লেখার মাঝে মাঝে বেশ কিছু কাটাকুটি। পাতা ওল্টাতে এক জায়গায় তার নজরে পড়ল—'সময় ঘুমিয়ে পড়েছে কুয়োর মধ্যে। ঘড়ির কাঁটা সচেতন। কোথাও কোন ভুল নেই।' সুররিয়ালিজমের চিন্তাধারা মাঝে মাঝে এসে তার কবিতায় আলোড়ন তুলতো।

পিকাসো নির্বান্ধব, বিষণ্ন। কাজ ছাড়া বাড়ীর বাইরে বেরুতে তার ভাল লাগতো না। একদিন স্যাবার্তে এসে দেখল রান্নাঘরে বসে পিকাসো এটা-ওটা নাড়াচাড়া করছে। কি যে করবে ঠিক ভেবে পাচ্ছে না।

কি খুঁজছো এত মন দিয়ে? স্যাবোর্ত জিজ্ঞেস করল।

আজকের রান্নাটা নিজে হাতে সারবো ভাবছি—পিকাসো ব্যস্ত হয়ে কি একটা খুঁজতে খুঁজতে বললে।

তুমি এদিকে সরে এসো। আমি তোমায় একটু সাহায্য করি। রান্নাঘরে আবর্জনার পাহাড় জমিয়ে রেখেছো। একটু নড়াচড়ার জায়গা রাখনি।

পিকাসো বললে—কাগজের বাণ্ডিলগুলি চেয়ার থেকে নামিয়ে একটু বসার জায়গা করে নিতে পার।

স্যাবার্তে সে চেয়ারটাতে পিকাসোকে জোর করে বসিয়ে দিল। ডানদিকে তাকাতেই তার নজরে পড়ল টেবিলের একধারে একটা এঁটো প্লেট। পাশে কয়েক টুকরো মাংসের হাড়। একটা ঝোলের বাটিতে কানায় কানায় জল ঢালা। স্যাবার্তে বুঝলো পিকাসো রাতের খাওয়া শেষে বাসনগুলি কলের নীচে রাখতেও ভুলে গেছে।

এমনি করে স্যাবার্তে হল পিকাসোর সর্বক্ষণের সঙ্গী, সতর্ক প্রহরী। চিঠি এলে খুলে দেখা, তার উত্তর খুঁটিয়ে আদায় করা—পিকাসোর সেক্রেটারীর পুরা কাজটাই তাকে সারতে হত। কখনো বা সে ভৃত্য আবার কখনো বা সে-ই পাচক।

পিকাসো তখন যেন কক্ষচ্যুত এক মানুষ। তুলি, রঙের ধারে-কাছে ঘেঁষতো না। নীরবে শুধু কবিতা লিখে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলছিল। মারি-থেরেসে তার কাছে, সঙ্গে আছে মেইয়্যা। তবুও প্যারিসে তার মন বসলো না। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই সে মারি-থেরেসে ও মেইয়্যাকে সঙ্গে করে চলল জুয়াঁ-লে-পেঁতে। সেখানে বেশ কিছুদিন গোপনে কাটিয়ে স্যাবার্তেকে চিঠিতে লিখলো —ওদের নিয়ে একরকম পালিয়ে এলাম জুয়াঁ-লে-পেঁতে। এখানে আমার পরিচয় পাবলো রুইজ। পিকাসো নামে পরিচয় দিয়ে অল্‌গার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথাটা লোক জানাজানি করতে ইচ্ছে হয় না। এখানে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দিলাম। মেইয়্যাকে আমি পলোর মত স্নেহ করি। মারি-থেরেসে যেন শান্তির প্রতিমূর্তি। আমি ধূসর অন্ধকারের জটলা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাসে ছবি আঁকছি। আমাকে তুমি পাবলো রুইজ নামেই চিঠি দিও।

স্যাবার্তে ব্যাপারটা আন্দাজ করল। পিকাসোর বরাবরের পছন্দ গোপনতা, সোজা কথাকে ঘুরিয়ে বলা, অপ্রয়োজনীয় কথাকে অহেতুক গুরুত্ব দেওয়া আর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কথা বলা।

জুয়াঁ-লে-পেঁ থেকে প্যারিসে ফেরার পর পিকাসোকে অনেক প্রাণ-চঞ্চল মনে হল। নতুন উৎসাহে বুফোঁর 'হিস্টরি নেচারেলে' (প্রাকৃতিক ইতিহাস) বইটির জন্য নানা জন্তু-জানোয়ার দিয়ে ছবি আঁকতে আরম্ভ করল। তার এ-সময়কার শিল্পকলা স্যাঁত জারমেঁ্য-দে-প্রে যুগ বলে চিহ্নিত হল। এই সময়ে তার গ্রাফিকের কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ দেখা গেল বালজাকের 'লে শেফ দ্য ওভর আঁকনু' (শিল্পীর অজ্ঞাত অবদান) এবং ওভিদের 'মেট্যামরফসিস্' (রূপান্তর) বইয়ের ছবির নক্‌শায়।

অল্‌গার সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যথা মন থেকে অনেকটা ফিকে হয়ে এল তার। সে সঙ্গে ব্যালে নাচ, উৎসব, হাই-সোসাইটির কোলাহল

থেকে দূরে বহুদূরে সে সরে যেতে লাগল। আবার সে বোহেমিয়ান জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল। অবশ্য এ তার ব্যাতো লাভোয়ারের দরিদ্র বোহেমিয়ান জীবন নয়, এ যেন মঁপারনাসের সোনার সেতুর নীচে উচ্ছল ভবঘুরে জীবন। পিকাসো যেন ভোগসুখপরায়ণ এক অবিবাহিত বৃদ্ধ। কিভাবে যে রাতে ঘুমের সময় কেটে যেত খেয়াল থাকতো না। সকালে প্রাতরাশের পর দীর্ঘ সময় কাটাতো বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে। সংবাদপত্র, চিঠিপত্র পড়া হলে সে বাকি দিনের খোশগল্পের একটা মনোমত তালিকা প্রস্তুত করত। সকাল গড়িয়ে দুপুর এলে সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনমনে ক্ষুর চালাতো। তারপর পোশাক বদলে বন্ধুদের সঙ্গে অনর্গল স্পেনীয় ভাষায় কথা বলত। লাঞ্চের আগে কদাকার আফগান হাউণ্ড এ্যালফ্‌টকে নিয়ে বারকয়েক এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতো।

কাজের অবসরে রাস্তায় রাস্তায় পিকাসো উদ্দেশ্যহীন ভাবে স্যাবার্তের সঙ্গে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে বেরিয়ে পড়ত। রুটিওয়ালার দোকানে গিয়ে দু'জনে ফ্রেডের নাম ধরে ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করত। প্যারিসে পা দিয়েই সে ফ্রেডের কাছ থেকে প্রথম রুটি কিনে পেটের জ্বালা মিটিয়েছিল। অথচ ততদিনে ফ্রেড আর ইহলোকে নেই।

কখনো মমার্তের পুরনো স্টুডিওতে গিয়ে দরজায় আঘাত করত। ভাড়াটে গৃহিণী চোখ তুলে আগন্তুকদের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতো। স্যাবার্তের ইশারায় পিকাসো আমতা আমতা করে বলতো —শুভ সন্ধ্যা। এককালে আমি এ বাড়ীর বাসিন্দা ছিলাম। অনেক দিন পর আজ একটু বাড়ীটা ঘুরে দেখতে এলাম।

—আসুন, আসুন। আপনিই মঁসিয়ে পিকাসো? আমার কি সৌভাগ্য। আপনার কত গল্প শুনেছি। সাদরে তাদের ঘরে নিয়ে বসাতো গৃহিণী।

—নীল-পর্যায়ের ভাঙ্গা চেয়ার টেবিলটা ঐ কোণে থাকতো। হাত

তুলে পিকাসো যেখানটা দেখালো সেখানে এখন একটা সুসজ্জিত শো-কেস।

—আমার স্বামী একজন ডাক্তার। এসব আসবাব তার পছন্দেই কেনা হয়েছে।

পিকাসোর পাঁজর বিদীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। পিকাসো বললে—সব বদলে গেছে। এদিকটায় একটা ডিভান থাকতো।

স্যাবার্তে দেখল সেখানে রয়েছে একটা বুক-কেস।

—দরজাটাতো ওখানে ছিল না। আমার ঈজেল ওখানে দাঁড় করিয়ে কাজ করতাম। ক্যানভাসগুলি থাকতো ঐ জানলাটার তলায়।

—বাড়ীওয়ালার অনুমতি নিয়ে আমার স্বামী ওখানে এই দরজাটার ব্যবস্থা করেছেন। এতে আমাদের সুবিধা হয়েছে। গৃহিণী এবার খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

—মাদাম, আপনি বেশ ঝকঝকে করে ফ্ল্যাটটি গুছিয়ে ফেলেছেন। আমি যখন থাকতাম তখন গোটা ফ্ল্যাট জুড়ে ছিল কি অসীম দারিদ্র্যের ছাপ···আমূল বদলে গেছে স্যাবার্তে। সব নতুন, সব উজ্জ্বল। আমরাই শুধু বুড়ো হয়ে গেলাম। হায়রে যৌবন! আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমরা যাবার জন্য অনুমতি চাইছি।

এত ঘোরাঘুরি করেও দু' বন্ধুর কোন ক্লান্তি নেই। ঠিক সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই পিকাসো এ্যালফ্‌টের গলায়, মাথায় আদরে হাত বুলিয়ে দিত। বেশ কিছুক্ষণ তাকে নিয়ে পায়চারী করত।

স্যাবার্তে হাজির হত ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। নিঃশব্দে দু'জনে বাড়ীর দরজা পেরিয়ে প্রাণখুলে অতীতের গল্প করতে করতে ঝলমলে শাঁজেলিজের দিকে হাঁটতে শুরু করত। স্যাঁত জারমেঁ্য-দে-প্রেকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলত কুর-লা-রেনের দিকে। দূর থেকে দেখা

যেত দো-ম্যাগোর ভীড়। সেখানে ঢুকে দু'জনে চেয়ার টেনে বসতো। যেদিন দো-ম্যাগোতে ঢুকতে মন চাইতো না সেদিন লিপ-এ বসে আসর জমিয়ে তুলতো। বেশ কিছুদিন ধরে পিকাসো ও স্যাবার্তের এখানে আসা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বন্ধুরা, ছবি কারবারীরা, লিথোগ্রাফের সমঝদারেরা সবাই এখানে মৌমাছির মত পিকাসোকে ঘিরে ধরতো। তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে পিকাসো পানীয় দ্রব্যে মাঝে মাঝে গলা ভিজিয়ে নিত।

দো-ম্যাগো আর লিপ-এ নিয়মিত আড্ডা দেওয়ায় পিকাসো অল্‌গার কথা প্রায় ভুলে গেল। শান্ত মারি-থেরেসে আর মেইয়্যার প্রতি তখন তার গভীর ভালবাসা। মেইয়্যা তার শুষ্ক মরুভূমিতে মরুদ্যান। কাফে থেকে ফেরার পথে কোনদিন দেরেয়াঁ বা ব্রাকের সম্বন্ধে আলোচনা হত। পিকাসো চাইতো স্যাবার্তের মত সকলে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠুক। সেদিন ব্রাকের কথা আলোচনা করতে করতে পিকাসো বললে—ব্রাকের ছবি দেখতে চাইলে সে বেশ রয়েসয়ে দেখায়। বাছাই করে দু'চারটি ছবি এনে আমার সামনে হাজির করে। সেজানেরও এ অভ্যেস ছিল শুনেছি। ব্রাকের সব ব্যাপারে ঢাকাঢাকি আমার মোটেই পছন্দ নয়।

স্যাবার্তে বললে—ব্রাকের চিন্তাধারা একটু স্বতন্ত্র। আর পাঁচ-জনের মত সে নয়। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে তার প্রতিভার একটা নিজস্ব স্থান আছে এ ব্যাপারে ব্রাক বেশ সচেতন।

কথাটা শুনে পিকাসো খুশি হতে পারলো না। গম্ভীর গলায় বললে—নিজের কাজে ব্রাকের এত অহংকার শোভা পায় না। স্যাবার্তে প্রসঙ্গ বদলে পিকাসোর গুণকীর্তনে মত্ত হল। পিকাসো গম্ভীর।

পঞ্চম প্রণয়

কবি পল এলুয়ার ও তার স্ত্রী নুশ স্যাবার্তের মতই পিকাসোর অন্তরঙ্গ। তারাও অল্‌গার বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলতে পিকাসোকে অনেকটা সাহায্য করেছিল। ফরাসী ছাঁচের সুন্দর মুখ, কৌতূহলী শান্ত দৃষ্টি এলুয়ার তার কয়েকটি কবিতা উৎসর্গ করল পিকাসোকে। চিররুগ্ন এলুয়ার। অবস্থাও তেমন সচ্ছল নয় অথচ মন যেন ফুলের মত কোমল। পিকাসোও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এলুয়ারের কিছু কবিতার ছবি এঁকে সেগুলি ছাপতে অনুমতি দিল। ভাবলো, এভাবে যদি এলুয়ারকে কিছু অর্থ সাহায্য করা যায়।

দো-ম্যাগোতে পিকাসোর নিয়মিত যাতায়াতের বিরাম নেই। একদিন পিকাসোর সামান্য দূরে ঘন ভ্রূ, সমুদ্রনীল বিষণ্ণ দু'চোখে উদ্বিগ্নতা নিয়ে এসে বসলো এক তরুণী। তার হাতে ছিল একটা পেন্সিলকাটা ছুরি। তাই দিয়ে সে অন্যমনস্কভাবে টেবিলে আঁচড় কাটছিল। একসময় তার গোলাপ-ঝাড়ের নক্‌শা করা দস্তানা কয়েক ফোঁটা রক্তে লাল হয়ে উঠল। ঘটনাটা পিকাসোর নজর এড়ালো না। একে রক্ত তায় আবার এক রূপসী তরুণীর নরম হাত কেটে ঝরে পড়া—পিকাসোর মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম।

পিকাসো নিজের চেয়ার ছেড়ে তরুণীর টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে আবেগভরা গলায় বললে—দস্তানাটা পেলে এই মুহূর্তটিকে অনন্ত করে রাখতাম। সেই আবেগেই পিকাসো তরুণীর হাত দু'টি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল।

করুণ দু'টি চোখ তুলে তরুণী নিঃশব্দে পিকাসোকে কৃতজ্ঞতা জানালো।

সে সন্ধ্যায় পিকাসো একাই গিয়ে বসেছিল দো-ম্যাগোতে। বাড়ি

ফেরার পথে সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে রইল তরুণীর বিষণ্ণ দু'টি চোখ আর তার অনুপম দেহ-সৌন্দর্য। রাত্রে ফিরে অনর্গল স্পেনীয় ভাষায় সে দো-ম্যাগোর ঘটনাটা স্যাবার্তেকে গল্প করল। স্যাবার্তে উত্তম শ্রোতা। ঘাড় নেড়ে পিকাসোকে উৎসাহ দিতে লাগল। স্যাবার্তের আঁচ করতে অসুবিধে হল না জল এবার কোনদিকে গড়াবে।

দিনকয়েক বাদে পিকাসো ও এলুয়ার সবে বুলভার দ্য ক্লিশীর মোড়ে এসে পৌঁছেছে। এক তরুণী হাসিমুখে এলুয়ারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। একগাল হেসে বললে—কি খবর? একযুগ পরে দেখা। কোথায় চলেছেন?

এলুয়ারও পাল্টা প্রশ্ন করল—তুমিই-বা কোথায় চলেছো?

জবাবে তরুণী বললে—ফটো স্টুডিওতে যাচ্ছি খোঁজ নিতে ছবিগুলি ওয়াশ হয়েছে কিনা। আপনারাই বা এমন দিনটিকে উপভোগ করতে কোনদিকে?

এলুয়ার এবার পিকাসোকে দেখিয়ে বললে—এ ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারছো নিশ্চয়? পি-কা-সো, যার নামে এখন প্যারিস তোলপাড়। আর এ তরুণীটি ফটোগ্রাফার ডোরা মার। জার্নালিজম্ ওর নেশা ও পেশা।

নীরবে ডোরা মার ও পিকাসোর দৃষ্টি বিনিময় হল। পিকাসো বললে—কোথায় যেন তোমায় দেখেছি? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, দো-ম্যাগোতে। সেই গোলাপ-ঝাড়ের দস্তানাটার কি দশা হল।

ডোরা মার মৃদু হাসলো। টানা টানা করুণ দু'টি চোখ তুলে পিকাসোকে বললে—সাংবাদিকতা, ফটো তোলা আমার পেশা। এক সময় রঙ-তুলিতে ছবি আঁকতেও চেষ্টা করেছিলাম।

পিকাসো তাড়াতাড়ি বললে—ডোরা মার, তোমার তোলা ফটো আর আঁকা ছবি দেখার সুযোগ কি আমার হবে? সময় করে একদিন রু-লা-বোত্রতিতে চলে এস। ফটোগ্রাফার ডোরা মারকে আমার খুব প্রয়োজন। আমি অপেক্ষা করব।

এলুয়ারের সঙ্গে পিকাসো গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে ডোরা মার ভাবলে একটা সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেল পিকাসোর স্টুডিওতে যাবার। এ ছাড়পত্রের সদ্ব্যবহার শীঘ্রই করতে হবে।

বেশীদিন নয়। অল্পদিনের মধ্যেই ডোরা মারের জন্য পিকাসোর অপেক্ষারও অবসান হল। পিকাসো অল্গার হিংস্র স্বভাব এবং মারি-থেরেসের মিষ্ট ব্যবহারের কথা সম্পূর্ণ গোপন করে ডোরা মারের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা শুরু করল। ডোরা মারের উপস্থিতিও রইল মারি-থেরেসের সম্পূর্ণ অগোচরে। সেখানেও পিকাসোর রুটিন-মাফিক উপস্থিতির কোন পরিবর্তন হল না। মেইয়্যাকেও সে আগের মত স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরত। সে সঙ্গে মেইয়্যার প্রতিচ্ছবিও আঁকার বিরাম ছিল না।

পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভে এসে এক নারী থেকে আরেক নারীর প্রতি দুর্বার আকর্ষণের তীব্রতা সাময়িকভাবে স্তব্ধ করে দিল দু' রমণী—

মারি-থেরেসে।

ডোরা মার।

কিন্তু তারা দু'জনে দু'মেরুর ব্যবধান। শিল্পী পিকাসোর মুগ্ধদৃষ্টি অপলক হয়ে ওঠে মারি-থেরেসের সুগঠিত দেহের ভরা-যৌবনের দিকে তাকিয়ে। আর ডোরা মার শিল্পীমনের প্রতিচ্ছায়া।

ডোরা মারকে ছাড়া মারি-থেরেসে তখন পিকাসোর জীবনে অসম্পূর্ণ। পিকাসোর শিল্পের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমস্যা ও সমাধানের নতুন সঙ্গিনী ডোরা মার। তারই উৎসাহে সে ফটোর হুবহু অনুকরণে খোদাই-এর কাজে হাত লাগালো।

ডোরা মার কখনো স্থির, কখনো অস্থির, কখনো নরম কখনো উত্তেজিত। পাহাড়ী-নদীর মত দুর্বার তার গতি। পিকাসোকে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন সৃষ্টির কাজে সে উৎসাহ দিতে লাগল।

চঞ্চল বেগবতী ডোরা মার শিল্প চেতনায় যতটা উচ্ছল, দেহের কামনা-বাসনায় ততটা আগ্রহী নয়। পিকাসোর হিসেবে সেখানে গরমিল হল। সে ভাবলো, ডোরা মারের মনের মত দেহও বুঝি উত্তাল। শুরু হল ভুল বোঝাবুঝি।

জীবননাট্যে তার আরেকটি মস্ত ভুল ভাঙ্গলো। নিজের নিশ্চিন্ত আস্থায় ছেদ পড়ল। বেশীদিন আর এক পটভূমিকায় দু'নায়িকার অস্তিত্ব গোপন রইল না। ডোরা মার আর মারি-থেরেসে একে অপরকে আবিষ্কার করে দ্বন্দ্ব ও ঘৃণায় নিজেদের জর্জরিত করে তুললো। নির্বাক, নির্লিপ্ত দর্শক পিকাসো।

একদিন ডোরা মারের বেশভূষায় পিকাসোর মডেল হয়ে বসলো মারি-থেরেসে। ডোরা মার ঢুকলো হন্তদন্ত হয়ে। চোখে তার আগুন। তার পোশাকে সজ্জিতা—কি স্পর্ধা মারি-থেরেসের! ডোরা মার ক্ষেপে এগিয়ে গেল মারি-থেরেসের দিকে। শান্ত মারি-থেরেসেও সেদিন মারমুখী। পিকাসো ছোট টুলটায় বসে এ নাটক উপভোগ করতে লাগল। পারলে সে বাহবা দিয়ে ঝগড়ার ইন্ধন জোগাতো।

পিকাসোর শিল্পীমন কোনকিছু ভ্রূক্ষেপ করতে চাইতো না। তাই ডোরা মার আর মারি-থেরেসের অন্তর্জ্বালায়ও তার শিল্পসাধনা নির্বিঘ্নে চলল। ডোরা মার তাকে নতুন করে কাজের নেশায় পাগল করে তুললো।

স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ : গুয়েনিকা

ফ্যাসীবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ল জার্মানী ও ইতালীতে। ছ'টি হিংস্র বিবদমান দল শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ। স্পেনেও গৃহযুদ্ধ শুরু হল। আত্মসম্মানবোধে সচেতন অনেকেই দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল। বহুদিনের নাজীসাহায্যে পুষ্ট সামরিক-বাহিনীর অত্যাচারে সাধারণ মানুষের দুর্দশা চরমে উঠল। চারিদিকে শুধু ভয় আর উন্মাদনা। দশলক্ষেরও বেশী লোক এই গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারালো।

দেশত্যাগী পিকাসো দেশের চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল। বিচলিত হল মনে মনে। এতদিন সে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা-গুলি নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি। এবার দেশের রক্তগঙ্গাপ্রবাহ তার চিন্তাধারার এক নতুন দিকের সূচনা করল। দিনেরাতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারতো না। গভীর নিশীথে তার গোঙানি ও আর্তনাদে ডোরা মারের ঘুম ভেঙ্গে যেত। অন্তরে স্পেনের রাজনৈতিক সমস্যাগুলির এক মর্মান্তিক জ্বালা। দিনের পর দিন এলুয়ারের সঙ্গে স্বদেশের সমস্যাগুলি আলোচনা করে নিজে সে কমিউনিস্ট ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হল। পিকাসো ঘোষণা করল—আমার শিল্পীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং মৃত্যুর হাত থেকে শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলা।

নাজী সাহায্যে শক্তিশালী সানজুরজো ও ফ্রাঙ্কের নেতৃত্বে স্পেনে যখন সামরিক শক্তির অভ্যুত্থান হল পিকাসো জানালো আইনসম্মত বৈধ রিপাবলিকান্ সরকারকে সমর্থন। নিজের ছবি বিক্রয়ের টাকা পাঠিয়ে দিল শিশু ও শরণার্থীদের সাহায্যে। স্পেনের মাদ্রিদ সরকার পিকাসোর দানে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রাদো মিউজিয়ামের অধিকর্তার পদে নিয়োগ করল। কিন্তু ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনী তখন প্রাদোর চারিদিক ঘিরে, তাই পিকাসোর পক্ষে সেখানে যাওয়া কোনমতে সম্ভব

হল না। হৃদয় তার চঞ্চল হয়ে উঠল। শত্রুর মোকাবিলা করতেই হবে। অস্ত্র চাই। চাই গোলাবারুদ। কোথায় সে অস্ত্র? রাত্রি কাটে বিনিদ্র। মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। অন্তরে তার দুঃসহ যন্ত্রণা। শুধু অন্বেষণ—অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই।

অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। সে তো তার হাতের মুঠোয়। রঙ আর তুলিতে শরনিক্ষেপ করে শত্রুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাকে মুখর হতেই হবে।

আর দেরি নয়।

এচিং-এ 'ফ্রাঙ্কোর স্বপ্ন এবং মিথ্যা'র চোদ্দটি ব্যঙ্গচিত্র যেন ধারালো অস্ত্র। ফ্রাঙ্কো হল বিরাট এক লোমশ শামুক। নারী, শিশু নির্বিশেষে এ মহাদানব সকলের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। শামুকের সঙ্গে লড়াই করছে এক স্পেনীয় ষাঁড়। শেষপর্যন্ত ষাঁড় পরাস্ত হল। ঐ ভয়ংকর শামুক নিঃশেষে পান করছে ষাঁড়ের উষ্ণ রক্ত।

এর অল্প কিছুদিন পর মাদ্রিদ সরকার পিকাসোকে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য একটি ম্যুরালের বরাত পাঠালো। প্রদর্শনীটি বসন্তকালে প্যারিসের ত্রোকাদেরো এবং শাঁ দ্য মারসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। পিকাসো সাগ্রহে রাজী হল। কিন্তু বরাবরের মত এবারেও সে ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

ঠিক সে সময় চার বছর পরের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়াহিসেবে ফ্রাঙ্কোর বোমারুবিমান বাস্কপ্রদেশের প্রাচীন রাজধানী 'গুয়েনিকা' শহরটির ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করল। ফলাফল হল বীভৎস। কর্মচঞ্চল দু'হাজার লোক নিহত হল। আহত হল একহাজার। শহর পরিণত হল শ্মশানে।

স্বদেশের এই নিষ্ঠুর হত্যালীলায় পিকাসো গর্জে উঠল। ছবি আঁকার এক ভয়ংকর বিষয়বস্তু তাকে তোলপাড় করে তুললো। উত্তরসূরীদের কাছে ফ্রাঙ্কোর ঘৃণ্যতম অপরাধকে চিরস্থায়ী করার জন্য দ্রুতহাতে সে স্কেচ করে চলল। রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে পঁচিশ ফুট

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এগারো ফুটের বিরাট এক ক্যানভাসে ছবি আঁকা আরম্ভ হল। ডোরা মার ক্যামেরা হাতে তার অক্লান্ত সঙ্গিনী। শিল্প ইতিহাসে ডোরা মারের অনলস ক্যামেরা শিল্পীর বহু মূল্যবান মুহূর্তকে অমূল্য করে রাখলো। সৃষ্টি হতে লাগল জগৎবিখ্যাত চিত্র 'গুয়ের্নিকা'। ছবিতে ফুটে উঠল শিল্পীর ক্ষোভ, রাগ, ঘৃণা, দুঃখ। চিত্রে বিশেষ কোন আঙ্গিক নয়, আছে শুধু বিচিত্র মানসিক অভিব্যক্তি, অন্তর্জ্বালা বিদ্রূপ ও পরিহাস। নারী ও জন্তুরা ভয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করছে। আস্তাবলে ভয়ংকর সেই ধ্বংসের দানব স্পেনীয়দের ওপর অত্যাচারে মত্ত। মৃতসন্তান-কোলে ক্রন্দনরতা-নারী ডোরা মারের চীৎকারে গগন বিদীর্ণ। ছোট শহরটির কদর্য পরিণতির সার্থক রূপায়ণ হল কালো এবং নীলচে ধূসর রঙে। ছবিটিতে রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হল শিল্পীর ব্যক্তিগত নানা সমস্যা।

যে পিকাসো ফ্রাঙ্কোর ঘৃণ্য অপরাধকে মূর্ত করে ছবি আঁকতে নিষ্ঠুর, উদ্ধত ও দুর্দান্ত সেই পিকাসো একই সময়ে প্রশান্তি ও স্নিগ্ধমনে মেইয়্যাকে আদর করত। স্টিল লাইফ, মেইয়্যা ও মারি-থেরেসের ছবি শান্ত মেজাজে আঁকতে আঁকতে তার কণ্ঠে শোনা যেত—আমি দুঃখের কাছে হার মানি নি।

'গুয়ের্নিকা' ছবিটি শেষ হওয়ার পর দর্শকের সামনে সেটা দেখাবার আয়োজন করা হল প্যারিসের স্পেনীয় প্যাভিলিয়নে। অসংখ্য দর্শকের ভীড়।

অগনিত দর্শক ভাবলো—কি ভয়ংকর যুদ্ধের বীভৎসতা, কি নিষ্ঠুর হত্যালীলা। ব্যথায় তারা হাহাকার করে উঠল।

পরবর্তীকালেও পিকাসো ছবিটিকে হাতছাড়া করতে চাইতো না —কারণ 'গুয়ের্নিকা' স্পেন সরকারের এক মহামূল্যবান সম্পদ। কিছুদিন পরে অবশ্য ছবিটিকে খুব সাবধানে নিউইয়র্কের আধুনিক চিত্রশালায় পাঠানো হয়েছিল প্রদর্শনীর জন্য।

দানব-দানবী পর্যায়

'গুয়ের্নিকা' ছবিটি রু-দে-গ্রাঁ অগস্তিন থেকে সরিয়ে নেবার পর পিকাসো একটু বিশ্রামের জন্য কাতর হয়ে উঠল। জলপাই, পীচ আর বার্চের সমারোহে পাহাড়ের ওপর মুজিঁ গ্রামের কথা তার বারবার মনে হতে লাগল।

আর দেরি নয়। ডোরা মার, এলুয়ার, নুশ, রোল্যাণ্ড পেনরোজ, মিস্ লি মীলের, ম্যাঁ রে এবং তার গভর্নেসকে নিয়ে সে দক্ষিণ-ফ্রান্সের দিকে রওনা হল। পথে যেতে যেতে গাড়ী দুর্ঘটনায় পিকাসো আহত হল। তবুও তারা মুজিঁ পৌঁছলো।

আকাশের রঙ সেখানে ঘন নীল। ঝিরঝিরে বাতাস। বনানীর নিস্তব্ধতায় গভীর প্রশান্তি। গ্রীষ্মকাল। পিকাসো সদলবলে সকাল-বেলা বেরিয়ে পড়ত সমুদ্রতীরের সন্ধানে। সঙ্গে থাকতো তার ছবি আঁকার সরঞ্জাম-বোঝাই হিস্পান গাড়ী। বালুকাবেলায় পৌঁছে সূর্যস্নানের জন্য সকলে ছড়িয়ে পড়ত এদিক-সেদিক। ক্রমশঃ সূর্য উত্তপ্ত হত। নরম শরীরগুলি আশ্রয় নিত বালির মধ্যে। বেলা বাড়তো। শুরু হত ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্রস্নান। হৈ-হৈ করে মধ্যাহ্ন-ভোজের পাট চুকিয়ে দীর্ঘ নিদ্রা সারতে সকলেই অভ্যস্ত হয়ে উঠল। নিদ্রাশেষে এলুয়ার তার কবিতাগুচ্ছ থেকে শোনাতো কবিতা, পিকাসো দেখাতো চিত্র, একের পর এক। ম্যাঁ রে আর ডোরা মারের কাঁধে ঝুলতো ক্যামেরা। জারভো আর তার স্ত্রী মাঝে মাঝে সমুদ্রতীরে এসে ওদের সঙ্গে মিলিত হত।

চারিদিকে খুশির তরঙ্গ। পিকাসো এবার জমাটি দল নিয়ে এসেছে দক্ষিণফ্রান্সে। তবুও তার মনে ফিরে এল না শান্তি। স্পেনের গৃহযুদ্ধের বীভৎসতায় মন তখনও তোলপাড়। ক্ষতবিক্ষত,

রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত স্পেন তার মুজিঁর শান্তিকে বিঘ্নিত করল। সে অশান্তির প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠল তার চিত্রে। দানব-দানবীর চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে এবার সে পৌঁছলো।

মুজিঁতে হাওয়া-বদলের পালা শেষ। পিকাসো চলল সুইজারল্যাণ্ড। উদ্দেশ্য সুররিয়ালিজমের জনক পল ক্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পল ক্লে নাজী-অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্যে বার্ণের উপকণ্ঠে বাস করছিল। ক্লেও পিকাসোর অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ ছিল। কিউবিস্ট ব্রাক ও পিকাসোর সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্খা ক্লের দীর্ঘদিনের। ক্লের কাছে পিকাসো সাদর সম্ভাষণ পেল। পিকাসো ক্লের প্রশংসা করে বললে—আপনার স্টুডিও কত সুন্দর সাজানো। এটাকে স্টুডিও না বলে ল্যাবরেটরী বলাই ভাল।

পিকাসোর কথায় খুশি হয়ে ক্লে বললে—না-না অতটা বোধহয় নয়। আপনার স্টুডিওই-বা কম যায় কিসে?

পিকাসো প্যারিসে ফিরলো। যোগাযোগ করল ডোরা মারের সঙ্গে। মারি-থেরেসের উপস্থিতি জানার পর থেকেই ডোরা মার ক্ষুব্ধ তাই তার সঙ্গে পিকাসোর মার নানাকারণে শুরু হল মতবিরোধ।

ডোরা মার বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে। দানবীমূর্তিতে রূপ দেওয়াতেও তার কোন আক্ষেপ বা প্রতিবাদ ছিল না। ডোরা মার নিজের সৌন্দর্য বিকৃতিসত্ত্বেও উপলব্ধি করত শিল্পী পিকাসো সৃষ্টির প্রয়োজনে সুরূপকে করেছে কুরূপ। সে ভাবতো এ শুধু পিকাসোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ডোরা মারের বিকৃতরূপ দেখে পিকাসোকে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করল—রূপের এই বিকৃতি কেন? কেনই-বা ডোরা মারকে এমন করে আঁকায় তোমার উৎসাহ?

পিকাসো চিন্তার অতলসমুদ্র থেকে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—আমার জন্য। শুধু আমার জন্য ডোরা মার একজন ক্রন্দনরতা নারী।

বছরখানেক ধরে আমি তাকে অত্যাচারিতা করে আঁকছি। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্য এগুলি আমি তার ওপর জোর করে আরোপ করেছি।

পিকাসোর সৃষ্ট ভয়ংকর দানব-দানবী রূপের মধ্যে রয়েছে প্রতিভা ও প্রতারণার দ্বন্দ্ব। মানুষের কুহৃদয়ের প্রতিফলন তার মুখ। সে মুখগুলি তার দানব-দানবী পর্যায়ে এসে ভীড় জমিয়েছে—গোইয়ার 'রাতের গোঙানি'র মত তারা ভয়ংকর।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে পিকাসোর সমস্ত অন্তর মথিত করে বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল এবার একটু শান্তি চাই। শান্তির জন্য তৃষ্ণা। রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে অথবা ভলারের আস্তানায় ল্যা-ট্রমব্লে-স্যুর-ম্যলদ্রে পিকাসো ধীরে-সুস্থে ছবি এঁকে চলল। তার চিত্রে সবই স্বস্থানচ্যুত, প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের তীব্র সমালোচনা। মেইয়্যা ও মুশের সামনাসামনি প্রতিকৃতিতে একপাশে নাক। 'মুরগী নিয়ে বালিকা'তে সেই একই পরিবর্তন।

পিকাসো ভাবলো, একি অন্তর্জ্বালা। যুদ্ধের বিভীষিকা মন থেকে আর সরতেই চায় না।

পরিবেশও প্রতিকূল—ডোরা মার আর মারি-থেরেসের দ্বন্দ্ব, অল্‌গার ক্রুদ্ধ গর্জন। পিকাসো বিভ্রান্ত। শরীরও বিশেষ জুতসই নয়। শীতকালে সাইটিকার যন্ত্রণা আবার বেড়ে গেল। ব্যথা-বেদনায় সে বিছানায় বন্দী হয়ে রইল। অসহ্য যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ডাক্তারের চিকিৎসায় উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কারোর উপস্থিতি আর তার কাম্য নয়। তবুও শিল্পীমন ছবি আঁকার জন্য উতলা। অসুস্থ শরীরে তার স্কেচ করার বিরাম নেই। বড়দিনে স্যাবার্তের একটা প্রতিকৃতি আঁকলো। তাতে দেখালো পাট-পাট ভাঁজ করা গলবস্ত্র, স্পেনীয় ভদ্রলোকের মত মাথায় পালকের টুপি, অথচ চোখ নাক মুখ খুব স্বাভাবিক মানুষের মত নয়।

পিকাসো ছবি আঁকত। মাঝে মাঝে অসুস্থতায়, অবসাদে

আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। হঠাৎ ডাক্তার লচের সন্ধান পেল। অবিশ্বাস্য-ভাবে লচ্ তাকে বৈদ্যুতিক চিকিৎসায় সারিয়ে তুললো। রোগমুক্ত হয়েও পিকাসো ভয়মুক্ত হল না। হাঁটাচলা করতেও আতঙ্ক। মনে হত রোগটা যদি আবার এসে শরীরে ভর করে।

পিকাসোর সাতান্ন বছরে পদার্পণটাই হল অশুভ। এ বছরেই বার্সেলোনা থেকে মায়ের মৃত্যুসংবাদ এল। তার মনে হল দীর্ঘদিন মায়ের সঙ্গে দেখা হয় নি। চিঠিপত্রে যোগাযোগের ক্ষীণধারাটাও অনেককাল শুকিয়ে গেছে।

আঁতিবে

পিকাসো আর একবার প্যারিস ছাড়ার নেশায় পাগল হয়ে উঠল। হিস্পান গাড়ীর স্টিয়ারিং ধরল মারসেল। গন্তব্যস্থল আঁতিবে। যাত্রী পিকাসো, ডোরা মার আর সস্ত্রীক স্যাবার্তে। পালে আলব্যের প্রিমিয়েতে ম'াৱের ছোট ফ্ল্যাটটি তাদের জন্য গুছিয়ে রাখা হল। ঝকঝকে, তকতকে পরিবেশ। পিকাসো এখানে তৃপ্তি পেল। রোজ সকালে সে ও স্যাবার্তে সমুদ্র সৈকতে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এগিয়ে যেত। তারপর ফিরে সমুদ্রস্নান। দুপুরে আহার শেষে সুখনিদ্রা।

বিকেলে ঝরঝরে শরীর ও মন নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকতো জেলে-নৌকার কাছে। একমনে দেখতো ওদের মাছধরা, জালবোনা, জাল শুকোতে দিয়ে জেলেদের জমায়েত হয়ে গল্প করা। সঙ্গে স্যাবার্তে থাকতো। হাত আর মন চঞ্চল হয়ে উঠত তার একটা কিছু করার জন্য।

রাতের বেলায়ও ঘটতো সেই ঘটনা। স্বপ্নের মধ্যে জেলেরা এসে উঁকি দিত। পিকাসো বিছানায় উঠে বসতো। স্যাবার্তেকে চুপিচুপি ডাকতো পাছে ডোরা মারের ঘুম ভেঙ্গে যায়। জনবিরল রাস্তা দিয়ে নিঃশব্দে স্যাবার্তে পিকাসোর পাশেপাশে হাঁটতো। সমুদ্র এলেই থমকে দাঁড়াতো। জেলে-নৌকার টিমটিমে আলোটা জ্বলতো বিদায়ী শুকতারার মত। চারিদিকে ধূসর অন্ধকার। একটানা সমুদ্রের গর্জন। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ঘষা কাচ রঙা ফেনা।

ওরা এগিয়ে আসত জেলে-নৌকাগুলির কাছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে জেলেদের জীবনযাত্রা, মাছ ধরতে যাওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি দেখতো। পিকাসো একদিন বাড়ী ফিরে বড় একটা ক্যানভাসে ছড়িয়ে দিল গাঢ়-নীল, বেগুনী, পান্না ও কালচে-সবুজ রঙ। তাতে

আঁকলো সমুদ্রের বালুকাভূমি। ডোরা মার ও বাইসাইকেলে হাত রেখে জ্যাকুলিন ব্রেঁত লাম্বার। তাদের বিস্ময়দৃষ্টি জেলেদের ওপর। ছবিটির মধ্যে রইল স্তব্ধতা ও স্নিগ্ধতার আমেজ। ফুটে উঠল পিকাসোর মনের কিছুটা প্রশান্তি। কিন্তু সে শান্তি আর স্তব্ধতা বেশীদিনের নয়। পিকাসোর দুঃস্বপ্ন তখন চারদেওয়ালের আশেপাশে ওৎ পেতে বসেছিল।

খবর এল পঁ শারট্রাঁর কাছাকাছি পথ-দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ভলার কয়েকঘণ্টার মধ্যে বিনাচিকিৎসায় মারা গিয়েছে। নিমেষে পিকাসোর সুখের দিনগুলির মাধুর্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সে স্যাবার্তেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি প্যারিসে ফিরলো ভলারের অন্ত্যেস্টি-ক্রিয়ায় উপস্থিত থাকার জন্য।

প্যারিসে ফিরে দিনকয়েকের মধ্যে পিকাসো ভাবলো, যেতে হবে রিভিয়েরাতে।

প্রস্তাব শুনে স্যাবার্তে রাজী হয়ে গেল। যেদিন তাদের রিভিয়েরাতে রওনা হবার কথা তারই পরের দিন ফ্রেঝীতে গবাদিপশুর একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। তাই ফ্রেঝী ঘুরে যাওয়াই তারা স্থির করল। হিস্পান গাড়ীতে সারারাত কাটিয়ে সকাল দশটায় তারা এসে পৌঁছলো প্রদর্শনীর দরজায়।

স্যাবার্তে বড় ক্লান্ত। পা আর চলতে চায় না। পিকাসোরও একই অবস্থা কিন্তু স্পেনীয় ষাঁড় দেখে তার সব অবসাদ কেটে গেল। ষাঁড়গুলির তারিফ করতে করতে প্রদর্শনীটির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে বারকয়েক সে চক্কর দিল। সারারাত অনিদ্রা ও একটানা গাড়ীতে কাটাবার কোন বিরক্তি পিকাসোর মুখে নেই। কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ষাঁড়ের গুণাগুণ বিচার করতে করতে ক্লান্ত স্যাবার্তেকে নিয়ে সে রিভিয়েরাতে পদার্পণ করল। প্রায় সপ্তাহতিনেক সেখানে কাটিয়ে আবার পথের নেশায় ব্যাকুল হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

অগাস্টের মাঝামাঝি আবার যুদ্ধের হুঙ্কারে বিশ্ববাসী শিউরে উঠল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হল। সন্ধ্যার দিকে পিকাসো সমুদ্রের ধারে পায়চারী করত। বেতারে খবর শোনার জন্য প্রায়ই একটা রেস্তোরাঁতে বসতো। সাধারণ লোকেদের টেবিলে থাকতো বীয়ের প্রেসিওঁ। কেউ বা খেত সসেজ দেওয়া লম্বা রুটি। সরগরম রেস্তোরাঁ। একদিন পিকাসো ও স্যাবার্তে দু'টি চেয়ার টেনে বসেছিল। ওয়েটার তাদের সামনে কফি আর ভাজা মাছ দিয়ে গেল। সংবাদ ঘোষিত হচ্ছিল বেতারে। ইউরোপ তখন দ্রুত যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে। খবর শুনতে শুনতে পিকাসো অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কফি জুড়িয়ে জল। আঁতিবেতে শত্রুর আক্রমণ আসন্ন। রিভিয়েরার প্রতিটি মানুষ আতঙ্কিত।

পিকাসো চোখের সামনে ধ্বংসের কালোছায়া দেখতে পেল। গাদা গাদা ছবির জন্য তার ভাবনা ও ভয় হল। তাড়াতাড়ি ছবি বোঝাই করে মারসেলকে দিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দিল রাজধানীতে। ভারাক্রান্ত মন, ডোরা মার ও স্যাবার্তেকে নিয়ে সেও ফিরলো সেখানে।

সন্ধ্যার পর প্যারিসের পথঘাট অন্ধকার। রূপসী প্যারিস তখন মুখে ঠুলি এঁটে নিজের রূপ ঢাকতেই ব্যস্ত। চারিদিকে যুদ্ধের সাজ-সাজ রব। পিকাসোর বন্ধুবান্ধবেরা তখন প্যারিস ছাড়তে পারলেই বাঁচে। পিকাসো প্যারিসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুরা তাকে সে-স্থান ছাড়তে পরামর্শ দিল। আগের যুদ্ধের কথা তার মনে হল। নির্বান্ধব অবস্থায় সেখানে থাকতেও মন বেশী সায় দিল না। তখনই রোয়াঁ যাওয়া স্থির হল। মাত্র কয়েকঘণ্টা রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে

কাটিয়ে ডোরা মার, সস্ত্রীক স্যাবার্তে ও কুকুর কাজবেক্‌কে নিয়ে সে রোয়াঁর পথ ধরল। মারি-থেরেসে ও মেইয়্যা তখন ট্রেনে। তারাও চলেছে রোয়াঁ।

শহরের বাইরে নিরিবিলি থাকাই পিকাসোর পছন্দ। ওটেল ছ্য টিগ্রের কাছে স্টুডিওর জন্য সে ঘর ভাড়া করল। অলসমুহূর্তে উদাস হয়ে সেখান থেকে সমুদ্র দেখতে কোন আড়াল ছিল না। ডিঙ্গি নৌকা আর জাহাজের দূর হতে দূরে মিলিয়ে যাওয়া দেখতেও কোন বাধা ছিল না।

রোয়াঁর যত্রতত্র চলছিল ঘোড়া নিয়ে সৈন্যদের যুদ্ধের মহড়া। এবার পিকাসোর স্কেচের প্রধান বিষয়বস্তু হল ঘোড়া। একদিন স্কেচখাতা খুলে পিকাসো স্যাবার্তেকে বললে—যুদ্ধের ডামাডোলে নিরীহ ঘোড়াগুলি বেঘোরে প্রাণ দেবে। আধুনিক সমরাস্ত্রের কাছে ওদের ক্ষমতা আর কতটুকু।

রোয়াঁ এসেও কি পিকাসোর শান্তি ছিল! কয়েক দিনের মধ্যে সে জানলো বিদেশী হিসেবে রোয়াঁতে থাকতে হলে বিশেষ অনুমতি-পত্র জমা দিতে হবে। অনুমতি আদায়ের জন্য স্যাবার্তেকে নিয়ে সে ছুটলো প্যারিস।

একটি দিন তারা কাটালো প্যারিসে। তারই মধ্যে ঘন ঘন বিপদ সংকেত শোনা গেল। বুঝতে পারল যুদ্ধের গতি প্রকৃতি তেমন ভালো নয়। পিকাসো সে সব আমল না দিয়ে রু-লা বোত্রতি থেকে ছবি আঁকার কিছু সরঞ্জাম নিয়ে আবার ফিরলো রোয়াঁ।

স্যাঁতসেঁতে, ম্লান-আলো স্টুডিওর অভ্যন্তর থেকে পিকাসো কাজের অবসরে তাকিয়ে থাকতো বন্দরের দিকে। বন্দরে সারি-বাঁধা জাহাজ, খালাসীদের বিচিত্র পোশাক, জেটির আলো-ছায়ার নিবিড় সম্পর্ক—পিকাসো বিভোর হয়ে দেখতো। কখনো কখনো ডোরা মার, স্যাবার্তে আর কুকুর কাজবেক্‌কে নিয়ে সে পায়চারী করত। কখনো বা কাফেতে বসে যুদ্ধের গতি প্রকৃতির খবর নিত।

পিকাসো ভাবতো যুদ্ধের মোকাবিলা কেমন করে করা যায় মানুষের প্রতি মানুষের এই ঘৃণ্য হানাহানি অসহ্য, এ অন্যায়। এই মিথ্যা আসুরিক দম্ভের প্রতিকার চাই।

স্যাবার্তের লক্ষ্য চারিদিকে। সে দেখছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ফ্রান্স কতটা এগিয়েছে। সে দেখল রোয়াঁর নগরবাসীদের জন্য এখানে-ওখানে পরিখা খনন করা হয়েছে। তাই দেখে বললে—যুদ্ধ হয়তো জোরালোই হবে। বোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য এতসব হচ্ছে।

কথাশুনে পিকাসো হাসতে হাসতে বললে—এসব হচ্ছে তোমাদের জন্য। তোমাদের মত ভীতুরাই ঐ গর্তে ঢুকে প্রাণ বাঁচাবে।

স্যাবার্তে পাল্টা জবাবে বললে—আমরা কেন? দরকার পড়লে তুমিও মাথা গলাবে ঐখানে।

পিকাসোর হাসি তাতে ক্রমেই বেড়ে চলল। হাসির দমক থামতেই সে হালকা গলায় বললে—খোঁড়াখুড়ি করে মাটির নীচ থেকে কিছু পেলে সেগুলি অবশ্য মিউজিয়ামের সম্পদ বাড়াবে। ওসবে আমাদের দরকার নেই। যা-ই বল, যুদ্ধ তেমন ভয়াবহ হবে বলে আমার মনে হয় না।

পিকাসো গোড়ার দিকে যুদ্ধকে বিশেষ আমল দিতে চাইতো না। সুযোগ পেলেই এ নিয়ে রসিকতা করত।

বছরখানেক কেটে গেল রোয়াঁতে। যুদ্ধের গতি ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে লাগল। শহর প্যারিস আর সেখানে মজুত ছবিগুলির কথা পিকাসোর বারবার মনে হতে লাগল। রোয়াঁতে আর স্থির হয়ে থাকা চলে না। তাই ছবিগুলির খোঁজ করতে সে গেল প্যারিস। একদিন রাস্তায় দেখা অঁরি মাতিসের সঙ্গে। দূর থেকেই কালো ফ্রেমের চশমা আর লাল দাড়ির মাতিসকে সে চিনতে পারলো। পিকাসো তাকে জোর করে দাঁড় করিয়ে বললে—কি ব্যাপার, উদ্‌ভ্রান্তের মত কার কাছে যাচ্ছো?

মাতিস উত্তর করল—দর্জির কাছে। এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই।

যুদ্ধের সময়ে দর্জির কাছে যাওয়ার কথা শুনে পিকাসো মাতিসের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে বললে—আমাদের প্রথম সারির সৈন্যরা একেবারে খতম হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে ওরা রাজধানীতে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করবে।

—আমাদের জেনারেলরা কি করছে? হিটলার বাহিনীকে আটকাতে পারছে না? মাতিস বেশ বিরক্তি প্রকাশ করে বললে।

—আমাদের সেনাবাহিনী? ওদের কথা আর বল না।—পিকাসোর উত্তর শুনে মাতিস আর দাঁড়ালো না।

পিকাসো এবার বেশ কিছু ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে রোয়াঁ ফিরলো। তবুও তার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব ঘুচলো না। তাই তাকে ক্যানভাস দাঁড় করাতে হল মেঝেতে বা চেয়ারের ওপর। চেয়ারের বসার তক্তাটা হল রঙ-গোলার পাত্র। ক্যানভাসের অভাব ঘোচাতে হল শক্ত কাগজ কিংবা কাঠে। স্যাবার্তের একটি প্রতিকৃতিতে আঁকল দ্বিতীয় ফিলিপের আমলের সভাসদদের সৌখিন পোশাক। প্রতিকৃতিটিতে ব্যঙ্গ ও ভালবাসা দুই-ই ফুটে উঠল। ডোরা মারের প্রতিকৃতিতে তার মুখ একই সঙ্গে সামনে ও একপাশে করে দেখানো হল। দেখানো হল চেয়ারে বসা উলঙ্গ মহিলা, তাছাড়া ফল ও মাছের নানা কম্পোজিসন। স্কেচখাতা সে ভরিয়ে তুললো ভেড়ার লোমশ মাথা ও শক্ত চোয়ালের ড্রয়িং-এ।

পিকাসো ছবি আঁকত। সমুদ্রের কূলে কূলে ঘুরে বেড়াতো। প্যারিসের বন্ধুদের জন্য মাঝেমাঝে মন উতলা হত। সেখানকার মূল্যবান ছবি, ভাস্কর্য ও এচিংগুলির নিরাপত্তার কথা মনে হওয়ামাত্র রু-লা-বোত্রতিতে যাওয়া সে স্থির করল। কোনদিনই সে শিল্পী লেগের, কিসলিং, ম্যাকস্ আর্নেস্ট প্রভৃতিদের মত নিজের প্যারিস

থেকে নির্বাসিত হওয়ার কথা ভাবতো না। প্যারিসে গিয়ে এবার সে গাদাগাদা ছবি স্ট্রং রুমে রেখে দিল। যুদ্ধের পরেও ঐ ছবিগুলি সেখানে দীর্ঘদিন পড়েছিল।

কয়েকদিন প্যারিসে কাটিয়ে পিকাসো হিস্পান গাড়িতে প্রচুর ক্যানভাস ও কয়েকটা ঈজেল বোঝাই করল। এবার রোয়াঁ ফিরে তার মনে হল স্টুডিওটা ভিজেভিজে, অন্ধকার, ছোট একটা খুপরি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর 'লে ভোয়ালিয়ে' ভিলার ওপরতলাটা সে ভাড়া করল। এখান থেকেও সমুদ্রের দিকে চেয়ে উদাস হওয়া যেত। তবুও সে অতৃপ্ত।

যুদ্ধ শুরু হবার বছর দু'য়েক পর জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী প্রায়ই সারি বেঁধে চলে যেত তার স্টুডিও কাঁপিয়ে, পিকাসো জানলা দিয়ে অতি সন্তর্পণে তা লক্ষ্য করত। একদিন সে স্যাবার্তেকে আক্ষেপে বললে—এরা একটা আলাদা জাত। এরা যুদ্ধ করে, নিজেদের ভাবে বুদ্ধিমান। বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে। নিঃসন্দেহে এরা উন্নতি করেছে অনেক। কিন্তু তাতে কি! ওদের চেয়ে আমাদের শক্তি অনেক বেশী, আমরা ভাল ছবি আঁকতে পারি। একথা ভাবলেই ওদের আমার খুব বোকা মনে হয়। এত যন্ত্রপাতি, সৈন্যসামন্ত সব নিয়ে কত ঝামেলা করে তবে ওরা এতদূর আসতে পেরেছে। আমরা নিঃশব্দে দ্রুত অনেকদূর চলে যেতে পারি। কি মূর্খ ওরা একবার ভেবে দেখ। কিন্তু এদের এই সর্বনাশা কাজে বাধা দেবার কে আছে?—কথা বলতে বলতে পিকাসো আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ল।

স্যাবার্তে নীরব শ্রোতা। কোন কথা বলে সে পিকাসোর আবেগ রুদ্ধ করতে চাইতো না।

পিকাসোর মনের এই প্রতিক্রিয়া তাকে 'গুয়েনিকা' ধরনের স্কেচ আঁকতে অনুপ্রাণিত করল। ডোরা মারের উৎসাহে সে এমনভাবে একটি বালিকার মাথার বিন্যাস ঘটালো যাতে বালিকাটির একটি চোখ বিস্ময়ে পৃথিবী দেখছে, অপর চোখে টলমলে বিষাদ অশ্রু। মুখের

একদিকে শান্ত, নরম ঠোঁট ও চিবুক। অন্যদিকে জন্তুর মত বিরাট ফুটোসমেত নাক।

আর একটি বড় ক্যানভাসের একদিকে একজন মহিলা ও অন্যদিকে একটি জন্তুর বিয়ে হচ্ছে। ছবিতে মভ, লাল, সবুজ প্রভৃতি রঙের সীমিত ব্যবহার। স্ফিংক্সের মত বিরাট বিরাট উলঙ্গ নারীমূর্তি এবার তার ছবির জায়গা দখল করে নিল। কঠিন ও বিভিন্ন আকারের ফল দিয়ে যেন তাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত। দু'টি ক্ষুধার্ত দানব নারীদেহের পেট ও বুক ছিঁড়েছিঁড়ে খাচ্ছে। কতগুলি ছবিতে ধর্ষিত ও বিকৃত নারীমুখ।

ছবিগুলি বীভৎস কিন্তু 'গুয়ের্নিকা'র মত ভয়ংকর নয়। তাতে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়ে পিকাসোকে নানা প্রশ্ন করল। পিকাসো উত্তরে বললে—'গুয়ের্নিকা'ই তো আমার মনের প্রতিক্রিয়া।

পিকাসো সর্বকালের সর্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবকে 'গুয়ের্নিকা'য় ফুটিয়ে তুলে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করতে চেয়েছিল। যুদ্ধের শেষাশেষি পিকাসো এই যন্ত্রণার হাত থেকে খানিক মুক্তি পেল। ডোরা মারের বিকৃত চোখ ও ঠোঁটের হাল্কা হাসিতে আবার তাকে চেনা গেল। 'রোয়াঁর কাফে' ছবির ঝলমলে রঙে বোঝা গেল পিকাসোর মনের বিষাদ, কালিমা আর তত গভীর নয়।

পুনর্জীবন

রোয়াঁ থেকে ফিরে পিকাসো উঠল রু-লা-বোত্রতির ফ্ল্যাটে। পুরনো ধাঁচের জীবনযাত্রার আবার পত্তন হল। ঘুম ভাঙতো সকাল যখন মধ্যাহ্নে, ফোনে কথা হত ডোরা মারের সঙ্গে তুপুরে হোটেলে খাওয়ার। তারপর রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে ফিরে চলত নিজের সাধনা। নিত্য অভ্যাস মত দো-ম্যাগোতে গিয়ে সন্ধ্যের আসর জমাতো। বন্ধুরা সব জড়ো হত ঐ কাফেতেই। কারফিউ রাতেও পিকাসোর ফেরার কোন নির্দিষ্ট সময় থাকতো না।

সংসারের ব্যাপারেও সেই বিশৃঙ্খলা, অগোছালো একটা ভাব। তার ওপর বিরাট এক সমস্যা—যুদ্ধের বাজারে জ্বালানীর অভাব। রু-লা-বোত্রতি ও রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনের তুটো বাড়িতে একই সঙ্গে জ্বালানী খরচ করা তার নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হল। যুদ্ধের সাজ-সাজ রব দেখে আগে ভাগে সে অবশ্য কিছু জ্বালানী সংগ্রহ করে রেখেছিল রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনের বাড়িতে। কিন্তু সেই মজুত জ্বালানী শেষ হতে আর কতদিন! ফ্লাণ্ডার্স প্রদেশের বাঁকা-নলের একটা স্টোভে এত বেশী জ্বালানী খরচ হত যে সেটা বাতিল করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অথচ সেটাকে সরিয়ে দিতে তার মন চাইছিল না। স্টোভটার সর্বাঙ্গ জুড়ে অপূর্ব কারুকার্য। দীর্ঘদিন ধরে সেটা প্রবেশ পথকে গরম রাখছিল। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে পিকাসো সেটার বদলে একটা কুকার বসিয়ে দিল। তাতেও যে জ্বালানীর খরচ খুব একটা কমল বলে মনে হল না। অগত্যা তাকে রু-লা-বোত্রতি ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে থাকার জন্য মনস্থির করতে হল। বেশ কিছুদিন ধরে পিকাসো একটা কিছু করব-করব ভাবছিল। রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে দিন কয়েক কাটিয়ে জায়গাটা তার বেশ মনে ধরল।

খুশিতে কানওয়েলারকে বললে—আমি রু-দি-র‍্যাভিইঙতে ফিরে এসেছি।

পিকাসো আবার নিজের খেয়ালে মত্ত হয়ে উঠল। টুকিটাকি, হেলাফেলা সব জিনিষই আবার তার নাহলেই নয়। বড় ঘরটাতে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জিনিষের ঢিবি জমে উঠল। নিজের ছবির গাদার সঙ্গে মাতিস, ব্রাক, গ্রি, দুআনীয়ের রুশো, মদিলিয়ানি ছাড়া আরো অনেকের ছবি জড়ো করা হল। ছড়ানো-ছিটানো টেবিল-চেয়ার শিল্পের উপকরণ হিসেবে রইল। নিগ্রো মুখোশ, সিরামিক, মোড়ানো কাচ, পুরনোদিনের ব্রোঞ্জ, প্লাস্টারের ছাঁচ, অদ্ভুত টুপি, সৌখিন বই, হল্যাণ্ডের কাগজ, বিভিন্ন আকারের বোতল, চকলেটের মোড়ক, পাউরুটির টুকরো, সিগারেটের বাক্স, পুরনো জুতো সবকিছুই টেবিলের নীচে অথবা খোলা জায়গায় এলোমেলো, স্তূপাকার। কার্ড বোর্ডের বাক্সে প্রথম জীবনের ড্রয়িং, করুণনা থেকে বোনকে পাঠানো ডায়েরীর ছবি, কাঠ কয়লার স্কেচ, বাবা-মা ও বন্ধু-বান্ধবের ফটো, ফেরানডের আঁকা স্কেচ এক পাশে গাদা করা হল। জীবনে কোন জিনিষ তার ফেলে দিতে ভাল লাগতো না। বাসন-কোসনের অপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলি তার ভাঁড়ারে এসে জমা হল। বাতো লাভোয়ারের পুরনো তেলের বাতিটা পর্যন্ত স্তূপের মধ্যে জড়ো করা। তাই বলে পিকাসোকে কৃপণ ঠাওরানোর কোন কারণ নেই। ছোট্ট পেন্সিল থেকে শুরু করে ভাঙ্গা মরচে-ধরা ছোট বাক্সটা তার যে কোন সময়ে কাজে লাগতে পারে। পিকাসোর মত শিল্পী মানুষের কাছে কোন জিনিষই অকেজো নয়। রোয়াঁ ও আঁতিবে পকেট ভর্তি নুড়ি আর শিশিতে সমুদ্রের নোনা জল সংগ্রহ করা তার একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভ্যালেরির ভাঁড়ার থেকে তো এক সময় কত দামী আর নামী ভাস্কর্য উদ্ধার করা হয়েছিল।

রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে জঞ্জালের স্তূপ দেখে স্যাবার্তে অবাক হয়ে বললে—তুমি একজন স্রষ্টা। ইচ্ছেমত গড়তে আর ভাঙ্গতে

পারো। তোমার এত পুরনো আর ভাঙ্গাচোরা জিনিষ জড়ো করার প্রয়োজন কি ?

পিকাসো গম্ভীর মুখে জবাব দিল—এ সহজ কথাটাও তোমাকে বোঝাতে হবে! আমি তো আর মাথাপাগলা লোক নই যে সবকিছু ধরে রাখবো। তবুও কি জানো একবার যে জিনিষ আমার হাতের নাগালে আসে, তার প্রতি গভীর একটা টানে সেটা আমি কিছুতেই ফেলতে পারি না। এগুলো আমার দেহের রক্ত মাংসের মত প্রিয়, ও প্রয়োজনীয়।

রু-লা-বোত্রতি থেকে অল্‌গা চলে যাবার পরে পিকাসো যেমন একটা অস্থিরতায় ভুগছিল, সে অবস্থাটা আবার একটু একটু করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মধ্যাহ্নভোজ সারতো একটা রেস্তোরাঁয় ল্যা কাতালাঁতে। রেস্তোরাঁর মালিক সুন্দর স্পেনীয় ভাষায় কথা বলত। পিকাসো তাই সহজেই তার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

ল্যা কাতালাঁতে ব্রাসারি মাঝে মাঝে আসত। পিকাসোর সঙ্গে দেখা হলে আড্ডাটা দারুণ জমতো। আলোচনা হত শিল্প সম্বন্ধে। কখনো নিজেদের ছোটবেলার গল্প করতে করতে ফিরে যেত সুদূর শৈশবের দিনগুলিতে। গল্পচ্ছলে ব্রাসারি একদিন পকেট থেকে একটা ফটো বার করে পিকাসোর হাতে দিল।

পিকাসো প্রায় লাফিয়ে উঠে বললে—আরে, এ যে আমার ফটো, এ তুমি কোথায় পেলে ?

ফটোটা গভীর মনোযোগ দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে পিকাসো ভাবলো, চেহারাটা বেশ গাট্টা-গোট্টা, বেঁটে খাটো, মাথার সামনে বিরাট এক টাক, পিছনে হাল্কা উড়ু-উড়ু রূপোলী কেশ, পোশাক-আশাকের কোন ছিরিছাঁদ নেই। মনে মনে ভাবলো, এতগুলি সহচরী যে জীবনে এল, এদের মধ্যে একমাত্র অল্‌গাই তাকে বুর্জোয়া-পোশাক পরিয়েছে। আবার সে ছবিটা দেখল—জামার পকেট ছুটো ঝুলে পড়েছে, কোঁচকানো কলার, গায়ে একটা

পুরনো ফতুয়া, বস্তার মত পাজামাটা ঢলঢল করছে। ফতুয়ার ওপর গোটা দুই উলের জামা। এসব অদ্ভুত পোশাক প'রে দেখতে লাগছে ঠিক লা মঁাসার চাষীর মত। ছবি থেকে চোখ সরিয়ে সে আরেকটু পোশাকের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে চিন্তা করল, ছুটির দিনে বাইরে যাবার সময় নিশ্চয়ই গলায় একটা মাফলার জড়াতে হবে। টাকা-পয়সা অত্যন্ত সাবধানে গোঁজা থাকবে ভিতরের পকেটে। রবিবার আর মঙ্গলবার অবশ্যই বাড়ির বাইরে বেরতে হবে। নিয়মমত বুলভার আঁরি কার্তে গিয়ে মারি-থেরেসের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজ সারতে হবে। বিকেলবেলা মেইয়্যাকে নিয়ে বেড়ানো চাই। মাঝে মাঝে সার্কাস দেখতে পারলে তো কথাই নেই।

রু-দে-গ্রঁা-অগস্তিনে পুরনো বন্ধুদের নিয়মিত আনাগোনা আরম্ভ হল। স্পেনীয় আর ফরাসী বন্ধুরা আবার গল্পগুজবে মেতে উঠল। পিকাসো ভাবলো সে আবার ফিরে এসেছে বাতো লাভোয়ারে। বন্ধু-বান্ধবদের ঘন ঘন আনাগোনা তাকে মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়ে তুলতো। বিরক্তির আভাস ফুটে উঠত চোখে মুখে। আবার কেউ যদি দু' চারদিন তার কাছে না এসে ব্রাকের কাছে যেত তাহলে আর রক্ষা নেই। সে ক্ষোভে, দুঃখে ফেটে পড়ত। ব্রাক এখন তার প্রিয়তম শত্রুদের একজন অথচ এমনি মোহিনীশক্তি দু'জনকে আচ্ছন্ন করে রাখত যে একে অপরের কাজ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে না দেখলে কিছুতেই শান্তি পেত না।

বাতো লাভোয়ারের মত বন্ধু পরিবেষ্টিত হলেও পিকাসোর স্পেনীয় ও ফরাসী বন্ধুরা কিন্তু কখনো একে অপরের প্রতি আন্তরিক হতে পারলো না। তাছাড়া স্যাবার্তে তার সতর্ক প্রহরী। সহজে সে কাউকে পিকাসোর কাছে ঘেঁষতে দিত না। বিশেষ করে তার ওপর কোন মহিলার বিন্দুমাত্র দুর্বলতার আঁচ পেলে তো কথাই নেই। অথচ তার প্রতি স্যাবার্তের শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার অন্ত ছিল না। কিন্তু পিকাসোর বন্ধু ও দর্শনার্থীদের প্রতি সে যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন,

স্পেনের গৃহযুদ্ধের ফলে রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে যেসব স্পেনীয় বন্ধুরা আসতে শুরু করেছিল তাদের আনাগোনা বন্ধ হল না। ফিন, জেভিয়ার ভিলাতো, আন্তনি ক্লাভে, পেদ্রো ফ্লোরে, অরটিজ স্থ জারতি ও ভাস্কর ফেনোসা নিয়মিত চক্কর দিত পিকাসোর স্টুডিওতে। দেশের দুর্দিনে এদের শিল্পসাধনাকে সে যথেষ্ট সমাদর করত। এদের মধ্যে ফ্লোরে এবং ফেনোসার সঙ্গে সে একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ঠিক এসময়ে স্যুররিয়ালিস্ট চিত্রশিল্পী অসকার ডমিনিগে ষাঁড়ের লড়াই-এর দিকে আকৃষ্ট হল। বাজারে ডমিনিগের চিত্রের চাহিদা কম। তাই সে ভেবেচিন্তে পিকাসোর অনুকরণে ছবি আঁকতে আরম্ভ করল। ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ছবিকারবারীরা লুফে নিল। পিকাসো আগাগোড়া সব ব্যাপারটাই জানতো। নিজের ছবির জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে সে ডমিনিগেকে কোনরকম তিরস্কার করল না।

রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে আসত ব্যারন মোলেত, জঁা মারে, ককতো, ক্রিশতিয়ান জেরভো ও ফটোগ্রাফার ব্রাসারি। পিকাসোর বন্ধুদের এই আড্ডায় ডোরা মার যোগ দিত না। পিকাসোর সঙ্গীদের তার বেশী পছন্দ ছিল না। মধ্যাহ্ন ভোজের পর ডোরা মার তাকে সঙ্গে করে ফিরে যেত রু-দ্য-সাভোয়াতে। বিকেলবেলা ডোরা মারের সঙ্গে কাটাতেই সে পছন্দ করত। সে সময় ডোরা মারকে উপহার দেবার জন্য পিকাসো সঙ্গে নিয়ে যেত খোদাই করা ছোট ছোট নুড়ি, টিনের পাখী ও কার্ডবোর্ডের নানা মূর্তি। ছোটবেলায় মালাগাতে বসে সে যেমন খেয়ালীমনে নানা জিনিষ তৈরি করত এগুলিও অনেকটা সে ধরনেরই ছিল।

ডোরা মারের পোষা কুকুর বিকন হঠাৎ মারা গেল। সেই শোকে ডোরা মার অভিভূত। সান্ত্বনা দিতে পিকাসো তৈরি করল কাগজের কয়েকটি কুকুর। এই উপহারগুলিই ডোরা মারকে করল ঐশ্বর্য-শালিনী। তার প্রেমিকাদের মধ্যে আর কেউ উপহারে এত সৌভাগ্যবতী হতে পারে নি।

দিকে দিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ হিটলারবাহিনী। চলল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব। ইহুদী আখ্যা দিয়ে ম্যাকস্ জাকবকে বন্দী করল জার্মান সেনাবাহিনী। বন্দী-শিবিরে সে পেল নিষ্ঠুর ব্যবহার। জাকব আক্রান্ত হল নিউমোনিয়ায়। রোগ ক্রমশঃ তার বেড়ে চলল। সংবাদ পেয়ে পিকাসো, স্যালমঁ, ব্রাক, উৎরেলো, মাক্ অরলাঁ প্রভৃতি একসঙ্গে জাকবের মুক্তির জন্য জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালো। কিন্তু এই আবেদন অনুযায়ী মুক্তির আদেশ কার্যকরী হওয়ার আগেই জাকব শিবিরের সমস্ত কঠোর নিয়মকানুন ও অত্যাচার অবজ্ঞা করে পৃথিবীর মায়া কাটালো। পিকাসো ও ককতো উপস্থিত হল জাকবের শেষকৃত্যের সময়। জানালো অন্তরের গভীর ভালবাসা।

এরপর আরম্ভ হল দখলদার সেনাবাহিনীর সঙ্গে পিকাসোর রেষারেষি। অনেক অনুরোধ সত্বেও পিকাসো জার্মান-সমর্থক হতে রাজী হল না। দিনকয়েকের মধ্যে জার্মান মিউজিয়াম হতে তার ছবি টেনেটেনে নামানো হল। ইহুদী প্রতিপন্ন করার জন্য তার নামে চলল অপপ্রচার। তাতে অবশ্য পিকাসোর কোন ক্ষতি হল না। জার্মানবাহিনী কড়া হুকুম দিল তাকে স্ট্রং-রুম খোলা রাখার জন্য।

ওদিকে মাতিস তার ছবি নিয়েও অত্যন্ত বিচলিত। পিকাসোর স্ট্রং-রুমের পাশেই ছিল তার স্ট্রং-রুম। মাতিস অসুস্থ। কাতর হয়ে পিকাসোকে তার ছবিগুলি রক্ষা করার কথা জানালো। সে কায়দা করে মাতিসের কিছু ছবি ঢোকালো নিজের স্ট্রং-রুমে। বন্ধুর প্রতি প্রীতির জন্য এ যাত্রায় মাতিসের কিছু ছবি রক্ষা পেল।

জার্মানসেনা পিকাসোর 'গুয়ের্নিকা' ছবি দেখে থমকে দাঁড়ালো। পিকাসোকে জিজ্ঞেস করল—এটা কি তুমি করেছ?

পিকাসো নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—একাজ তো তোমাদেরই।

চুনোপুঁটি জার্মানরা পিকাসোর কাছে তখনও ছবি চাইতো। নিছক ব্যঙ্গচ্ছলে পিকাসো 'গুয়ের্নিকা' ছবিটি পোস্টকার্ডে ছেপে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিত।

পিকাসোর মতিগতি বোঝা দায়। শত্রুরা সুযোগ বুঝে তার নিন্দায় তৎপর হয়ে উঠল। কিউবিজম্ পর্যায় থেকে ভ্লামিঙ্ক তার প্রতিদ্বন্দ্বী। এবার ভ্লামিঙ্ক তার কমেডিয়া প্রবন্ধে পিকাসোর বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্‌গার করল। নিন্দা আর অপপ্রচারে পিকাসোর কিছু যায় আসে না। দীর্ঘদিনের সুনাম ও সুখ্যাতি রচনা করল তার শত্রুদের সামনে ব্যূহ। প্রহরী হিসেবে কাজ করল আঁদ্রে দুবোয়া। সে ফরাসী সরকারের অধীনে পুলিশের প্রিফেক্ট ছিল। পরে মরক্কোতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল। প্রখ্যাত গল্পলেখিকা কারমঁ্য টিসিএর তার স্ত্রী।

পিকাসোর কাজের গতি দুর্বার। আপনমনে সে ছবি আঁকত, মূর্তি গড়ত, খোদাই করত। রাত্রি হলেই আরেক খেয়াল তার মাথায় চাপতো। ছোট একটা বাতি হাতে নৈশ-অভিযানে নিঃশব্দে সে রাস্তায় পা বাড়িয়ে দিত। দীর্ঘ চারবছর ধরে শুরু হয়েছে তার দানবীয় মূর্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ভয়ংকররূপে ডোরা মারকে আঁকতে যেমন তার কোন ক্লান্তি ছিল না তেমনি ডোরা মারের দানবীয় রূপের পাশে তার তুলিতে নুশ ও মেইয়্যা তখন ছিল কত কোমল ও নির্মল।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্স খাদ্যের অভাবে পড়ল। পিকাসোও এই সংকট থেকে রক্ষা পেল না। তার ছবিগুলির বিষয়বস্তু হল হরেক রকমের খাবার—মুরগী, ষাঁড়ের মাথা, গলদা চিংড়ি ও নানা রকম ফল। খাদ্য-বস্তুর অনটনটাই সে পূরণ করতে চাইলো ছবির মধ্যে। তবুও ছবির বিষয়বস্তু মনে হল কেমন নীরস। রঙের জৌলস গেল কমে।

পিকাসোর খাতা স্কেচে ভরে উঠল। স্কেচে দেখা গেল হাজার-হাজার মাথার খুলি ভেসে চলেছে রক্ত বন্যায়। ভ্যালেরির স্কোয়ারে প্রদর্শিত হল এই স্কেচগুলি। সঙ্গে কিছু ভাস্কর্য। আর একটি স্কেচে একজন গেঁয়ো-লোক ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় হাতে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে। মানবিক চেতনাই পিকাসোকে বারবার এ ধরনের স্কেচ করতে উদ্বুদ্ধ করছিল।

যুদ্ধকালীন শেষ ভাস্কর্য দু'টি প্রকাশিত হল যুদ্ধশেষের প্রায় বছর দুই আগে। পিকাসো রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনের স্নানঘরে কাজ করত। যুদ্ধের সময়ে সীমিত বিদ্যুতের ব্যবহারের আইনকানুনে এ ঘরটাই গরম রাখা তার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। মূর্তিগড়াও এখানেই আরম্ভ হল। প্রথম মূর্তির ফ্রেমটি ছিল হালকা। মাটির চাপে সেটার যেকোন মুহূর্তে ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা ছিল। সেই ভয়ে সে ছাদের হুকের সঙ্গে মূর্তিটি বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করল। তাছাড়া দ্রুতহাতে মূর্তিটি গড়ারও একটা তাড়া ছিল। পিকাসো তাই এলুয়ার ও মারসেলের সাহায্যে কাদামাটি শুকিয়ে যাবার আগেই সেটা প্লাসটারে ঢালাই করে ফেললো। নতুন কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে শুরু করল পুরনো ভাস্কর্যগুলির ঝাড়পোঁছ।

পিকাসোর প্লাসটারে মূর্তি ঢালাইয়ের কাজ স্যাবার্তের মোটেই পছন্দ হল না। তাই সে পিকাসোকে প্রশ্ন করল—মূর্তিগুলিকে কি দীর্ঘায়ু করার কোন বাসনা নেই?

—কি অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার! পিকাসো বিরক্তি প্রকাশ করল।

স্যাবার্তে বললে—প্লাসটারের আয়ু সম্বন্ধে তোমার যথেষ্ট ধারণা আছে। শক্ত জিনিষ দিয়েই তোমার মূর্তিগড়া উচিত।

পিকাসো চিন্তিত হয়ে বললে—কি যে করি? যুদ্ধের বাজারে ব্রোঞ্জের যে খুব অভাব।

অবশেষে স্যাবার্তের পরামর্শে পিকাসো পঞ্চাশটি মূর্তি ব্রোঞ্জে তৈরি করতে মনস্থ করল। এদিকে জার্মানরা আরম্ভ করল আরেক

তাণ্ডব। তারা প্যারিসের উন্মুক্ত স্থানের মূর্তিগুলি গলিয়ে ফেলছিল, যদিও এসব ধাতু দিয়ে কোনরকম অস্ত্র তৈরি করার পরিকল্পনা তাদের ছিল না। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল ঘনিষ্ঠ শিল্পীবন্ধু আরনো ব্রেকারকে দিয়ে পিকাসোর তৈরি কিছু মূর্তি ব্রোঞ্জে ঢালাই করা। হিটলারের বেশী পছন্দ ছিল তার 'লম্বা পোশাকে নারী' ও 'কনুইতে ভর দিয়ে বসে থাকা মহিলা'। ব্যাপারটা পিকাসোর আদৌ পছন্দ হল না। সে সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল তার ভাস্কর্যগুলিকে ধাতুতে ঢালাই করতে। ঢালাই কারখানায় পড়ল একটা তোড়জোড়। মনে মনে সে ভাবলো এতে হয়তো হিটলারের বিরুদ্ধে ছোটোখাটো প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

এদিকে যুদ্ধ প্রায় শেষ হতে চলল। জার্মানীর পরাজয় আসন্ন। মার্চ মাস। প্যারিসের জনজীবন বেশ শান্ত। পিকাসো বাইরে বেরবার জন্য চঞ্চল। এপ্রিল মাসের গোড়াতে সূর্যের তেজ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। পিকাসো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে তার স্কেচের সরঞ্জাম। সেইন নদীর অল্প দূরে মারি-থেরেসের সঙ্গে হঠাৎ তার দেখা। পিকাসোকে সে বললে—যুদ্ধের আতঙ্ক মুছে গেছে। দেখ নদীর পাড়ে কেমন ভীড় জমেছে।

—এতে অবাক হবার কি আছে? আজকের সকালটা কি সুন্দর। নদীর জল কেমন সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে।

—এত সব দেখার আমার সময় নেই, মনও নেই। তোমাদের মত শিল্পীরা দেখছি সব ক্ষেপে উঠেছে।

—কি আশ্চর্য! মারি-থেরেসে, এ তুমি কি বলছো? এ রোদ-টুকুর জন্য আমাদের কত আকাঙ্খা। মেইয়্যার খবর কি?

—এত সব খবরে তোমার দরকার কি? আমি চললাম।

মারি-থেরেসে আর অপেক্ষা করল না।

পিকাসো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এত মনোরম সকালে কোনরকম বাক্‌বিতণ্ডা করার তারও ইচ্ছা ছিল না। কালক্ষেপ

না করে পিকাসো কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্কেচ এঁকে নিল। তারপর ধরল রু-দে-গ্রঁ্যা-অগস্তিনের পথ।

বাড়ী ফিরে সোফায় গা এলিয়ে সে স্কেচগুলি উল্টেপাল্টে দেখল। মনে মনে ভাবলো, বেশ ইম্প্রেশনিস্টদের মত কাজ হয়েছে। এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটা নিগ্রো-মুখোশ হাতে নিয়ে বন্ধ জানলার পাল্লা দু'টো খুলে দিল। বাইরে স্বচ্ছ আকাশ। মন তার খুশিখুশি। সে দেখলো জানলার বাড়তি জায়গায় একটা টমেটো গাছ। তাতে দু'টো লাল টকটকে টমেটো ঝুলছে। বন্ধুর উপহার দেওয়া টবসুদ্ধ এই চারাগাছটির কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। সে এই টমেটো গাছকে কেন্দ্র করে আঁকল একটি চিত্র—'টমেটো চারা ও সুরাপাত্র।' চিত্রটির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে উঠল যুদ্ধের তাণ্ডব। কিউবিজমের ভাবধারা গোটা ছবি জুড়ে। ছবির রেখাগুলি জোরালো। অন্যান্য চিত্রের মত এতেও রঙ, আলো ও অন্ধকারের নাটকীয় অভিব্যক্তি ঘটল।

ব্যঙ্গ নাটক : 'লেজে জড়ানো কামনা'
(ডিজায়ার কট্ বাই দি টেল্)

যুদ্ধ থেকে হাঁফ ছাড়ার জন্য পিকাসো দিনরাত মেতে রইল শিল্পের অনুশীলনে—কখনো রঙ-তুলি-ক্যানভাস, কখনো এচিং, নয়তো ভাস্কর্য। যখন এর কোনটাতে মন লাগতো না তখন খাতা কলম নিয়ে বসতো সাহিত্যচর্চা করতে। অল্গার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে লেখার ঝোঁকটা ক্রমশঃ তার বাড়ছিল। কোন চিন্তা মাথায় ঢুকলে তার অভিব্যক্তি হত কবিতা, ব্যঙ্গ ও রম্যরচনার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধের বিভীষিকা কাটাতে সে রু-দা-বোত্রতিতে রাতে বসে স্কেচখাতায় লিখে ফেললো একটি স্যুররিয়ালিস্টিক ব্যঙ্গনাটক—'লেজে জড়ানো কামনা'। এতে যুগযন্ত্রণার ফলে শীত ও বুভুক্ষাজনিত কষ্টকে ঠাট্টা-তামাশাচ্ছলে পাঠকের সামনে তুলে ধরে হাসির উদ্রেক করা হল। এতে আছে অনুকারশব্দ প্রয়োগ।

মলাটের পরের পৃষ্ঠায় একদিকে আছে 'লেজে জড়ানো কামনা' নামটি, অন্যদিকে রয়েছে কালিতে আঁকা লেখকের একটি ছবি। ঘরের চালেবসা মাছির যেমন দৃষ্টি থাকে নীচে লেখকের ছবিটিও তেমনি—তার হাতে কলম, কপালে তোলা চশমা। নাটকটি একটি বিষাদময় কমেডি।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ডাইনিং টেবিলে সাজানো রয়েছে শূকরের মাংস, মাছ, মদ ও একটি প্লেটে মানুষের মুণ্ডু। টেবিলের নীচে কয়েকটি চরিত্রের পা দেখা যাচ্ছে। চরিত্রগুলির নায়ক বৃহৎপদতল। লেখকই নায়ক। তার একটি স্টুডিও আছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী

পেঁয়াজমশাই। প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে নায়িকা চাটনীকে কেন্দ্র করে। নায়িকার সঙ্গে রয়েছে তার দু'বন্ধু—চর্বি ও হালকা ভাবনা। পেঁয়াজ-মশাই, বৃহৎপদতল ও গোলপ্রান্ত সম্মান জানাচ্ছে শ্রীমতী চাটনী ও তার বোনকে। দৃশ্যটির স্থান—স্নানপাত্র। পাত্র ভর্তি সাবানের ফেনা।

বোন—এভাবে চালালে আমি গা-ধোওয়া বন্ধ করে পালিয়ে যাব।

চাটনী—আমার সাবান কোথায়?

বৃহৎপদতল—অকালপক্ক, বাচাল।

পেঁয়াজমশাই—হ্যাঁ ঐ বাচালটার কথাই হচ্ছে।

চাটনী—সাবানটা কি দারুণ, গন্ধটা মনমাতানো।

গোলপ্রান্ত—আমি আরও সুগন্ধী সাবান দেব।

বৃহৎপদতল—মানিক সোনা রে। আমি কি তোমাকে সাবান মাখিয়ে দেব? এ কাজটা কি আমাকেই করতে হবে?

গোলপ্রান্ত—কি রে কুত্তা···

ওদের কথাবার্তা, স্নান শেষ না-হতেই দু'টি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। সাবানমাখা ঐ চরিত্রগুলি যে যেমন ছিল শুরু করল পালাতে। চাটনী বিবস্ত্রা, পায়ে শুধু মোজা। স্নানপাত্র থেকে বেরিয়ে তারা ঘাসের ওপর চুবড়ি থেকে মদ ও কাঁটাচামচ গুছিয়ে বিরাট এক ভোজের আয়োজন করল। ইতিমধ্যে সেখানে কফিন নিয়ে কয়েকজন ডোম এসে হাজির হল। তারা দলের সবাইকে চাদরে জড়িয়ে কাঠের বাক্সে পুরে পেরেক দিয়ে এঁটে বয়ে নিয়ে চলল।

নাটকটির শেষ এখানেই হল না। পরের অঙ্কে চরিত্রগুলিকে আবার মঞ্চে উপস্থিত হতে দেখা গেল যদিও কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর ঘটল না। নাটকের তামাশা তুঙ্গে উঠল যখন বৃহৎপদতল আহ্বান জানালো—বাতি ধর। সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুঘুদের তাড়াও।

গোলাগুলির কোন ভয় নেই। বিধ্বস্ত বাড়িগুলিকে নিরাপদে তালা এঁটে রাখ।

এরপর রঙ্গমঞ্চে এল মানুষের আকারের চোখ ঝলসানো এক সোনার বল। তাতে লেখা 'কেউ না'।

পরবর্তীকালে আভঁ গাদ গোষ্ঠী রোম, ভিয়েনা এবং লণ্ডনে এটি অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ষষ্ঠ প্রণয়

রেস্তোরাঁ ল্যু কাতালাঁ। সময় সন্ধ্যা। পিকাসো পানীয়ে গলা ভিজিয়ে গল্পে মশগুল। ডোরা মার তার মুখোমুখি বসে। পাশে ছবি-কারবারী এক মহিলা। পিকাসোর বাঁদিকের টেবিল থেকে ভেসে আসছিল স্পেনীয় ভাষা। ডানদিকের টেবিলে তার হঠাৎ নজরে পড়ল অভিনেতা এলেন কুনি দু'বান্ধবীকে নিয়ে বসেছে। এলেন কুনির বান্ধবীদের একজন রয়েছে পিছন ফিরে, অন্যজন পিকাসোর চোখের সামনে। বসন্তের সদ্যফোটা ফুলের মত তাজা তার চেহারা। সরোবরের জলের মত স্বচ্ছ দু'টি বড় চোখ, কপাল জুড়ে সবুজ একটা ফিতে প্রায় ভ্রূ পর্যন্ত ঢাকা, গালে কালো তিল—সব মিলিয়ে নিটোল গড়নের এক ফরাসী মেয়ে। মেয়েটির রূপ পিকাসোকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকলো। পিকাসো ভাবলো, পরিচিত এলেন কুনির সঙ্গে দেখা করা অবশ্যকর্তব্য। ডোরা মার তখন সেই মহিলার সঙ্গে চুপিচুপি কথা বলতে ব্যস্ত।

—এলেন কুনি না! কই তোমার বান্ধবীদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলে না তো? উঠে গিয়ে এলেন কুনির ঘাড়ে হাত রেখে পিকাসো বলল।

এলেন কুনি বললে—এ হচ্ছে ফ্রাঁসোয়া জিলো। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। আর এ জেনেভিয়েত্—অপূর্ব সুন্দরী। একে দেখে রূপসী মনে হচ্ছে তো?

পিকাসো গলা ছেড়ে হেসে বললে—তুমি যে একেবারে অভিনয় করছ এলেন কুনি। ভাল কথা, বুদ্ধির পরিমাপ তুমি কেমন করে করবে?

জেনেভিয়েত্ তার উত্তরে বললে—ফ্রাঁসোয়া তো ফ্লরেন্টাইন্ কুমারী।

সকলে গলা মিলিয়ে হেসে উঠল।

পিকাসো বললে—খুব ভাল কথা। মহাশয়াদের পরিচয়?

জেনেভিয়েত্ বললে—মহাশয়, আমরা চিত্রশিল্পী বই আর কিছু নই।

পিকাসো এবার হাসতে হাসতে বললে—এতক্ষণে একটা মজার খবর পেলাম। অবশ্য তোমাদের মত মেয়েরা যে চিত্রশিল্পী হয় এটা আমি আগেই আন্দাজ করেছি। শোনো, শোনো, আমিও একজন চিত্রশিল্পী। ছবি দেখতে তোমরা একদিন আমার স্টুডিওতে চলে এস।

ফ্রঁাসোয়া জিজ্ঞেস করল—কবে?

কালকেই।

ফ্রঁাসোয়া বললে—কাল হবে না, তবে সামনের সপ্তাহে নিশ্চয়ই একদিন যাব।

—সে তোমাদের মর্জি বলে পিকাসো নিজের টেবিলে ফিরে গেল। ডোরা মার এতক্ষণ তাকে অস্থিরভাবে লক্ষ্য করছিল। এবার কাছে যেতেই সে একটা সন্দিগ্ধদৃষ্টি বুলিয়ে ছবিকারবারীকে নিয়ে কাফের দরজার দিকে এগোলো।

পরের সপ্তাহে ফ্রঁাসোয়া ও জেনেভিয়েত্ পিকাসোর রু-দে-গ্রঁা-অগস্তিনের আস্তানায় হাজির হল। কড়া নাড়তেই তিন চার ইঞ্চি দরজা ফাঁক করে স্যাবার্তে জিজ্ঞেস করল—অ্যাপয়নট্‌মেণ্টটা কি করা হয়েছে?

ফ্রঁাসোয়া বললে—নিশ্চয়ই। মহাশয়, আমাদের ঢুকতে দিন।

অগত্যা স্যাবার্তে তাদের ঢোকার অনুমতি দিল। ভিতরে ঢুকে ওদের নজরে পড়ল খাঁচা-ভর্তি নানা ধরনের পাখী, সোফা ও চেয়ারের ওপর গীটার, ম্যানডোলিন, আরো অনেক বাদ্যযন্ত্র। ওরা বুঝলো পিকাসো এগুলি কিউবিস্ট পর্যায়ে সংগ্রহ করেছিল। দু'টো বড় টেবিলে সংবাদপত্র, ফটো, ম্যাগাজিন, বই সব তালগোল পাকানো।

কয়েক পা এগোতেই ওরা দেখল ঘরের ঠিক মাঝখানে টেবিলের তলায় কি একটা বস্তু পড়ে আছে। স্যাবার্তে সেটা তুলে রাখলো। ওরা কাছে এসে বুঝলো ব্রোঞ্জের তৈরি একটা মাথার খুলি।

একদিকে মাতিস, হুআনীয়ের রুশো, মদিলিয়ানির ছবি জড়ো করা দেখে ফ্রাঁসোয়া বললে—মাতিসের আঁকা স্টীল লাইফটা কি অপূর্ব!

স্যাবার্তে পিছন থেকে গম্ভীর গলায় বললে—এখানে শুধু পিকাসো।

ওরা উঠে গেল তিনতলায়। সাত আটজন লোক পিকাসোকে ঘিরে। নাবিকের মত নীল ডোরাকাটা গেঞ্জি তার গায়। পরনে পুরনো ট্রাউজার।

ওদের দেখে পিকাসো খুশিতে বললে—আমি কি নিজেই তোমাদের ঘুরে ঘুরে সব দেখাবো?

ফ্রাঁসোয়া আর জেনেভিয়েত্ একটু অবাক হল। ভাবলো—কি আশ্চর্য, পিকাসোর মত শিল্পী নিজে ছবি দেখাবে!

চারিদিক ঘুরে সেদিন ওরা পিকাসোর শিল্পকর্ম দেখল। তারপর একসময় বিদায় নিল।

জেনেভিয়েত্ একমাসের ছুটি কাটাতে দক্ষিণফ্রান্স থেকে প্যারিসে এসেছিল ফ্রাঁসোয়ার কাছে। ছুটি শেষে সে ফিরে গেল। আরেকদিন ফ্রাঁসোয়া একাই গেল পিকাসোর স্টুডিওতে।

সেদিন ফ্রাঁসোয়া দেখল কতগুলি সিগারেটের বাক্স গাদা করে রাখা হয়েছে। এই বাক্সগুলির ওপর চেয়ারে বসা কিছু নারীমূর্তি আঁকা। তাই দেখিয়ে পিকাসো বললে—নানা রকম কার্ডবোর্ড জুড়ে এগুলির সৃষ্টি। মাঝের ছবিটির দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার বললে—এই টর্সো মূর্তিটিকে আমি মাঝখানে রেখেছি। এর চুলগুলি লক্ষ্য কর—দড়ির মত। এগুলি ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মাঝামাঝি সময়ের।

ফ্রাঁসোয়া দেখল টর্সোমূর্তিটি যে চেয়ারে বসানো সেই চেয়ারের ফ্রেমগুলি দড়ি দিয়ে তৈরি। এর নীচে সিগারেটের বাক্স দিয়ে

মঞ্চ নির্মিত হয়েছে। মঞ্চের অভিনেতাদের আকৃতি দৈর্ঘ্যে ছোট সেপটিপিনের মত। রিলিফগুলি স্যুররিয়ালিস্ট কায়দায় বানানো।

—কি করে এগুলি তৈরি করলেন? ফ্রাঁসোয়া কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করল।

পিকাসো ঘাড় নাড়িয়ে বললে—ছোট ছোট ক্যানভাসে এ জিনিষ করার অভ্যেস আমার দশবছর আগে থেকেই ছিল। সব জিনিষ ঠিক ঠিক জায়গায় সাজিয়ে শিরিসের আঠা দিয়ে জুড়ে বালি ছড়িয়ে রাখাই এর বৈশিষ্ট্য।

ফ্রাঁসোয়া ঘুরতে ঘুরতে একটা মাঝারি আকারের ঘরে ঢুকলো। টেবিলের ওপর কয়েকটি যন্ত্রপাতি নেড়ে পিকাসো বললে—মূর্তি গড়ার কাজ শেষ করতে এগুলি আমি ব্যবহার করি।

কথা বলতে বলতে পিকাসো একেবারে ফ্রাঁসোয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে ফ্রাঁসোয়ার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ-ই পিকাসো তাকে একটা চুমু খেয়ে প্রশ্ন করল—এ···ই ফ্রাঁসোয়া, কিছু মনে করলে?

মৃদু হেসে ফ্রাঁসোয়া বললে—উঁহু।

পিকাসো আবার জিজ্ঞেস করল—তুমি কি আমায় ভালবাস?

ফ্রাঁসোয়া হালকা গলায় বললে—এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোন গ্যারান্টি দিতে পারবো না।

এরপর আর একদিন···

সেদিন ফ্রাঁসোয়া পিকাসোর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। স্যাবার্তে আপন মনে পিকাসোকে শুনিয়ে শুনিয়ে গজগজ করছিল—অনেক তো দেখলাম, মেয়েদের আসা যাওয়ার তো বিরাম নেই। অল্গা কখ্‌লভা ছিল কত সুন্দরী। বিয়ে করলে তাকে, ছেলেও হল, সেও তো প্রায় ফ্রাঁসোয়ার সমবয়সী। তাকেও ঘর করতে দিলে না। তারপর এল সেই পুরুষালী গড়নের ডোরা মার। বিয়ে-থা না করে কতগুলি বছর তার সঙ্গে কাটালে। এখন তাকে অপছন্দ। যতসব

ছুঁড়ীদের দিকে তোমার নজর। এসব ঝক্কি তো আমাকেই পোহাতে হয়।

পিকাসো তার পাল্টা জবাবে বললে—মেয়েদের ভালবাসার জোরেই তো আমি এতদিন বেঁচে আছি।

পিকাসোর ছলছল চোখ দেখে ফ্রাঁসোয়া ঘরে ঢুকে বললে—বাঁচামরার হিসেবটা এখন মুলতবী রাখুন। কথাটা শেষ হতেই ফ্রাঁসোয়া পিকাসোর দিকে এগোলো। প্রথম দর্শনেই সে পিকাসোকে ভালবেসে ফেলেছিল।

এরপর থেকে ফ্রাঁসোয়া ও পিকাসোর দেখাশোনা বেশ ঘনঘন হতে লাগল। পিকাসো ফ্রাঁসোয়াকে পাওয়ার জন্য আকুল। ফ্রাঁসোয়া যতই মেলামেশা করুক না কেন সে পিকাসোর সংসার-জীবনে ঢুকতে চাইলো না। বারবার ভাবলো ডোরা মারের কথা। ভাবলো, ডোরা মার তার চেয়ে কুড়ি বছরের বড়। আর পিকাসো বড় ডোরা মারের চেয়ে আরো কুড়ি বছরের। এই বিশাল ব্যবধানের মাঝখানে সে কেমন করে দাঁড়াবে।

ফ্রাঁসোয়ার মনের কথা বুঝতে পেরে পিকাসো জোর করে একদিন তাকে টেনে নিয়ে গেল ডোরা মারের গৃহে। ঘরে ঢুকেই সে বলতে শুরু করল—ফ্রাঁসোয়া আজকেই তোমাকে ডোরা মারের মুখ থেকে শুনিয়ে দিচ্ছি যে আমরা দু'জনেই প্রায় বিচ্ছিন্ন। দেখাশোনা হয় খুব কম। আর ডোরা মারকে বললে—শুধু একথাটা জানাতেই ফ্রাঁসোয়াকে আমি এখানে টেনে এনেছি। তোমার জন্য ফ্রাঁসোয়া আমার সঙ্গে ওর জীবন জড়াতে ভয় পায়।

ডোরা মার ঠাণ্ডা একটা দৃষ্টি ফ্রাঁসোয়ার দিকে বুলিয়ে পিকাসোকে বললে—তুমি খুব মজার লোক। আটঘাট বেঁধে যতই তুমি পা বাড়াও না কেন শেষরক্ষা আর হয় না। তুমি কি কোনদিন কাউকে ভালবাসতে পেরেছো? ভালবাসা তোমার জানা নেই।

সেদিন পিকাসো প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল। রাগে তার চোখমুখ

লাল। ফ্রাঁসোয়ার হাত ধরে বললে—বিশ্বাস করো ফ্রাঁসোয়া, ডোরা মারের কোনকিছু বোঝার মত সুস্থ অবস্থা নেই।

ডোরা মার স্থির দৃষ্টি পিকাসোর দিকে মেলে বললে—আমি তোমাকে যা বলতাম সেটাই তো তুমি বলে দিলে, তা তুমি যাই বল আমি তোমাকে ছাড়বো না।

তারপর পিকাসো প্রায় টানতে টানতে ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে এল রাস্তায়। উত্তেজনায় সে কাঁপছিল। ফ্রাঁসোয়াকে ধমক দিয়ে বললে —সব কিছুই তোমার জন্য করছি। সত্যি বলছি তোমার মত আমি আর কাউকে ভালবাসি নি। তোমার এই নির্বিকার ভাব দেখে সেইন নদীর জলে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

ফ্রাঁসোয়া ভাবলো, অনেক হয়েছে। পিকাসোর মেজাজ একটু ঠাণ্ডা করা দরকার। তাই সে ট্রেন ধরার জন্য সোজা সাবওয়ের দিকে এগিয়ে গেল। পিকাসো চলল তার পিছু পিছু।

দিন কেটে চলল। পিকাসোর কাতরতা আর আকর্ষণ ফ্রাঁসোয়া কিছুতেই দূরে ঠেলতে পারলো না। কিন্তু সেটা ফ্রাঁসোয়ার বাবার মোটেই পছন্দ ছিল না। সে তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। আদর আর স্বাধীনতায় তার স্বভাব হয়েছিল খানিকটা পুরুষালী ধাঁচের। অল্প বয়সে মাতৃহারা ফ্রাঁসোয়ার বাবাই কিন্তু এজন্য দায়ী। প্রৌঢ় পিকাসোকে কেন্দ্র করে বাবা ও মেয়ের মন-কষাকষি উঠল চরমে। স্বাধীনচেতা ফ্রাঁসোয়া বাবার কোন নিষেধ মানতে রাজী হল না। সে চলে এল বৃদ্ধা ঠাকুরমার কাছে। ঠাকুরমাও ফ্রাঁসোয়ার কোন ব্যাপারে মাথা গলাতে নারাজ। তাই পিকাসোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে ফ্রাঁসোয়ার আর কোন বাধা রইল না। একদিন সে সুযোগ বুঝে ঠাকুরমাকে ছেড়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে উপস্থিত হল পিকাসোর বাড়িতে।

ফ্রাঁসোয়া হল এখন পিকাসোর একেবারে কাছের মানুষ। সে সঙ্গে ল্যা ট্রেমরে-সুর ম্যলদরে মারি-থেরেসে ও রু-দ্য-সাভোয়াতে রইল

ভোরা মার। পিকাসো তাদের সঙ্গে আগের মত সম্পর্ক বজায় রাখতে না পারলেও যোগাযোগ একেবারে বন্ধ হল না।

ফ্রাঁসোয়াকে কাছে পেয়ে পিকাসো তার ছবি আঁকতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। পিকাসো একদিন তাকে বললে—ফ্রাঁসোয়া, আজ তুমি আমার সামনে নগ্ন মডেল হয়ে বস।

ফ্রাঁসোয়া মডেল হল। পিকাসো স্থির হয়ে তাকে দেখতে লাগল। রঙ, তুলি, পেন্সিল—কোনটাই সে স্পর্শ করল না। পিকাসোর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ঘুরতে লাগল ফ্রাঁসোয়ার চারিদিকে। কাটলো ঘণ্টা তিন। তারপর ফ্রাঁসোয়ার ছুটি মিললো।

পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে চলে তার দৃষ্টি। ছবি আঁকে তার মন। তাই মডেল ফ্রাঁসোয়ার ছবি আঁকল পিকাসো দিনকয়েক পরে।

যুদ্ধের অবসান

যুদ্ধ প্রায় শেষ। সন্ধ্যায় নতরদামের বিশাল ঘণ্টা ঘোষণা করল দীর্ঘ চার বছরের সংশয়, দুঃখ, অপমান, ক্ষুধা, শীত ও পরাধীনতার গ্লানি থেকে ফ্রান্স মুক্ত। পিকাসোর মন আনন্দে ভরে উঠল।

স্বাধীনতা ফিরে পাবার প্রথমদিন থেকে রু-দে-গ্রঁা-অগস্তিনে আমেরিকান সাংবাদিকরা ভীড় জমাতে আরম্ভ করল। নির্বাসিতদের এবার ঘরে ফেরার পালা। ক্রীড়া জগতের সাংবাদিক এমিংওয়ে। হাতে তার রিভলবার ও কাঁধে ঝোলানো দূরবীন নিয়ে সোজা এসে হাজির হল পিকাসোর বাড়িতে। পিকাসো তখন ছিল মারি-থেরেসের কাছে। এমিংওয়ে তাই হাতবোমা ভর্তি একটা বাক্স তারজন্য উপহার হিসেবে রেখে গেল।

হাজার হাজার ফরাসী সৈন্যের কাছে পিকাসো তখন জনপ্রিয়। আমেরিকায়ও সে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। প্রাক্-যুদ্ধ সংস্কৃতির ধারকহিসেবে তাকে গণ্য করা হল। বিশ্ববাসী শুনে খুশি হল যে পিকাসো তার সংস্কৃতি ও সাধনাকে যুদ্ধকালেও অটুট রেখেছিল। তারজন্য উপহার আসতে লাগল মিল্কচকলেট, ইনস্ট্যান্ট কফি, চিনি, সস্। একদিন এক আমেরিকান সাংবাদিক পিকাসোকে প্রশ্ন করল—একটা ছবি আঁকতে আপনার সময় লাগে কত? প্রতিবছর ক'টি ছবি প্রদর্শনীতে পাঠান? প্রদর্শিত ছবির মধ্যে ক'টি ছবিই বা বিক্রী হয়?

সাংবাদিকের জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলের শেষ নেই। পিকাসো বেশ স্থিরভাবে তার কথা শুনলো, জবাব দিল।

এরপর পিকাসোকে ঘিরে ধরল ছবি-কারবারীরা। পল রোজেনবার্গ ইহুদি ছবি-কারবারীদের দলে ভীড়ে গেল। এই রোজেনবার্গই যুদ্ধের আগে পিকাসোর অনেক ছবি বিক্রী করেছিল

সুযোগ বুঝে পিকাসো একজন ছবি-কারবারীকে বললে—ছবি বিক্রী করব কিনা ভাবছি। ভাল কথা, আমার একটা লণ্ডনের টুপির শখ ছিল।

আর কোন কথা নয়। ছবি-কারবারী পিকাসোকে সন্তুষ্ট করতে লণ্ডন থেকে আনালো টুপি। টুপি হাতে সে পিকাসোর সামনে দিনকয়েকের মধ্যে হাজির হল।

টুপিটা পিকাসো মাথায় চড়ালো। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারকয়েক মাথা নাড়িয়ে বললে—টুপিটা আরেকটু বড় হলে আমাকে মানাতো ভাল।

ছবিকারবারী ভয়ে ভয়ে ব্যবসার কথা ফাঁদতেই পিকাসো বললে —আজ থাক্। কালকে একবার এসো। তখন ঐ নিয়ে আলাপ করা যাবে।

ছবিকারবারীরা জানতো পিকাসো এ-ব্যাপারে তাদের নিয়ে বিড়ালের ইঁদুর-শিকার খেলা খেলে।

ছবিকারবারী, সাংবাদিকদের ভীড়ের সঙ্গে ভীড় জমাতে লাগল চিত্রপরিচালকরা। নানা পত্রপত্রিকায়ও ক্রমাগত তার ছবি ছাপা হতে লাগল।

অশান্তি

ফ্রাঁসোয়া তার সহচরী হতেই পিকাসো তাকে মমার্তের বোহেমিয়ান জীবনের সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচয় করিয়ে দিল। একদিন বাতো লাভোয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে সে ফ্রাঁসোয়াকে বললে—এখানেই আমার জীবন শুরু। স্টুডিওর দরজাটা খুললেই আমি নীল জগতে ফিরে যাই।

এরই সঙ্গে পিকাসো ফ্রাঁসোয়াকে ঘুরিয়ে দেখালো মদিলিয়ানি ও উৎরেলোর স্টুডিও আর রু-লা-বোত্রতির ফ্ল্যাট।

ফ্রাঁসোয়া পিকাসোর আপনজন। তাকে ভালবাসায় ভরে দিতে সে সব সময় সজাগ। তবুও মারি-থেরেসে ও ডোরা মারের জন্য একটা পিছু টান তার রয়েই গেল।

এদিকে ডোরা মার ফ্রাঁসোয়ার কথা জেনেও পিকাসোর ভালবাসার কাঙাল। কিছুতেই তাকে ফেরাতে না পেরে ডোরা মার তখন অন্য উপায় চিন্তা করল। সে চাইল পিকাসোকে আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান দিতে। ধর্ম তখন ডোরা মারের জীবনে প্রধান উপজীব্য। একদিন পিকাসোকে বললে—ভগবানের কাছে তুমি সব পাপ স্বীকার কর। নিশ্চয়ই তোমার পাপ দূর হবে।

এলুয়ারও সেদিন পিকাসোর সঙ্গে ছিল। তাকেও পিকাসোর সহমর্মী ভেবে নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে অপরাধ স্বীকার করতে আদেশ করল।

পিকাসো বুঝলো ডোরা মারের মাথায় একটা কিছু ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। তাই সে তাকে শান্ত করতে চাইলো। ভগবানের পর্ব শেষ হলে ডোরা মার আবার তাদের নির্দেশ করল নতজানু হয়ে তার কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা করতে।

কি সাংঘাতিক আদেশ! কি ভয়ংকর ডোরা মারের মর্জি! পিকাসো ভয় পেয়ে ডোরা মারের চিকিৎসা সম্বন্ধে নিশ্চিত হল।

ডোরা মারের অস্বাভাবিকতার সঙ্গে সঙ্গে পিকাসো এক ঝড়ের আলোড়নের সম্মুখীন হল। তার অতুল কৃতিত্বের শিরোপা হঠাৎ-ই বুঝি খসে পড়ল। প্রতিভার যশ-অপযশ বিধির লিখন। ইতিহাসের পাতায় রয়েছে এর অসংখ্য উদাহরণ।

স্বাধীনতা লাভের ছ'সপ্তাহ পরে জঁা কাসোঁ ওতম্ গ্যালারি পিকাসোর ছবি প্রদর্শনীর জন্য ছেড়ে দিল। ঠিক একই সময় সালোঁ-দ্য-মেতে পিকাসো পাঠিয়ে দিল পঁচাত্তরটি ছবি ও ব্রোঞ্জের পাঁচটি ভাস্কর্য। গ্যালারিতে ভীড় জমলো। দর্শকেরা নিন্দায় মুখর হল। যুদ্ধের সময় যারা দেশ ছেড়ে গিয়েছিল পিকাসোর কাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন তাদের কোন যোগ ছিল না। তাছাড়া 'গুয়ের্নিকা'র পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পিকাসো তেমন আলোড়নকারী ছবি আঁকে নি বলেও একটা অভিযোগ শোনা গেল। প্রদর্শনীর আগ্রাসী ছবিগুলি 'গুয়ের্নিকা' পর্যায়ের নয় বলে তারা সেগুলিকে সহজভাবে নিতে পারলো না। ছবি নামিয়ে নেবার ও দাম ফেরতের দাবীতে তারা সোচ্চার হয়ে উঠল। একদল ছাত্রও যোগ দিল এদের সঙ্গে। ফলে পিকাসো সমর্থক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। শেষপর্যন্ত পাহারা বসিয়ে গণ্ডগোল মেটাতে হল। ক্যানভাসগুলি রক্ষা পেল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও পিকাসোর সমালোচনার সুর পালটে ফেললো—পিকাসো এক ধূর্ত শিল্পী। বিশ্বকে বুদ্ধিমার্গের একমুখো গলির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ পিকাসোকে আবার জার্মান অনুরাগী মনে করে সমালোচনা করল—যুদ্ধের সময় কেন পিকাসো ফ্রান্সে ছিল আর কেনই-বা সে জার্মানবিরোধী ছবি আঁকে নি!

অপযশের গ্লানি আর পিকাসোকে বেশীদিন বহন করতে হল না। লা রেকনেসাঁস ফ্রঁাজে প্রতিষ্ঠান পিকাসোর শিল্পকর্মের জন্য পুরস্কার

পাঠালো এক রৌপ্যপদক। বিদ্রোহী দর্শকেরা হল শান্ত। পিকাসোকে এই ঝড় প্রতিরোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোন চেষ্টাই করতে হয় নি। চিন্তাশীল পিকাসো জানতো যে ঝড় ক্ষণস্থায়ী।

এদিকে পারিবারিক জীবনে ডোরা মারকে নিয়ে পিকাসো বিব্রত। দিনের পর দিন সে নানাভাবে পিকাসোকে উত্যক্ত করতে লাগল। পিকাসো মনস্তত্ত্ববিদ্ লাঁকাকে রু-ত্য-সাভোয়াতে আসার জন্য অনুরোধ জানালো। লাঁকার পরামর্শে দিনকয়েকের মধ্যে ডোরা মারকে পাঠানো হল চিকিৎসাকেন্দ্রে।

রাজনৈতিক আদর্শ : কমিউনিজম্

কবি এলুয়ারের আনাগোনা পিকাসোর বাড়িতে প্রায় নিয়মিত। এলুয়ার কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লোরেঁ কাসানোভাও পিকাসোর পরিচিত। তারা সাম্যবাদের আলোচনা করত। পিকাসোও সে আলোচনার একজন অংশীদার। সে চিরবিপ্লবী—কি শিল্পে কী জীবনে। এবার সে নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করল। পার্টির তৃতীয় সম্মেলনে তার ডাক পড়ল স্পেনের প্রতিনিধি হিসেবে।

পিকাসো কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ায় একদল যেমন খুশি হল অন্যদল তেমনি বিস্ময়ে বললে—পিকাসো কমিউনিস্ট হল এত দেরিতে!

পিকাসো সব শুনে বললে—পার্টিতে ঢুকে আমি যৌবন ফিরে পেলাম। শুধু কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এ-দলে যোগ দিই নি। সর্বস্তরের মানুষের বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সূত্রে আমি আবদ্ধ হতে চাই।

ঘরের মানুষ ফ্রাঁসোয়াও তাকে বিস্ময়ে প্রশ্ন করল—এতদিনে তুমি কমিউনিস্ট হলে?

পিকাসো শুধু নীরবে মাথা নাড়লো।

পিকাসো যে কমিউনিস্ট এটাই পার্টির প্রচারের পক্ষে খুব সুবিধা হল। পিকাসো আমন্ত্রিত হল পোল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে। সে সঙ্গে ওয়ারশ ও ক্রাকাও শহর দু'টি সে ঘুরেফিরে দেখল। পরের বছর শান্তি সম্মেলনে পিকাসো তার 'শান্তির পারাবত' ছবিটি প্রতীক হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিল। পায়রাটির একটি লিথো একসময় মাতিস তাকে উপহার দিয়েছিল। 'শান্তির পারাবত' ছড়িয়ে পড়ল চীন থেকে আমেরিকা।

ভবিষ্যৎ গবেষণা : লিথোগ্রাফি

তিন সপ্তাহ পরে ডোরা মার সম্পূর্ণ সুস্থ হল। যুদ্ধের পরে পিকাসো তাকে নিয়ে এই প্রথম আঁতিবে রওনা হল। অতিথি হল মারি কুত্তোলির কাপ দ্য আঁতিবের সাদা ভিলাতে। মারি কুত্তোলি পিকাসোর বহু পুরনো দিনের বন্ধু। তার স্বামী সেনেটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং রাজনীতিবিদ্। ছেলেবেলা থেকে আভঁ গাদ শিল্পের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ও আসক্তি ছিল। এই আসক্তি তাকে রক্ষণশীল পরিবারের মধ্যে আটকে রাখতে পারেনি। মারি কুত্তোলি শিল্পরসিক মহিলা। ঘর সাজানো তার নেশা ও পেশা। কালো কার্পেট ও স্টীল আসবাব গৃহসজ্জার জন্য তার পছন্দ। ক্রেতাদের জন্য সে দ্যুফি, রওল, গ্রোমের কাছ থেকে পর্দার সুন্দর সুন্দর নক্শা চেয়ে নিত। এগুলি শুধু পর্দার নক্শাই মনে হত না, মনে হত এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র। আঁতিবে পিকাসো পৌঁছতেই মারি কুত্তোলি তাকে দিয়েও করিয়ে নিল কয়েকটি নক্শা।

শিল্পীর খেয়ালখুশি আর উদ্যমের শেষ নেই। পিকাসো এরপর লিথোগ্রাফি নিয়ে মেতে উঠল। লিথোগ্রাফিকে কেন্দ্র করে শুরু হল তার ভবিষ্যৎ গবেষণা। পিকাসো তাই মুরল্যাৎ-এর কারখানায় নিয়মিত যাতায়াত আরম্ভ করল। রু সাব্রলে মুরল্যাৎ-এর কারখানা খুব ঝকঝকে তকতকে নয় অথচ পরিবেশ মনোরম। এখানে ছবি আঁকা, গবেষণা ও আলাপ-আলোচনার কোন অসুবিধা ছিল না। উৎসাহী শিল্পীদের অনেকেই এখানে আসত। মনের আনন্দে তাদের কেউ কেউ দরাজ গলায় গান গেয়ে উঠত। প্রায় চারমাস পিকাসো দর্শকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার এক মস্ত সুযোগ পেল। সকাল ন'টা বাজলেই সে চলে আসত কারখানায়। ফিরতে হত প্রায় সন্ধ্যা।

এভাবে পরপর পঁয়তাল্লিশটি লিথোগ্রাফির কাজ শেষ হল। কয়েক-বছর পরে এই লিথোগুলিকে সংগ্রহ করতে ছবিকারবারীদের মধ্যে শুরু হয়েছিল রেষারেষি। ডোরা মারের সান্নিধ্যে সে কাটালেও ফ্রাঁসোয়া তার মনে ছায়ার মত ঘুরতো। লিথোগ্রাফির কয়েকটিতে ছিল ফ্রাঁসোয়ার প্রতিকৃতি।

এভাবে দীর্ঘদিন পিকাসো আঁতিবে কাটালো। ইতিমধ্যেই পিকাসোর শত্রুরা প্যারিসে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠল। কমিউনিস্ট পিকাসোর অপবাদ প্রচারই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। শত্রুরা তার রু-লা-বোত্রতির বাড়ি জবরদখলের হুমকি দিল। এই বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হল স্যাবার্তেকে। শত্রুপক্ষের হুকুমমতো রু-লা-বোত্রতির দু'টি ঘরের সব ছবি, মূর্তি ও অন্যান্য জিনিষপত্তর সত্তরটি বাক্স বোঝাই করে রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে সে পাঠিয়ে দিল।

রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে বসবাসের তেমন সুবিধা ছিল না, তাই পিকাসো আঁতিবে থেকে ফিরে রু-গে-লুসাকে দু'কামরার একটা বাড়ি কিনতে বাধ্য হল। এই ঘর দু'টির একটিতে থাকতে দেওয়া হল পরিচারিকা ইনে আর তার পরিবারকে, অন্য ঘরটি রইল পিকাসোর প্যারিসের আস্তানা হিসেবে। প্যারিসে ফিরে পিকাসো ফ্রাঁসোয়াকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করল।

'জীবনের আনন্দ'

পরের বছর। পিকাসো দক্ষিণফ্রান্সের জন্য আকুল হয়ে উঠল। সঙ্গী তার ফ্রাঁসোয়া। সমুদ্রোপকূলে যাওয়ার আগে তারা এল মেনেরবে গ্রামে। লুবেরোঁ পাহাড়ের পাদদেশে এই গ্রাম। ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে পিকাসো উঠল সেই বাড়িতে যেখানে ডোরা মারকে নিয়ে আগেরবার সে কাটিয়েছিল। পাহাড়ের ঢালে ছবির মত বাড়িটা সামনে থেকে দেখতে চারতলা হলেও পিছন থেকে মনে হত একতলা। বাড়িটা নেপোলিয়ানের পতনের পর তার এক সেনাপতি তৈরি করেছিল। পিকাসো এখানে এসে গুসে প্রয়োগে এক নতুন ধরনের ছবি আঁকা শুরু করল। ছবিতে দেখানো হল কুচকাওয়াজরত মানুষ —যাদের এক হাতে টর্চলাইট ও বিউগল্ আর অন্যহাতে নীল, সাদা ও লাল রঙের পতাকা।

পিকাসো ও ফ্রাঁসোয়া প্রায় রাত্রেই সুযোগ বুঝে বেরিয়ে পড়ত গাঁয়ের পথে। হাঁটাপথে তারা দেখতো পেঁচা, খরগোস, টিকটিকি ও বিড়ালের শিকার ধরা। পেঁচা ধরত খরগোস, খরগোসের অভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত বিড়ালের ওপর। বিড়াল জ্যান্ত গিলে খেত টিকটিকি আর সেই জ্যান্ত টিকটিকি পেটে গেলে বিড়াল শীর্ণকায় হত। ফ্রাঁসোয়া ও পিকাসোর কাছে দৃশ্যগুলি বেশ মজার মনে হত।

দিনকয়েকের মধ্যে ফ্রাঁসোয়া বেশ অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। ভিলায় কাঁকড়াবিছের ছড়াছড়ি। ফ্রাঁসোয়া একদিন ঘুম-জড়ানো চোখে দেখল তার মাথার কাছে জট-পাকানো চারটি বিছে। ভয়ে তার শরীরে কাঁটা দিল। পিকাসোকে সেকথা জানাতে সে হেসেই উড়িয়ে দিল। অভিমান হল ফ্রাঁসোয়ার।

শনি, মঙ্গলবার, পিকাসোর নামে আসত মারি-থেরেসের চিঠি।

সঙ্গে থাকতো মেইয়্যার নানা খবর। পিকাসো সে চিঠি পড়ে শোনাতো ফ্রাঁসোয়াকে। ফ্রাঁসোয়ার সেটা মোটেই পছন্দ হত না।

পিকাসো একদিন আক্ষেপে বললে—মারি-থেরেসে আমাকে খুব ভালবাসে। তোমার কাছ থেকে একটা সুন্দর চিঠি কোনদিনও পেলাম না।

ফ্রাঁসোয়া নীরসগলায় উত্তর দিল—ওসবের আমি পরোয়া করিনে।

পিকাসো বিরক্ত হয়ে বললে—তুমি ছেলেমানুষ। সবে তো বাইশ—একেবারেই বালিকা। এসব বোঝার মত বয়স তোমার হয়নি।

ফ্রাঁসোয়া রাগ সামলাতে দাঁতে ঠোঁট চেপে বললে—খুব ভাল কথা।

শুধু মারি-থেরেসের চিঠি আর কাঁকড়াবিছেতেই ফ্রাঁসোয়ার আপত্তি নয়, ডোরা মারের ব্যবহার করা বাড়িতে থাকতেও তার ভাল লাগল না। তাই সে ঠিক করল উত্তর আফ্রিকাতে একটা চাকরী নিয়ে চলে যাবে।

পিকাসো সেটা জানতে পেরে ফ্রাঁসোয়াকে বললে—তোমার মনের অবস্থা ভাল নয় বুঝতে পারছি, কিন্তু কেন যে আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছো তা তো বুঝতে পারছি না।

ফ্রাঁসোয়া সরাসরি উত্তর দিল—এই পরিবেশে আমার দম আটকে আসছে।

পিকাসো গম্ভীর গলায় তাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে শেষে বললে—তোমার একটি সন্তান হলেই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রাঁসোয়া বুঝতে পারলো সে অন্তঃসত্ত্বা।

মেনেরবে গ্রাম ছেড়ে তারা এল এবার গলফ্ জুয়াঁতে মঁসিয়ে ফোর্তের ভিলায়। ওপরতলার দু'টো ছোট ঘর তাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। পিকাসোর কাজকর্মের কোন সুবিধা নেই, তাই তার সারা সকালটা সমুদ্রতটে কেটে যেত। ফ্রাঁসোয়াও প্রায়ই

বসতো বালুকাবেলায়। একদিন পিকাসো ঘুরছিল আনমনে। শিল্পী যোশেফ শিমা শাতো গ্রিমালদি মিউজিয়ামের কিউরেটর দর ছ লা স্যুশেরকে নিয়ে হাজির হল তার সামনে। পিকাসোকে দেখে দর ছ লা স্যুশের বললে—আমার মিউজিয়ামে মামুলীধরনের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ আছে। আপনি এখানে কাজ করলে আমি খুব খুশি হব।

পিকাসো রাজী হয়ে গেল। পরদিন সে ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে মিউজিয়ামের দোতলার ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে একেবারে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। বিষণ্ণ মুখে কিউরেটরকে বললে—অসম্ভব। এ দেওয়ালে কেমন করে ছবি আঁকব? দেয়ালগুলি ভিজে, স্যাঁতসেঁতে। পোকামাকড়ের বেশ উপদ্রব রয়েছে।

কিউরেটর অনুনয়ের সুরে বললে—আমি আপনার মনোমত সব ব্যবস্থা করে দেব।

কিউরেটরের চেষ্টায় পিকাসোর নির্দেশমত কোথাও সিমেণ্ট, কোথাও বা প্লাউউড্ দিয়ে ঘরগুলিকে ছবি আঁকার উপযোগী করে তোলা হল।

পিকাসো বললে—আমি এখানে ছবি আঁকছি সেকথা মনে করবেন না মঁসিয়ে দর ছ লা স্যুশের। আপনার মিউজিয়াম আমি একটু সাজিয়ে দিচ্ছি।

পিকাসোর কাজ আরম্ভ হল। দেওয়ালময় নাচের ভঙ্গিতে পরী, আধা-মানুষ, আধা-ছাগল নয়তো আধা-ঘোড়ারূপে নানা দেবদেবী তার রঙ তুলিতে রূপ পেল।

যুদ্ধশেষে অর্থসংকটের হতাশার মধ্যে দর্শকদের কাছে ছবিগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক মনে হল। 'গুয়ের্নিকা'র কালরাত্রি গেল কেটে। সৃষ্টি হল পিকাসো-মিউজিয়াম। এই সময়টাকে বলা হল, 'জীবনের আনন্দ'। এরপর কয়েক বছর তার ছবির মধ্যে প্রাধান্য পেল ক্রীড়া, বিশ্রাম ও প্রেমালাপযুক্তা রমণীরা।

শেষ হল শাতো গ্রিমালদির কাজ। পিকাসো ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে

ফিরে এল আরেক রোমান্টিক জীবনে। পিকাসো ছবি আঁকার উৎসাহে বিভোর। ফ্রাঁসোয়া প্যারিসে ফিরে যাবার জন্য উতলা। সমুদ্র পাড়ে দীর্ঘদিন থেকে ফ্রাঁসোয়া ক্লান্ত। পিকাসো তখন অন্য জগতে। ঘরের লাল-রঙের আসবাবের সঙ্গে মানিয়ে জল-রঙের ছবি আঁকতে ব্যস্ত।

এর কিছুদিন পরে গ্রীষ্মের শেষে ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে পিকাসো রওনা হল ভ্যালেরির ছোট এক শহরে একটা প্রদর্শনী দেখতে। মাটির পাত্র আর বেতের কাজে প্রদর্শনী সাজানো। তাই দেখে পিকাসো মুগ্ধ হল। নিষ্প্রাণ ক্রাফটের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হল তার লক্ষ্য। শুরু হল তার সিরামিকের কাজ। সৃষ্টির অদম্য উৎসাহে রঙ-তুলি দিয়ে কয়েকটি ক্যানভাস সে ভরাট করল। ভাস্কর্যের বেলায়ও সেই উৎসাহ। গোঁগোরার কবিতাগুলি তার তুলিতে রূপ পেল। হাতের কলমও তার নিঃশব্দে প্রখর হয়ে উঠল। ছোট ছেলেদের কথোপকথন থেকে একটি নাটকের জন্ম হল। নাম তার 'চারটি ছোট মেয়ে'। আর কাজের মাঝে ফাঁক—সে ফাঁকটা ভরাট করতে সে পাথরের নুড়ি, হাড়, ছেঁড়া কাগজ নিয়ে নিত্য-নতুন জিনিষ গড়ার খেলায় মেতে উঠল। ক্লান্তিহীন সৃষ্টির কিছু মুহূর্তে পিকাসো কানওয়েলারকে লিখলো—এখনও আমি চৌদ্দ বছরের ছেলের মত মনের খুশিতে কত কি করছি। অথচ কিছু করতে চাওয়া আর না পারা কি প্রচণ্ড বেদনাদায়ক।

এদিকে ফ্রাঁসোয়া অস্থির প্যারিসে ফেরার জন্য—তাই পিকাসোর প্যারিসে প্রত্যাবর্তন।

দক্ষিণ ফ্রান্স

ভ্যালেরি : সিরামিক

পিকাসো আবার এল গলফ্‌ জুয়াঁতে। কিন্তু মনোমত কাজের কোন সন্ধান পেল না। অসহিষ্ণু হয়ে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য চলল এক-আঁ-প্রভাঁসের অভিমুখে। সঙ্গে তার ফ্রাঁসোয়া ও ক্লোদ। ক্লোদের তখন বয়েস কয়েকমাস। এখানে ভিশি-সরকারের কাছ থেকে সে কিছু আর্থিক সাহায্য পেল। পিকাসো কাজ শেষ করে আবার অল্প-দিনের মধ্যে ফিরে এল গলফ্‌ জুয়াঁতে লুই ফোর্তের দু'কামরার সেই বাড়ীতে। শাতো গ্রিমালদিতেও কোন কাজ নেই, বাড়িতেও স্বল্প-পরিসরে নেই কোন কাজের সুযোগ। পিকাসো সময় কাটাতে লাগল সমুদ্রতটে।

একদিন স্বল্প-পরিচিত কয়েকজন লোক পিকাসোকে পরামর্শ দিয়ে বললে—মঁসিয়ে পিকাসো, ভ্যালেরিতে গিয়ে মাটির পাত্রগুলি দেখুন। মৃৎ-শিল্পের কারখানা মাদরাতে গেলেই আপনি মাদাম রামিয়ের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পাবেন।

বেশ কিছুদিন কাজ করার সুযোগ না পেয়ে পিকাসো ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। মনে মনে ভাবলো একবার মাদরাতে যেতে হবে কিন্তু পিকাসোর আর সেখানে নিজে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হল না। অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন মাদাম রামিয়ে ও তার স্বামী পিকাসোকে সিরামিকের কাজ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে গেল। পিকাসো হাতে চাঁদ পেল।

মাদাম রামিয়ের বয়স প্রায় চল্লিশ। যুদ্ধের আগে সে একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজ করত। যুদ্ধের পরে সেকাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়

ভ্যালেরিতে এসে সে একটি সিরামিকও মাটির পাত্রের দোকান খুললো। সেই থেকে মাদাম রামিয়ে ভ্যালেরির সকলের পরিচিতা।

পিকাসো রামিয়ের প্রস্তাব শুনে বললে—আমি একজন সহকারী পেলে কাজ করতে রাজী।

রামিয়ে পিকাসোকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে আরম্ভ করল। প্লেট ও ফুলদানীতে পিকাসোর কয়েকটি ড্রয়িং দেখে রামিয়ে মুগ্ধ হল। কিন্তু যুদ্ধের পরে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এসেছিল অনেক পরিবর্তন। গ্যাস আর ইলেকট্রিকের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মৃৎপাত্রের চলন দৈনন্দিন জীবনে যেন অকস্মাৎ কমে এল। মৃৎশিল্পের অগ্রগতিতে একটা ভাটা পড়ল। মৃৎশিল্পীরা বেকার-জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল।

পিকাসো হাল ছাড়ার মানুষ নয়। রামিয়েও অক্লান্ত উৎসাহী মহিলা। পিকাসোর সঙ্গে রামিয়ের শুরু হল সহযোগিতা। দিনের পর দিন ষাঁড়ের লড়াই, মাছ, ছাগল, পরী, পেঁচা প্রভৃতি নানা জন্তু-জানোয়ার সিরামিকও মৃৎপাত্রের ওপর জীবন্ত হয়ে উঠল। দেড় বছরের মধ্যে দু'হাজার মৃৎপাত্রের ওপর পিকাসো ছবি আঁকল। এগুলি প্রদর্শিত হল প্যারিসের মেজোঁ দ্য লা পাঁসে ফ্রাঁসেতে। একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। সংবাদপত্রগুলি পিকাসোর প্রশংসায় সরব হয়ে উঠল। অল্পদিনের মধ্যে ভ্যালেরির সিরামিকের প্রচার হল দেশবিদেশে। পিকাসোর মহান সৃষ্টির কিছু সুফল পেল ভ্যালেরির মৃৎশিল্পীরা। গরীব, বেকার-মৃৎশিল্পীরা আবার সাহসে ভর করে পাত্র গড়ার কাজে এগিয়ে গেল।

কৃতিত্বের সম্মানে পিকাসো হল ভ্যালেরির নাগরিক। তার জন্মদিন হল ভ্যালেরির এক পুণ্যদিন। সেদিনকে স্মরণীয় করতে এখনও আয়োজন করা হয় নানা উৎসবের।

'লা গালোয়া'

ভ্যালেরি আর গলফ্ জুয়াঁ—পিকাসোর বারবার স্থান পরিবর্তনের বিরাম নেই। সিরামিকের পর পিকাসো আত্মতুষ্টিতে পরিপূর্ণ। ফ্রাঁসোয়াকেও বাঁধতে চাইল নিবিড় বন্ধনে। ভ্যালেরির কাছে পাহাড়-ঘেষা গোলাপী রঙের মাঝারি ভিলা 'লা গালোয়া'তে পিকাসো কাজ শুরু করল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পিকাসো আঁকল 'ভ্যালেরির চিমনি।' নৈসর্গিক দৃশ্যের একটি চিত্র।

'লা গালোয়া' একটা সাধারণ ভিলা। আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। পিকাসোর সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন করে রইল ছবি আঁকার বাসনা। 'লা গালোয়া'তে বসবাসের সুখ থাকলেও ছবি আঁকার তেমন স্থান ছিল না। পিকাসো তাই রু-দে-ফুরনাতে বিশাল একটি বাড়ী স্টুডিওর জন্য ভাড়া করল। পিকাসো 'কোরিয়ার হত্যালীলা'র কাজ শুরু করল এখানে। ছবির মধ্যে ঘন ছায়া, ডোরা-কাটা ও নিষ্প্রভ রঙের প্রাধান্য। পিকাসোর কাজের মান গেল নেমে। ছবিটি আঁকা হল কমিউনিস্ট পার্টির অনুরোধে। ছবিটিতে দেখানো হল অস্ত্রধারী সৈন্যরা অসহায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের ওপর গুলিবর্ষণ করছে। ছবির মূর্তিগুলির গঠন ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে লক্ষ্য করা গেল অসামঞ্জস্য। ছবিটি এঁকে পিকোসো একটুও মানসিক শান্তি পেল না। এরপর পিকাসো যুদ্ধ ও শান্তির ওপর দু'টি ছবি আঁকল।

ইউনেসকো বাড়ীটির প্রবেশপথে পিকাসোর আঁকা 'ইকারের পতন' ছবিটিতে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের ব্যথা-বেদনা ও হতাশা মূর্ত হয়ে উঠল, যদিও ছবিটির কাজ খুব উঁচুদরের নয়।

পিকাসোর লক্ষ্য ভ্যালেরির টাউন হলে সেকুলার চ্যাপেলকে কেন্দ্র করে শান্তির পূজারী হিসেবে স্কেচের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সে

শুধু স্কেচ করেই দিন কাটালো। এই একঘেয়ে কাজ দেখে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল—তবে কি পিকাসো কল্পনার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে ?

পিকাসোর এসময়ের কাজের সঙ্গে পুরনোদিনের কাজের কিছু কিছু মিল পাওয়া গেল। এরমধ্যে গৌরবর্ণ, স্বর্ণাভকেশ ও শিশুসুলভ সিল্‌ভেৎ দাভিদের প্রতিকৃতি দর্শকেরা সানন্দে গ্রহণ করল। সিল্‌ভেৎ ছিল প্যারিসের এক ব্যবসায়ীর কন্যা ও এক ইংরেজ শিল্পীর বাগদত্তা। সিল্‌ভেৎ-এর পনিটেল পিকাসোকে ছবি আঁকতে আকর্ষণ করেছিল।

শুধুমাত্র সিরামিক, ছবি আঁকা নিয়েই পিকাসো ব্যস্ত রইল না। ফেলে ছুঁড়ে দেওয়া নানা জিনিষ দিয়ে সে কিছু ভাস্কর্য নির্মাণ করল। 'ছাগী' 'অন্তঃসত্ত্বা' 'সারস' 'বাচ্চাসহ বানরী' তার অপূর্বসৃষ্টি। বাঁশের কঞ্চি ও ঝুড়ি দিয়ে তৈরী হল ছাগীর পেট, তালের ডগা হল সেটার শিং। আবার তেলের পাত্র হল এক অন্তঃসত্ত্বা রমণীর পেট। মরচে ধরা চামচ সারসের পা, জলের কলের ঢাকনি সেটার মাথা। ছেলের দু'টি খেলনা গাড়ী থেকে তৈরী হল 'বানরী'।

ভ্যালেরির জীবন। পিকাসো বেশ ব্যস্ত। মৃৎশিল্পের অনুরাগীরা দলে দলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসত। ভ্যালেরির ব্যবসায়ী, প্রকাশক, কারিগর ও বিদেশী কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা নানা আলোচনার জন্য পিকাসোকে রাখলো ঘিরে। ফ্রাঁসোয়া ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। ভ্যালেরিবাসীরা ভাবলো ফ্রাঁসোয়া নিছকই ছেলেমানুষ, অকারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দাম্পত্যজীবনে শুরু হল অশান্তি। দু'জনের রুচি ও অভ্যাসের ফারাকটা বাড়তে লাগল। ক্লোদ বছর খানেকের হতেই ফ্রাঁসোয়া অস্থির হয়ে উঠল।

পিকাসো ফিরে এল পুরনো হিসেবে। ভাবলো, ফ্রাঁসোয়ার আরেকটি সন্তানের জননী হওয়া প্রয়োজন। সংসারের বন্ধনে তবেই সে অস্থিরতামুক্ত হবে। ক্লোদের বয়স যখন দুই, ফ্রাঁসোয়া একটি

মেয়ের জন্ম দিল। শান্তি সম্মেলনের প্রতীক পায়রার অনুকরণে মেয়েটির নামকরণ হল পালুমা—স্পেনীয় ভাষায় যার অর্থ পায়রা।

এদিকে বৃদ্ধবয়সে পিকাসোকে পিতা হতে দেখে বন্ধুবান্ধবেরা একটা হাসির খোরাক পেল। পিকাসো তাদের কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। মনের খুশিতে সে ক্লোদ আর পালুমাকে নিয়ে খেলা করত। কখনো বা ক্যানভাসে তাদের চেহারা ধরে রাখতো।

ফ্রাঁসোয়া একটুও স্থির হলো না। শান্তি এল না তার জীবনে। সংসারের কাজে মন বসতে চাইতো না। ঘর গুছিয়ে রাখতে তার আর আগের মত উৎসাহ নেই। ঘরের কাজ ফেলে ফ্রাঁসোয়া ছবি আঁকার তোড়জোড় করল। ছবির মধ্যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে সে আগ্রহী।

একদিন ফ্রাঁসোয়া ছবি আঁকছিল জানলার কাছে দাঁড়িয়ে।

ক্লোদ আদুরে গলায় ডাকলো—মা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

ফ্রাঁসোয়া করুণস্বরে উত্তর দিল—আমিও তোমায় ভালবাসি বাছা। আমার হাত জোড়া রঙ-তুলি, তাই তোমায় এখন আদর করতে পারছি না। লক্ষ্মীসোনা, তুমি রাগ করো না।

কয়েকমিনিট চুপ করে ক্লোদ আবার বললে—মা, আমি তোমার ছবি ভালবাসি।

ফ্রাঁসোয়া গলায় খুশি ঢেলে বললে—ধন্যবাদ লক্ষ্মীসোনা। তুমি আমার কাছে দেবদূত।

ক্লোদ আবার বললে—মা, তোমার সবকিছুই আমার ভাল লাগে। মা, তুমি বাবার চেয়েও ভাল ছবি আঁক।

ফ্রাঁসোয়া আর থাকতে পারলো না। ক্লোদকে কোলে তুলে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল।

ফ্রাঁসোয়া ছবি আঁকতে লাগল। সংসার অগোছালো। সংসারের প্রায় সব কাজেই ফ্রাঁসোয়া নির্বিকার। পিকাসোর সঙ্গে ব্যবহারও স্বাভাবিক নয়। দু'জনেই মনে মনে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। ইন্দ্রিয়ের উচ্ছ্বাসও দু'জনকে বাঁধতে পারতো না।

ফ্রাসোয়া ভাবতো, পিকাসো কি বাতিকগ্রস্ত লোক। রোজ সকালে তোয়াজ করে তার ঘুম ভাঙ্গাতে হবে। জানাতে হবে সে-ই সবচেয়ে বড় শিল্পী।

পিকাসোর আরেক ঝামেলাও তাকে পোহাতে হত। পিকাসো চুলকাটার জন্য অপরিচিত নাপিতের কাছে যেতে নারাজ। ভয়, পাছে তারা তুকতাক করে তার সর্বনাশ করে। নখ কাটাতেও তার ভীতি। ফেলে দেওয়া নখ নিয়ে শত্রুরা যদি তা পুড়িয়ে দেয় তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। এতসব সংস্কারের কথা জানার পরে সময় করে ফ্রাঁসোয়াকে ধরতে হত কাঁচি। নাহলে মাসের পর মাস পিকাসো চুল না কেটে পাগলের মত করত। তাতে ফ্রাঁসোয়ারই হত যত অশান্তি।

পিকাসোকে নিয়ে ফ্রাঁসোয়ার কি ভাবনার অন্ত আছে! এই সেদিন মালীকে একটা পুরনো স্যুট দেওয়ায় কি কাণ্ডটাই না সে করলে। চিৎকার করে বাড়ী ফাটিয়ে দেবার উপক্রম। রাগে, দুঃখে সে বললে—ফ্রাঁসোয়া, তুমি কি চাও আমি ঐ বুড়ো মালীটার মত দেখতে হয়ে যাই?

কি কষ্ট করেই না সেদিন ফ্রাঁসোয়া পিকাসোকে শান্ত করেছিল। ফ্রাঁসোয়া যতই ভাবতে লাগল তার ভাবনার আর শেষ হল না।

ফ্রাঁসোয়ার মনের নাগাল পেত না পিকাসো। পিকাসো অসহায়। আবার তার মাথায় এসে ভীড় জমাতে লাগল অল্‌গা নয়তো ডোরা মার। ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে ভাবতে গেলেই সে হতবুদ্ধি হয়ে যেত। পিকাসোর ছবিতে ফিরে এল দানব-দানবী। ডোরা মারকে পিকাসো যেমন নিষ্ঠুর আর ভয়ংকর করে এঁকেছিল, ফ্রাঁসোয়ার দানব-দানবী অবশ্য তত বীভৎস নয়।

ফ্রাঁসোয়া ও পিকাসোর মধ্যে যখন অন্তহীন মানসিক ঝড়ঝঞ্ঝা তখন পলো এল তাদের কাছে একত্র বসবাসের জন্য। পলোর না-ছিল লেখাপড়ায় মন, না-ছিল অন্য কোনদিকে পারদর্শিতা। সারাদিন মোটর-সাইকেল চালানো ছিল তার নেশা। 'লা গালোয়া'র বিলাস

তাকে প্রলুব্ধ করল। পিকাসো পলোর হাবেভাবে চিন্তিত। পলোকে কাজে ব্যস্ত রাখার কথা ভেবে পিকাসো তাকে নিজের গাড়ীর চালক নিযুক্ত করল। সেই সঙ্গে দেখেশুনে নিজেই ছেলের একটা বিয়ের ব্যবস্থা করল। তবুও পলোকে আর আয়ত্তে আনা সম্ভব হল না।

পিকাসো বিভ্রান্ত। পলোকে নিয়ে দুর্ভাবনা, দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। পিকাসোর কল্পনায় পূর্বপ্রণয়িনীরা ছবির মত একের পর এক ভাসতে লাগল।

মারি-থেরেসে এল গলফ্ জুয়াঁতে। সঙ্গে তার মেইয়্যা। 'লা গালোয়া' থেকে গলফ্ জুয়াঁর দূরত্ব বেশী নয়। সেখান থেকে মারি-থেরেসে পিকাসোকে পাঠালো এক লম্বা প্রেমপত্র। সে পত্র পড়ার অনুমতি পেল ফ্রাঁসোয়া। ঠিক এমনিভাবে অনেকদিন আগে ডোরা মারের একটা চিঠি পড়ার সুযোগ পেয়েছিল মারি-থেরেসে। চিঠি পড়ে ফ্রাঁসোয়া বুঝলো মারি-থেরেসে তার পূর্বস্মৃতির কথা একটুও ভুলতে পারে নি। পিকাসোকে সে প্রথমদিনের মত এখনও ভালবাসে।

পিকাসো মারি-থেরেসের চিঠি পেয়ে তার কথা ভাবতে লাগল। স্মৃতিপটে দুরন্ত, নিষ্ঠুর অল্‌গাও উঁকি মারল। অল্‌গাকে সহজে সে মন থেকে সরাতে পারছিল না।

পিকাসোর মনের সঙ্গে অল্‌গা বোধহয় অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পাথরচাপা বুকে অল্‌গা যখন তার মনে তোলপাড় করছিল ঠিক সেসময় অল্‌গাই এল দক্ষিণ ফ্রান্সে গলফ্ জুয়াঁর কাছাকাছি। একদিন অকস্মাৎ সমুদ্রোপকূলে দু'জনের দেখা হল মুখোমুখি। ফ্রাঁসোয়া সেদিন পিকাসোর সঙ্গে।

অল্‌গা পিকাসোকে দেখে রাগে ফেটে পড়ল। যত রাগ গিয়ে পড়ল তার ফ্রাঁসোয়ার ওপর। সমুদ্রের পাড়ে তখন স্নানার্থীদের ভীড়। অল্‌গা পিকাসোকে দেখিয়ে চীৎকার করতে লাগল—ঐ আমার স্বামী, গীর্জায় মন্ত্র পড়ে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। এখন সে উঁচু

ছিল পরা ফ্রাঁসোয়া জিলোর হাতে হাত রেখে সমুদ্রসৈকতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এরপর থেকে পিকাসোর সঙ্গে দেখা হলেই অল্‌গা উত্তেজিত হয়ে উঠত। পিকাসোকে তখন বাধ্য হয়ে সাহায্যের জন্য যেতে হত পুলিশ কমিশনারের কাছে।

পিকাসো এখন প্রায় দক্ষিণ ফ্রান্সেরই বাসিন্দা। রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনের কেউ কেউ তার সঙ্গে 'লা গালোয়া'তে দেখা করার ছাড়পত্র পেল। পরিবেশ অবশ্য তেমন জমজমাট ছিল না। এমন সময় ব্রাক এল মিদিতে। উভয়ে উভয়ের প্রতি অসম্ভব কৌতূহলী। দেখা সাক্ষাৎ খুব একটা ঘনঘন হত না কিন্তু একে অপরের খোঁজ-খবর রাখতে ছিল তৎপর। দেখা হলে রসিকতা ও তামাশা করতে দু'জনেই অভ্যস্ত।

একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজের কিছু আগে পিকাসো ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে উপস্থিত হল ব্রাকের বাড়ীতে। রান্নাঘর থেকে ঝলসানো ভেড়ার মাংসের গন্ধ ভুরভুর করে ভেসে আসছিল। পিকাসো মনে মনে স্থির করল যে করেই হোক দুপুরের খাওয়াটা ব্রাকের বাড়ীতে সারতে হবে। পিকাসোর উদ্দেশ্য বুঝতে ব্রাকেরও বেশী সময় লাগল না। ব্রাকও তার কর্তব্য স্থির করে নিল।

পিকাসো জানলা দিয়ে বেলাটা আন্দাজ করে উদাস গলায় বললে—ব্রাক, বড় অসময়ে এসে পড়েছি। তোমার মধ্যাহ্ন-ভোজের তো সময় হয়ে এল।

ব্রাক নিরুত্তর।

—তুমি দুপুরের খাওয়াটা সারতে অযথা দেরি করছ কেন? আমি এখানে অপেক্ষা করছি। তুমি যাও, আর দেরি কর না।

ব্রাক ঢিমেতালে গল্প করতে লাগল। পিকাসোর কথা শুনে মুচকি হেসে বললে—তোমার অত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। তোমার আমার মত লোকেদের নিয়মের ব্যতিক্রমটাই তো সবচেয়ে বড় নিয়ম।

পিকাসো ঘাড় নাড়লো। বুঝতে পারল, ব্রাক তার সবফন্দিই ধরে ফেলেছে। তবুও সে অত সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। এটা-ওটা দেখে নানা কথা বলে সময় কাটাতে লাগল। ভাবল খিদের জ্বালায় ব্রাককে এক সময় উঠতেই হবে।

ব্রাকও জেদ ধরে রইল।

বেলা গড়িয়ে গেল। পিকাসোকে অগত্যা খিদেয় কাতর হয়ে বাড়ী ফিরতে হল। দুঃখে ও ক্ষোভে মনে মনে ভাবলো—ভেড়ার মাংসটা নিশ্চয়ই পুড়ে গেছে।

পথে যেতে যেতে ফ্রাঁসোয়াকে বললে—ব্রাককে আমি তেমন কিছু অপছন্দ করি না। আমার এতদিনের পুরনো বন্ধু হয়ে ব্রাক যে খিদে নিয়ে এমন তামাশা করবে তা আগে ভাবতে পারি নি।

মাতিস যখন মিদিতে এল, ব্রাকের চেয়ে তার সঙ্গে পিকাসোর যোগাযোগ হল অনেক বেশী। পুরনো বন্ধুত্বটা আবার ঘনীভূত হতে লাগল। এমনও হত, মাতিসের ছবি সে নিজেই পাঠিয়ে দিতে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে। মাতিসও শাতো গ্রিমালদিতে 'জীবনের আনন্দ' স্কেচ-গুলি দেখতে দেখতে মাঝেমাঝে তন্ময় হয়ে তারিফ করত। মাতিস যে কোন মতেই প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এবিষয়ে পিকাসো বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। তাছাড়া মাতিসের ব্যবহারের মাধুর্য পিকাসোর মত লোককেও শান্ত করে রাখতো। তবুও মাতিসের প্রেমিকাকে দেখে এক সময় পিকাসো সহ্য করতে পারে নি।

সে এক ঘটনা।

মাতিস তখন অসুস্থ। দু'বার তার অপারেশন হয়েছে। বিশ্রামের জন্য এসেছিল মিদিতে। সংবাদ পেয়ে পিকাসো ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে রওনা হল বন্ধুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে পথে ফ্রাঁসোয়াকে সে বললে—ছবিতে মাতিসের বর্ণবিন্যাসের ধারণাকে সত্যিই তারিফ করতে হয়। রঙ নিয়ে খেলতে মাতিসের জুড়ি খুব কমই আছে।

কিন্তু পিয়ের বোনারের কাণ্ডকারখানা আমার কোনদিনই ভাল লাগে না। ছবি আঁকতে ওর যদি একটু জ্ঞানবুদ্ধি থাকত।

ফ্রাঁসোয়া কোন উত্তর করল না। ওরা এসে পৌঁছলো মাতিসের বাড়িতে।

মাতিস পিকাসোকে দেখে পুলকিত। পারলে সে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠত।

পিকাসো হাসিমুখে বললে—অসুস্থ হয়েও তো তুমি বেশ কাজ করে যাচ্ছো। ঐ যে ওধারের ঐ প্রতিকৃতিটি বেশ লাগছে। রেখা-গুলি বলিষ্ঠ। মেঝের কার্পেটের নক্‌শাটা পিছনের পর্দার সঙ্গে বেশ মানিয়েছে।

মাতিস উত্তরে বললে—তুমি তো জানো পিকাসো, নক্‌শা ছন্দ ও সামঞ্জস্যকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলতে আমি চেষ্টা করি। বাস্তবতা নয়, সৌন্দর্যানুভূতিই 'আমার প্রধান লক্ষ্য।

ছবি ছেড়ে আলোচনা হল কিছুক্ষণ প্যারিসের কথা, বার্দ্ধক্যের নানা রোগের কথা। শেষে পিকাসো ফেরার জন্য অনুমতি চাইলো।

মাতিস বললে—এত তাড়া কিসের? এখনও তোমার একটা জিনিষ জানার বাকি আছে।

পিকাসো কৌতূহলী হয়ে উঠল কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করল না।

নিমেষে মাতিস অন্য মানুষ হয়ে গেল। গলা ছেড়ে সে ডাকলো…।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ে। লম্বায় প্রায় ছ'ফিট।

মাতিস উচ্ছ্বসিত গলায় বললে—দেখ আমার প্লেন তরু।

পিকাসোর কথাটা পছন্দ হল না। মেয়েটির প্রথম দর্শনেই সে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে ফ্রাঁসোয়াকে বললে—তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ওদের একটা কিছু চলছে। তবে মাতিসের এত বয়সেও ঐ কম বয়সের মেয়েটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছে।

ফ্রাঁসোয়া অবাক হয়ে পিকাসোর মুখের দিকে চাইলো, তারপর নিজের ভরা-যৌবনের পাশে পিকাসোর বয়সটা হিসেব করতে করতে বললে—বুড়ো বয়সে তুমি যে কাণ্ডকারখানা করে চলেছো তাতে মাতিসের প্রতি কোন মন্তব্য করা তোমার সাজে না।

রুশ চিত্রশিল্পী শাগাল। কিছুকাল আগে ভ্যাঁসে থাকাকালে তার সঙ্গে পিকাসোর পরিচয় হয়েছিল। শাগাল পিকাসোর পছন্দ অপছন্দের মাঝামাঝি মানুষ। তাদের দু'জনের দেখা হলেই আলোচনা চলত কমিউনিজম্ নিয়ে। এ ব্যাপারে পিকাসো সপ্রতিভ। একদিন শাগালের নানা বক্রোক্তি শুনে সরাসরি পিকাসো বললে—যুদ্ধের সময় যারা দেশ ছেড়ে আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিল তাদের আমি মোটেই পছন্দ করি না। বুঝতে পারি না তাদের রাজনীতি সম্বন্ধে ধারণা কি।

শাগাল মোটেই পিকাসোর এতবড় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই সে আমতা আমতা করে যুক্তিটা খণ্ডন করার চেষ্টা করতেই পিকাসো উত্তেজিত হয়ে বললে—তোমরা এমন কমিউনিজম্ কর যে ভাবলে আমার হাসি পায়। তোমাদের কাছে রুবলের চেয়ে ডলার বেশী কাম্য।

সেদিন শাগাল আর পিকাসোর সঙ্গে তর্কে পেরে উঠল না। মৃদু হেসে চটপট বিদায় নিল।

পিকাসোর কমিউনিস্ট হওয়াটা আঁদ্রে ব্রেতঁ সুনজরে দেখল না। ব্রেতঁ আমেরিকা থেকে ভ্যালেরি ফিরে পিকাসোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। সোজা সে পিকাসোকে জিজ্ঞেস করল—আপনি কি কমিউনিস্ট? আপনার সঙ্গে বোধহয় আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেল।

কমিউনিস্ট পিকাসোকে সবসময় সমর্থন জানাতো এলুয়ার ও আরাগঁ। অবশ্য এলুয়ারের মৃত্যুর পর স্টালিনের প্রতিকৃতি নিয়ে পিকাসো ও আরাগঁর মতবিরোধে তাদের ভবিষ্যৎ-সম্পর্ক অনেকটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

কবি ককতো সময় পেলেই পিকাসোর ভ্যালেরির বাড়িতে আড্ডা জমাতো। ককতোর সান্নিধ্যে পিকাসো নতুন করে সৃজনীপ্রতিভায় উদ্দীপিত হয়ে উঠত। ককতো ভালবাসতো পিকাসোকে আন্তরিক-ভাবে। পিকাসোও তাকে ভালবাসতো ত:ব বোধহয় ককতোর মত নয়। তবুও ককতোর অসুস্থতায় পিকাসো তাকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিল একবাক্স রঙীন চক্—ছবি এঁকে সময় কাটাবার জন্য। বুড়ো বয়সেও ককতো কবিতা রচনার ফাঁকে ফাঁকে ঐ রঙীন চক্ দিয়ে খুশিমত ছবি আঁকত।

ভ্যালেরির জীবনে পিকাসোর ভাণ্ডারে জমা হল অফুরন্ত সম্পদ, কত মানুষ। বিচিত্র তাদের চরিত্র। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত এডওয়ার্ড পিনিয়োঁ ও তার কবি সাংবাদিক স্ত্রী এলেন পারমল্যাঁকে পিকাসো আমন্ত্রণ জানালো তার সঙ্গে কিছুদিন ভ্যালেরিতে কাটাতে। দীর্ঘ পনেরো বছর আগে একবার পিনিয়োঁর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। মিসেস্ পারমল্যাঁ তার গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। ইহুদিদের দৃষ্টিতে বাইবেলের যে অংশটুকু খৃষ্টধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় সেটাই তার গবেষণার বিষয়। পিকাসোও তার কাজে আগ্রহী ছিল। তাই নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে পিকাসোকে অনেক গালমন্দ শুনতে হল।

অতিথিরা যখন 'লা গালোয়া' ছেড়ে চলে গেল, ফ্রাঁসোয়া পিকাসোকে নিয়ে চলল দোকানে। পিকাসোর জামাগুলি সব পুরনো হয়ে গিয়েছিল। কিছু নতুন পোশাকের প্রয়োজন। দোকানদার পিকাসোকে বললে—আপনার জামা দেওয়া এক দুষ্কর ব্যাপার। আপনার ঝুলমত আমি জামা দিতে পারলেও কাঁধের চওড়া মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

এ ঝামেলার কথা পিকাসো বহু আগে থেকেই জানতো। তাই সে দীর্ঘদিন ধরে একজন দর্জির খোঁজে ছিল। হঠাৎ দর্জি স্যাপোঁর সন্ধান মিললো। ফোন পেয়ে স্যাপোঁ হাজির হল 'লা গালোয়া'তে।

তাকে দেখে আনন্দে পিকাসো বললে—চিরটাকাল লম্বালম্বা ডোরাকাটা ট্রাউজার পরে কাটাতে হল। লম্বা ডোরা আমার পছন্দ না হলেও অন্য কিছু চোখে পড়ে নি এতদিন। সেদিন হঠাৎ এড়ো-এড়ি ডোরা-কাটা ট্রাউজার পরা কুর্বের একটা ছবি নজরে পড়ল। আমাকে তোমার ঐ ধরনের ট্রাউজার বানিয়ে দিতে হবে।

দিনকয়েকবাদে চড়া-চড়া রঙের এড়োএড়ি ডোরাকাটা ট্রাউজার স্যাপোঁ বানিয়ে নিয়ে এল। পিকাসো তাই দেখে ফুর্তিতে ছোট-ছেলের মত লাফিয়ে উঠল।

শুধু কি ট্রাউজার! মজাদার ডোরাগুলির জন্য সে মোজা আনাতো বৃটেন থেকে।

'লা গালোয়া'তে প্রবেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল ডগলাস ডান-কান ও এডওয়ার্ড কুইনের। তারা পিকাসোর বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি তুলতো—বসে থাকা, দাড়ি কামানো, স্নান করা, ছোটদের সঙ্গে ছোট হয়ে খেলা করা, মুখোশ পরে আগা খাঁ সেজে অভিনয় করা, কৃত্রিম মুষ্টিযুদ্ধ করা আবার কখনো বা ভাঁড়ের পোশাকে।

এখানেই তার বন্ধুত্ব হল ষাঁড়ের লড়াই-এর ঘাতক লুই মিগুয়েল দমিঁ গুঁইয়ের সঙ্গে। লুই মিগুয়েলের স্ত্রী ইটালীর অভিনেত্রী লুসিয়া বোস। লুই মিগুয়েল শুধু ষাঁড়ের ঘাতকই নয় তার কলমেও ছিল প্রচণ্ড জোর। পিকাসোর সঙ্গে মেলামেশা করে সে শিল্পজ্ঞান ও শিল্প সমালোচনায় দক্ষ হয়ে উঠেছিল। কলম তুললেই সে পিকাসোর প্রশস্তি গেয়ে উঠত।

পিকাসো নিজে খেলতো, হুল্লোড় করত ক্লোদ আর পালুমার সঙ্গে কিন্তু তার কোন জিনিষের স্থানচ্যুত হবার উপায় ছিল না। পিকাসোর পছন্দমত প্রতিটি জিনিষের ছিল নির্দিষ্ট স্থান, এমনকি ধুলো জমে-যাওয়া নক্শাতেও অসাবধান পা ফেলে যাওয়া ছিল অসম্ভব। প্রকৃতির

খামখেয়ালী নক্‌শা যা আর কারও চোখে পড়ত না, পিকাসো তাই যত্ন করে দেখতো। গভীর উপলব্ধিতে তাদের রূপ দিত ক্যানভাসে, সিরামিক বা ব্রোঞ্জে। শুধু এ নিয়মের ব্যতিক্রম করার অধিকার ছিল শিশু আর পশু-পাখীদের। তাই তার পোষা-ছাগলটা যখন অত শখের ক্রোটনপাতা চোখ বুজে আরাম করে চিবোতো, পিকাসো তখন সোহাগ করে হাত বোলাতো তার ঘাড়ে। আপনমনে ভাবতো এও প্রকৃতির এক খেয়াল।

শিল্পীর সঙ্গে থাকে প্রকৃতির এক আত্মিক সম্পর্ক, নাহলে কি সৃষ্টি সম্ভব ?

আবার পিকাসোর দাম্পত্যজীবনে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। ফ্রাঁসোয়া হিসেব করে দেখল কোথা দিয়ে জীবনের দশটা বছর গড়িয়ে গেছে। সে হাঁপিয়ে উঠল। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে তাদের মতবিরোধের আর অন্ত নেই। ক্লোদ আর পালুমার লেখাপড়া নিয়েও ফ্রাঁসোয়ার মস্ত-ভাবনা। তাছাড়া হিতাকাঙ্খীদের কেউ কেউ তাকে জানালো পিকাসো প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ছাত্রীটির নাম সাঁতাল। ফ্রাঁসোয়া এসব আজগুবি কথায় কর্ণপাত করল না। সে ভাবলো শুধু সাঁতালই নয়, আরও অনেক মেয়ের নজর পড়বে শক্তপোক্ত চেহারার পিকাসোর ওপর।

রাগে, বিরক্তিতে ফ্রাঁসোয়ার অস্থির অস্থির ভাব। তার অস্থিরতার নাগাল পেল না পিকাসো। ফ্রাঁসোয়া প্যারিসে ফিরতে বদ্ধপরিকর, তবে সঙ্গে পিকাসো নয়। 'লা গালোয়া' থেকে ক্লোদ আর পালুমার হাত ধরে ফ্রাঁসোয়া এগোলো কানের পথে। পিকাসো শেষবারের মত চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। বাধ্য হয়েই পিকাসো একা ফিরলো 'লা গালোয়া'। ফ্রাঁসোয়া চলল প্যারিস।

ফ্রাঁসোয়া 'লা গালোয়া' ছেড়ে যেতেই পিকাসোর বন্ধুদের কেউ কেউ গালগল্প জুড়ে দিল। তারা আগেই আঁচ করেছিল ফ্রাঁসোয়াকে

নিয়ে ঘর করার শখ পিকাসোর খুব বেশীদিন টিকবে না। বন্ধুদের এধরনের আলোচনা তার পছন্দ ছিল না। তাই সে আত্মরক্ষার জন্য নিজের স্টুডিও অথবা মাদরাতে গিয়ে বসে থাকতো।

ফ্রাঁসোয়া চলে যাবার পর প্রথম একটা সপ্তাহ পিকাসোর অসহ্য মনে হল। স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের সাহচর্য হারিয়ে তার মন ক্রমশঃ ব্যথায় ভরে উঠল, অথচ ফ্রাঁসোয়ার মত অত খিটখিটে মেজাজের মহিলার কাছে যাওয়া সম্ভব কিনা সে চিন্তাও তার মাথায় ঘুরতে লাগল। শেষপর্যন্ত পিকাসো অনেক ভেবেচিন্তে প্যারিসের ট্রেনে চেপে বসলো। ততদিনে ফ্রাঁসোয়া রু-গে-লুসাকে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেছে। সেখানে পিকাসোর যাবার ইচ্ছা হলেও সাহসে কুললো না। অনেক চিন্তা ভাবনার পর পিকাসো রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিনে এসে পুনর্মিলনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগল। ফ্রাঁসোয়া অবিচল। সে কিছুতেই ভ্যালেরি ফিরে যেতে চাইলো না। পিকাসো তবুও কেন জানি একেবারে নিরাশ হতে পারলো না। সে এক পক্ষকাল প্যারিসে অপেক্ষা করে ফিরে গেল 'লা গালোয়া।'

সপ্তম প্রণয়

ভ্যালেরির সকলেই নিশ্চিন্ত হল এই ভেবে যে ফ্রাঁসোয়া আর কোনদিন পিকাসোর কাছাকাছি আসবে না। ওদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। সে সময় পিকাসো জ্যাকুলিন রোক নামে এক মহিলার মরমীপরশের স্বাদে আছন্ন হতে লাগল। জ্যাকুলিনের চরিত্র ঘিরে ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মাধুর্য। পিকাসো আকৃষ্ট হল তার প্রতি। প্রায় দেড় বছর আগেই মাদরাতে মাদাম রামিয়ে পিকাসোকে জ্যাকুলিনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। জ্যাকুলিন স্বামী পরিত্যক্তা একজন সেলস্-গার্ল। ছ'বছরের একটি মেয়ের জননী।

জ্যাকুলিন ফ্রাঁসোয়ারও পরিচিতা। 'লা গালোয়া'তে থাকতে ফ্রাঁসোয়া বহুবার তাদের সঙ্গে ছুটির দিনগুলি কাটাতে জ্যাকুলিনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। জ্যাকুলিন খুশিমনে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ঘন ঘন যাতায়াত করত 'লা গালোয়া'তে। একসময় ফ্রাঁসোয়া ও পিকাসো আদর করে তার নাম রেখেছিল 'মাদাম জেড্'। কারণ, জ্যাকুলিন যে বাড়ীতে থাকতো সেটার নাম ছিল 'ল্য জিকেত্'—গ্রাম্য ভাষায় যার অর্থ ছোট ছাগল।

ফ্রাঁসোয়া 'লা গালোয়া' ছেড়ে যেতেই জ্যাকুলিনের শুরু হল নিত্য যাতায়াত। জ্যাকুলিন মনে মনে ভাবলো, এই বুড়োবয়সে লোকটাকে একা ফেলে রাখা যায় না, মানুষটাকে একটু যত্ন করা প্রয়োজন।

ওদিকে পিকাসোর অন্তরেও জটিল সমস্যা। সমস্যা—নারীসৌন্দর্য ও বৃদ্ধের বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা। মনের এই চিন্তা রূপ পেল তার ছবিতে। কিছু কিছু ছবিতে দেখা গেল নগ্ন নারীর সামনে অদ্ভুত হতবুদ্ধি এক বৃদ্ধ। সেই বৃদ্ধ নারীসৌন্দর্য উপভোগে অপারগ। একটি ছবিতে মহিলা মডেলের সামনে বানররূপী শিল্পী।

বৃদ্ধ পিকাসোর অন্তর্জ্বালার হল বহিঃপ্রকাশ।

যতই জ্বালা থাক, জ্যাকুলিন পিকাসোকে আনন্দে ভরিয়ে দিতে চাইতো। তবুও ছুটির দিনগুলিতে পিকাসোর ক্লোদ আর পালুমার জন্য মন কেমন করত। সে ছেলেমেয়েকে দেখার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠত। পিকাসোর আকুল আহ্বানে ফ্রাঁসোয়াও সব রাগ ভুলে গিয়ে মাঝে মাঝে ছুটি কাটাতে ছেলেমেয়ের হাত ধরে চলে আসত 'লা গালোয়া'য়।

তখন জ্যাকুলিন আর ফ্রাঁসোয়াকে বান্ধবীর মত মনে হত। ফ্রাঁসোয়া যখন পিকাসোর সাগরপাড়ের সঙ্গিনী জ্যাকুলিন তখন ঘর সাজাতে ব্যস্ত। বাকি সময় সে কাটাতো ক্লোদ আর পালুমাকে আদর করে। মনে হত কারো প্রতি কারো যেন কোন ঈর্ষা নেই—পিকাসোর মন ভরে উঠত পরিপূর্ণতায়। আবার শুরু হল তার জুয়াঁ-লে-পের নাইট ক্লাবে যাওয়া। এমনি এক ছুটিতে ফ্রাঁসোয়া পলোর একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করল। ফ্রাঁসোয়ার সুরুচি ও তত্ত্বাবধানে প্রদর্শনীটির প্রশংসায় চারিদিক হল মুখর। জ্যাকুলিন রইল অন্তরালে। ফ্রাঁসোয়া বুঝি জিতে গেল। জ্যাকুলিনকে মনে হল পিকাসোর হারেমের একজন ব্যর্থ প্রেমিকা।

এমনি করে ফ্রাঁসোয়া বার কয়েক ক্লোদ আর পালুমাকে নিয়ে প্যারিস আর ভ্যালেরিতে যাতায়াত করল। বারবারই সন্তানস্নেহে কাতর পিকাসো ফ্রাঁসোয়াকে অনুরোধ জানালো, ক্লোদ আর পালুমাকে 'লা গালোয়া'তে পৌঁছে দেবার জন্য। যথারীতি 'লা গালোয়া' পৌঁছে ফ্রাঁসোয়া দেখলো, জ্যাকুলিন আর পিকাসো ভালবাসার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। সেখানে ফ্রাঁসোয়ার উপস্থিতি নিরর্থক। জ্যাকুলিন বাড়ীর পরিবেশ পালটে দিয়েছে। ফ্রাঁসোয়ার অস্তিত্বটুকুও সে রাখতে চায় নি। আলমারিতে তার পোশাক অগোছালো হয়ে পড়েছিল। ফ্রাঁসোয়া বুঝলো তার অবর্তমানে এগুলি জ্যাকুলিন যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে।

ফ্রাঁসোয়া রেগে লাল।

আর জ্যাকুলিন ?

একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রেমের জ্বালা বড় দুঃসহ। তুষের আগুনের মত তা জ্বলতে থাকে অন্তরে ধিকিধিকি। তাই নীরবে ফ্রাঁসোয়া ও জ্যাকুলিনের মধ্যে চলতে লাগলো প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক ঠাণ্ডা লড়াই।

সেবার পিকাসো যেন বড় উত্তপ্ত। ফ্রাঁসোয়াকে দেখে একদিন অকারণে চিৎকার করে বললে—আমি অসুস্থ। তুমি এখানে থাকলে আমার কিছুতেই শরীর ভাল হবে না, আমি মারা যাব। ক্লোদ আর পালুমা ছাড়া তোমাকে আর এখানে দেখতে চাই না!

মন বড় বিচিত্র, তার গতি চঞ্চল।

ফ্রাঁসোয়া অপমানিতা। সে ফিরে গেল প্যারিসে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আর কোন ছুটিতে 'লা গালোয়া' নয়। জ্যাকুলিন হোক পিকাসোর সম্রাজ্ঞী। এরপর পালুমা আর ক্লোদ পিকাসোর কাছে এলে ফ্রাঁসোয়া তাদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে প্যারিসে ফিরে যেত। মাদাম রামিয়ে সেখান থেকে পালুমা আর ক্লোদকে নিয়ে আসত পিকাসোর কাছে।

ফ্রাঁসোয়ার মনেরও পরিবর্তন হল। সে আর পিকাসোকে একেবারেই চাইলো না। কয়েক মাসের মধ্যে ফ্রাঁসোয়া বিয়ে করল শৈশবের বন্ধু চিত্রকর লুই সাইমনকে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য, শৈশবের বন্ধুকে ফ্রাঁসোয়া আর যৌবনে তৃপ্ত করতে পারলো না। আবার বিচ্ছেদ। এরই ফাঁকে জন্ম হল ফুটফুটে মেয়ে অরলিয়ার।

ওদিকে কানের হাসপাতালে তখন পলো আর রামিয়ে উৎকণ্ঠিত। অল্‌গা ক্যানসারে মুমূর্ষু। অশান্ত পৃথিবী থেকে একদিন মৃত্যু নিঃশব্দে অস্থির, উন্মাদ, জেদী, খামখেয়ালী অল্‌গাকে মুক্তি দিল। ভ্যালেরির কবরখানায় পরম নিশ্চিন্তে সে চিরশয্যায় চোখ বুজে রইল। পিকাসো তখন প্যারিসে।

ফ্রাঁসোয়া চলে যাবার পর এক গভীর অবসাদ আর বিষণ্ণ বেদনায় পিকাসোর দিন কাটতে লাগল। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল এধার-ওধার। ফ্রাঁসোয়ার বিচ্ছেদে সে প্রতিটি জিনিষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করতে লাগল। নিঃসঙ্গতাবোধ আর হতাশায় সে 'শিল্পী এবং তার স্টুডিও' ছবির দেড়শো স্কেচ এঁকে মনের অস্থিরতার রূপ দিল। জ্যাকুলিন তার কাছাকাছি। পিকাসোর সেবায় তার কোন ত্রুটি নেই। জ্যাকুলিন বুদ্ধিদীপ্ত মহিলা। পিকাসোর বিক্ষুব্ধ মনকে সে আন্তরিকতায় ভরে তুলে আবার তাকে ফিরিয়ে আনলো ঘরে। এবার জ্যাকুলিনের জেতার পালা। এখন পিকাসোর ছবিতে শুধু জ্যাকুলিন, জ্যাকুলিনের মূর্তি। লম্বা নাক, চওড়া ভ্রূ, দিশেহারা দৃষ্টি সব মিলিয়ে মাদাম জেড্ পিকাসোর ছবিতে জীবন্ত। কিছুদিনের মধ্যেই মাদাম জেডের প্রতিকৃতির চাহিদা প্যারিসে হু-হু করে বেড়ে গেল। পিকাসো এর আগে কোন মহিলার ছবি এত ঘন ঘন আঁকে নি। কয়েক বছর জ্যাকুলিনকে নিয়ে চলল তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা—জ্যাকুলিনের মাথায় কখনো কালো রুমাল, কখনো তুর্কি পোশাক পরা, কখনো বা সে দোলনা চেয়ারে বসা অবগুন্ঠিতা স্পেনীয় রমণী। সুন্দরী না হলেও ত্রিশ বছরের লাবণ্যময়ী জ্যাকুলিনের নীলাক্ষি ও ভ্রূ-জোড়া পিকাসোর শিল্পী মনকে মোহিত করে রেখেছিল।

জ্যাকুলিন একজন সাদাসিধে গৃহকর্মে নিপুণা মহিলা, তারমধ্যে না-ছিল মারি থেরেসের সেই দৈহিক সৌন্দর্য, না-ছিল ডোরা মারের প্রতিভা অথবা ফ্রাঁসোয়ার তেজ। তাই সে পিকাসোর প্রেমিকা হতে পেরেছিল। পিকাসোর কোন কিছুতে তার আপত্তি ছিল না, ছিল না দুঃখ, ক্ষোভ, বিরক্তি বা ক্লান্তি। তার খামখেয়ালীপনাও সে মেনে নিল নির্বিবাদে। ঘরে ও বাইরে জ্যাকুলিন ছিল পিকাসোর একান্ত অনুগত। এই আনুগত্য বোঝাবার জন্য কথায়-কথায় পিকাসোকে ম'সিয়ে বলতে তার কখনো ভুল হত না।

একদিন সমুদ্রতীরে পিকাসো ও জ্যাকুলিন বসেছিল। অপর পাড়ে

সূর্যাস্তের আয়োজন। ওদের দেখে পিকাসোর এক পুরনো বন্ধু চলতে চলতে থেমে পড়ল। বসে পড়ল পাশে। বন্ধু স্বভাবে কবি। প্রকৃতির রঙ তার মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। প্রকৃতি যেন একটা চলন্ত ছবি।

বন্ধু বললে—দেখুন, দেখুন সূর্যাস্তের কি অপরূপ সমারোহ। এমন করে যদি সূর্যাস্তের আয়োজনকে সারাজীবন ধরে রাখতে পারতাম।

বন্ধুটির উচ্ছ্বাসে পিকাসো সেদিকে মুগ্ধদৃষ্টি মেলে বললে—কেন পারবো না বন্ধু? উপলব্ধি কর অন্তর থেকে। উপলব্ধিতেই সৃষ্টি। সৃষ্টিই আমার জীবন।

পিকাসোকে খুশি করতে জ্যাকুলিন আবেগভরা গলায় বললে—সূর্যও ম্লান হয়ে যায় পিকাসোর কাছে।

জ্যাকুলিন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্না নারী। পিকাসোর জীবনে সে এনে দিল পরিপূর্ণ শান্তি। অল্গা আসার পর থেকেই পিকাসোর গৃহস্থালীর দিকে মাঝে মাঝে ঝোঁক যেত। জ্যাকুলিনের মত মহিলার আবির্ভাবে তার সংসার হল ছিমছাম। পিকাসোর আহার-নিদ্রার দিকে তার সতর্ক দৃষ্টি। কয়েক ঘণ্টা পরপর নিয়মিত পিকাসোকে স্টুডিওতে খাবার পৌঁছে দিত। পিকাসোর জামার পকেট আর ঝুল-ঝুলে ছেঁড়া রইল না। শুধু তাই নয় সে পিকাসোর সেক্রেটারি। ব্যাঙ্ক, উকিল, বইয়ের-ডীলার, ছবি-কারবারী সবাইকে পিকাসোর কাছে বুঝেশুনে পৌঁছে দেওয়া, চিঠিপত্রের জবাব লেখা, বই ও ছবির তালিকা মিলিয়ে রাখা সব দায়িত্বের বোঝা বইতে হল জ্যাকুলিনকে। পিকাসোর প্রতিকূল সমালোচকদের গালিগালাজ করতেও সে পিছপা হত না।

এত করেও সব সময় জ্যাকুলিনের মনে ছিল এক দ্বন্দ্ব আর আতঙ্ক। ভাবতো পিকাসোর প্রণয়িনীদের মধ্যে সে বুঝি সবচেয়ে অযোগ্যা। শিক্ষাদীক্ষা, ছবি আঁকা কোন গুণই তার নেই। তাই

নিজের অনাদরের অহেতুক আশঙ্কা। আশঙ্কা পিকাসো হয়তো তার বিদ্যাবুদ্ধির গল্প করবে বন্ধুদের কাছে। তাই জ্যাকুলিনকে ডিঙ্গিয়ে অনেক বন্ধুরাই পিকাসোর সঙ্গে মেলামেশার অনুমতি পেত না।

আগন্তুক এলে ছাড়পত্রের জন্য আগে জ্যাকুলিনের অনুমতি নিতে হত। তবে লৌহকপাট হত উন্মুক্ত। বাঞ্ছিত অতিথি হলে জ্যাকুলিন মিষ্টি হেসে তাকে স্বাগত জানিয়ে বসতে দিত। তারপর আরেক দফা মিষ্টি হেসে বলত—বসুন, মঁসিয়ে পিকাসো এখনি আসবেন।

অল্পদিনের মধ্যে জ্যাকুলিন পিকসোর পিছনে এক শক্ত খুঁটি হয়ে দাঁড়ালো। তাকে খুশি না করে পিকাসোর কাছ থেকে কোন কিছু আদায় করা অসম্ভব। পিকাসোর অনেক কাজের ধন্যবাদ পাওনা হল জ্যাকুলিনের।

ভালবাসায় দু'জনেই যখন বর্ষার নদীর মত উচ্ছল, পিকাসোর ইচ্ছে হল শিল্পে কিছু রদবদল করা। দেলাক্রোয়ার আঁকা 'হুঁকো হাতে রমণী'র মধ্যে খুঁজে পেল জ্যাকুলিনকে। পিকাসো 'আলজিরিয়ার মহিলা' ছবির পরিবর্তনে উদ্যোগী হল। জর্জ ম্যানুয়েলের আঁকা প্রতিকৃতি 'মারী লর্ দ্য নোয়াই'কে কেন্দ্র করে 'ক্রানাশের ভেনাস্' ছবিটির হেরফের করতে শুরু করল। পুরনো ছবিগুলি তাকে এনে দিল নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা। পিকাসোর শক্তি আর ধৈর্য অফুরন্ত। 'আলজিরিয়ার মহিলা' দেখে আবার সে নতুন করে চল্লিশটি ক্যানভাস ভরে তুললো।

অতীতের চিত্রগুলিকে এভাবে পরিবর্তিত হতে দেখে চারিদিকে নানা গুঞ্জন শোনা গেল। কারো কারো ধারণা হল পিকাসোর এটা নিছক ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ বা মন্তব্য করল—কোন শিশু খেলাচ্ছলে ঘড়ি ভেঙ্গে ফেললে মেরামতের পর সেটার টিকটিক শব্দ হওয়া বরং সম্ভব কিন্তু পিকাসোর এ ছেলেমানুষী কিছুতেই জোড়া লাগাবার নয়।

সব দেখে শুনে কানওয়েলার বললে—পিকাসো যে উদ্দেশ্য নিয়ে

একসময় ছবি এঁকেছিল, হয়তো তা পূরণ হয় নি। তাই সে নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু ভাবছে। শিল্পীর কাজ নিজের ও অপর জিনিষের রূপ দেওয়া। শিল্পী নিজেই অফুরন্ত সংগ্রহের ভাণ্ডার। কিন্তু সংগ্রহীতার ধারণা ও কল্পনার অপরিপূর্ণতা আনে সংঘাত।

কানওয়েলারের এ ভাবনা নিঃসন্দেহে মূল্যবান কিন্তু পিকাসোর মত জাতশিল্পীর ক্ষেত্রে এই উক্তি কতখানি সত্য?

'লা ক্যালিফোর্নি : 'পিকাসো রহস্য'

ফ্রাঁসোয়ার অন্তর্ধানের পর ভ্যালেরির কোন আকর্ষণই পিকাসোর কাছে আর ততটা থাকলো না। জ্যাকুলিন সেটা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলো। পূর্বপ্রণয়িনীদের পিকাসোর মন থেকে মুছে দিতে জ্যাকুলিন হল বদ্ধ পরিকর। মিদিতে বেড়াতে এসে 'লা গালোয়া'তে আর তারা ফিরলো না। অল্‌গার মৃত্যুর পর বিলাসকেন্দ্র রিভিয়েরার অল্পদূরে কানের প্রায় লাগোয়া একটি ভিলা তারা খুঁজে নিল। চারিদিকে লতাপাতা ও ঘনসবুজ গাছ পালায় ছাওয়া শিল্পীর এই তপোবনটির নাম হল 'লা ক্যালিফোর্নি'।

নতুন ভিলায় ঘর সাজানো হল সংক্ষেপে। পুরনো ভারী দামী আসবাবের বদলে ছোট ছোট কয়েকটি ডিভান ও টেবিল-চেয়ার দিয়ে ঘর গুছিয়ে রাখা হল। একতলা ও দোতলার তিনখানি ঘর নিয়ে সাজানো হল পিকাসোর স্টুডিও। রু-দে-গ্রাঁ-অগস্তিন ও বিঅজগেলু থেকে আনা হল চীনেমাটির বাসন।

'লা ক্যালিফোর্নিতে' জ্যাকুলিনের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পিকাসোর মনে আনলো নতুন উৎসাহ আর গভীর প্রশান্তি। বেশ কিছুদিন থেকে পিকাসোর মনে যে জয় পরাজয়ের দুর্ভাবনা ছিল, জ্যাকুলিনের মধুর স্পর্শে তা ঘুচে গেল। আবার শুরু হল কাজ আর কাজ।

এখানে তাদের সঙ্গে রইল সারমেয়কুলের অভিজাতবংশীয় বক্সার ইয়ান ও ড্যাশ-স্যাগুলাম্প—পিকাসোর অতি আদরের দু'টি কুকুর। আর একটি ছাগল ছানা—'লা গালোয়া'তে যে ফ্রাঁসোয়ার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

পিকাসোর বয়স তখন চুয়াত্তর। আগের চেয়েও তার প্রাণের স্পন্দন অনেক বেশী। সৃষ্টির আনন্দে সে ভেসে চলল। শিল্পীর

আবার বয়সের সীমারেখা কি ? শিল্পই যার জীবন, যে হৃদয় আবেগ আর গতিবেগে ভরপুর, সেখানে কোন প্রতিবন্ধকতাই তার সৃষ্টির অদম্য বাসনাকে রুদ্ধ করে রাখতে পারে না।

'লা ক্যালিফোর্নি'তে একদিন এল মাতিসের মৃত্যু সংবাদ। পিকাসো নির্বাক। মাতিসের চিরবিদায় তাকে মৃত্যু সম্বন্ধে বিচলিত করে তুললো। পিকাসো ভাবলো মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুকে নিয়ে আর আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই। পিকাসো নিঃশব্দে মাতিসের মৃত্যুকে বরণ করল। তাই মাতিসের কন্যার কাছে পিকাসোর এক ছত্র সান্ত্বনা বাণীও পৌঁছলো না।

মাতিস পিকাসোর দীর্ঘদিনের বন্ধু ছিল। মাতিসকে স্মৃতির পর্দা থেকে সে মুছে ফেলতে পারলো না। মাতিসের ট্রেডমার্কগুলি হল তার হস্তগত। জ্যাকুলিনকে পিকাসো পরালো তুর্কি পোশাক। পিকাসো দাঁড়ালো ঈজেলের সামনে। ক্যানভাসে ছড়িয়ে দিল মাতিসের সব প্রিয় রঙ—মভ, বাসন্তী, গোলাপী, বাদামী, সবুজ।

মাতিসের বিয়োগ ব্যথাও একসময় কাজের ভীড়ে চাপা পড়ে গেল। এল নবাগতের দল, এল শুভার্থীরা। একদিন এল চিত্র-পরিচালক ক্লুজো। বাগানের পথে মখমলের মত সবুজ ঘাসে পা ফেলে ক্লুজো দেখল খোলা-আকাশের নীচে পিকাসোর হরেক রকমের সৃষ্টি—শিশুকোলে প্রাগৈতিহাসিক এক নারীমূর্তি, কোথাও-বা পাম-গাছের তলায় পেঁচার তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

পিকাসো ক্লুজোকে দেখে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—এমন অসময়ে ?

মঁসিয়ে পিকাসোর অনুমতি পেলে একটা কথা বলব।

পিকাসো উৎসুকদৃষ্টি মেলে বললে—বলুন আপনার কি ইচ্ছে ?

আপনার সম্মতি থাকলে আমি একটি নব্বুই মিনিটের ফিল্ম করতে চাই। 'পিকাসো রহস্য' নাম দিয়ে ফিল্মটির মধ্যে আপনার প্রতিভা আমি দর্শকের সামনে তুলে ধরব।

পিকাসো বললে—এর আগেও আমাকে নিয়ে ছোট খাটো ফিল্ম হয়েছে কয়েকটি।

জানি মঁসিয়ে পিকাসো। এবার আমার লক্ষ্য আপনার আঁতিবের সমুদ্র পাড়ের ছবিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানো।

ক্লুজোকে অনুমতি আদায়ের জন্য আর বেশী কথা বলতে হল না। পিকাসো রাজী হল।

শুটিং আরম্ভ হল দিনকয়েক পরে। গ্রীষ্মের দিনে উজ্জ্বল আর উত্তপ্ত বৈদ্যুতিক আলোর নীচে দাঁড়িয়ে পিকাসো ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ছবিটির শেষ তৃতীয়ার্ধে দেখানো হল ল্যা-গারুপের সমুদ্রসৈকত—কোথাও পিকাসো অর্ধশরীর ডুবিয়ে আছে সমুদ্রের জলে, কোথাও-বা আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে সে ব্যস্ত। পরিচালকের পছন্দ-অপছন্দের রদ-বদলে পিকাসোকে বহু স্থান বার বার অভিনয় করতে হল। পিকাসো হাঁপিয়ে উঠল। শরীর হল অসুস্থ।

ক্লান্তি আর অসুস্থতায় সে পেল বয়সের হদিস। প্রয়োজন হল একজন ডাক্তার। ডাক্তারের পরামর্শে পিকাসোর চলতে লাগল নিয়মিত ঔষধ ও ফলের রস। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পিকাসোকে সুস্থ করে তুলতে জ্যাকুলিনও এ পরামর্শ মেনে চলল কঠোরভাবে।

কয়েক সপ্তাহ কাটলো। পিকাসো সেরে উঠল। আবার সে আগের মত সমান উৎসাহে শুরু করল আঁকা, এচিং লিথোগ্রাফি এবং ভাস্কর্য। উৎসাহে ভরপুর পিকাসো 'ইকারের পতন' ছবিটি ইউ, এন, এসকোর চাহিদামত শেষ করল। ছবিটিতে দেখা গেল তার অসাধারণ দক্ষতা। 'আলজিরিয়ার মহিলা' ছবিটিতে যে দুর্বলতা ছিল এবার সে তা কাটিয়ে উঠল।

দেহে ও মনে পিকাসো তখন সুস্থ। একেবারই সুস্থ। তাই ষাঁড়ের লড়াই-এর মরসুম পিকাসোকে মাতিয়ে তুললো। এই লড়াই দেখতে পিকাসো সঙ্গে নিত জ্যাকুলিন, ককতো এবং ককতোর ছেলে-মেয়ে ও ভাইপোদের। ষাঁড়ের লড়াই দেখতে পিকাসোর দারুণ

আনন্দ। আমুদে ঘোড়দৌড়ের নেশাগ্রস্ত লোকেদের মত পিকাসো খেলা উপলক্ষে বাজী ধরত। খেলার মাঠে পিকাসোর পরনে থাকতো নীল সার্জের স্যুট, কালো গলাবন্ধ কোট এবং মাথায় সুবিস্তৃত আনডালুশিও টুপি।

ভ্যালেরিতে অনুষ্ঠিত ষাঁড়ের লড়াই-এ জ্যাকুলিনের হল জয়-জয়কার। অনুষ্ঠানে পিকাসো ছিল প্রধান অতিথি। সন্তান পরিবৃত পিকাসোকে সেদিন দেখে মনে হচ্ছিল আরব্য উপন্যাসের ভূত-প্রেত পরিবেষ্টিত জীন।

সোভিয়েত আমন্ত্রণ : যশ-অপযশ

স্টালিনের মৃত্যু হল। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'লে লেতরে ফ্রাঁসে'-র প্রচ্ছদে স্টালিনের একটি প্রতিকৃতি আঁকার জন্য ডিরেক্টর আরাগঁ পিকাসোকে আমন্ত্রণ জানালো। স্টালিনের ত্রিশ বছর আগের একটা ছবি নমুনা হিসেবে পিকাসোর হাতে এল। স্টালিনকে পিকাসো কখনো চাক্ষুষ দেখে নি। দীর্ঘ পুরনো ছবিকে ভিত্তি করে আঁকার ফলে স্টালিনের প্রতিকৃতি রাশিয়ানদের পছন্দ হল না। বৃদ্ধ বয়সে পিকাসোর প্রাপ্য হল ব্যর্থতা ও নিন্দা।

ফরাসী শিল্পীরা পিকাসোর এই নিন্দাকে কিছুতেই মানতে চাইলো না। তারা বলতে লাগল—চিত্র জগতে পিকাসোর সমকক্ষ আর কেউ নেই।

ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ, দিন-রাত্রি চাকার মত ঘুরতে থাকে। গ্রীষ্মের পরেই আসে বর্ষা, তেমনি দুঃখের পরে সুখ। নিন্দার পরেই এল পিকাসোর সুনাম, অপযশের পরে যশ। ক্রুশ্চেভ এল রাশিয়ার ক্ষমতায়। দৃঢ়সংকল্পে স্টালিন বিরোধী অভিযান সে চালালো। স্টালিনের স্মৃতিকে ধূলিসাৎ করাই হল তার প্রধান লক্ষ্য। স্টালিনের প্রতিকৃতি দেখে যারা এক সময় পিকাসোর নিন্দায় মুখর হয়েছিল, তারাই এখন পিকাসোকে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ভেবে শ্রদ্ধায় অভিভূত হল। সেদিনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্টালিন দেশবাসীর মন থেকে অনেক নীচে নেমে গেল। তারা বুঝলো, স্টালিন একজন সাধারণ মানুষ। দূরদর্শী পিকাসো তাই তাকে একদিন সাধারণভাবেই এঁকেছিল।

এদিকে বুদাপেস্টে লালবাহিনীর অভিযান ও সংশোধনবাদীদের দমন কমিউনিস্ট-জগতে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করল। কমিউনিস্ট সমর্থক অনেকেই এতে পার্টির ওপর ক্ষুব্ধ হল। বন্ধু পিনিয়োঁ

পিকাসোকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলো—হাঙ্গেরীর শ্রমিক-শ্রেণীর ওপর লালবাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হও।

পিকাসো সরব প্রতিবাদ জানালো। কিন্তু অন্যান্য বন্ধুদের মত কমিউনিস্ট দল থেকে পদত্যাগ করল না। কিন্তু দলের সঙ্গে সম্পর্ক মন্দ-ই হল।

কমিউনিস্ট-নেতা থরেৎজ পিকাসোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার মৃত্যুর পর পিকাসো এই দলের ওপর কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হল। দলের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তার কাছে অনেক সময় পাত্তা পেত না। অনেক ব্যাপারেই দলের সঙ্গে পিকাসোর ছিল মতানৈক্য। সমাজতান্ত্রিক-বস্তুবাদের সঙ্গে পিকাসোর শিল্প চেতনার কোন মিল ছিল না। সোভিয়েত-সরকারের তীব্র সমালোচনায় সোভিয়েত-সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পিকাসোর ভাবাদর্শের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। তাই পরবর্তীকালে পিকাসো এই দলের নায়কের সম্মানে ভূষিত হলেও সোভিয়েত-প্রতিনিধি বললে—পিকাসোর শিল্পপ্রতিভায় আমার তেমন আস্থা নেই।

পিকাসোও তার পাল্টা জবাবে বললে—একমাত্র নাজীরাই আমার সম্বন্ধে এ ধরণের মন্তব্য করতে পারে।

কাটলো কিছুদিন। রাশিয়াতে পিকাসোর সম্বন্ধে ধারণা গেল বদলে। পত্র-পত্রিকার সমালোচনার সুরও পাল্টে গেল। বিশিষ্ট সোভিয়েত শিক্ষাবিদ্ গুয়েরাসিমভ মন্তব্য করল—পিকাসো শিল্পী নন, তিনি শান্তির যোদ্ধা।

পিকাসো সব-কিছুই জানলো। তবুও কমিউনিস্ট দলের রথী-মহারথীদের আমল দেওয়া আর তার পক্ষে সম্ভব হল না। ক্রুশ্চেভের জামাতা রিভিয়েরাতে গিয়েও তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেল না। এমন কি লেনিন পুরস্কার আনতে রাশিয়া যেতে পিকাসো অসম্মতি জানালো। পরে অবশ্য এই পুরস্কার পিকাসোর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

এলিয়া এরেনবার্গের সাহায্যে কমিউনিস্ট-দলের সঙ্গে পিকাসোর একটা সমঝোতা হয়েছিল কিছুদিন পর। তবুও পিকাসো কোন অবস্থাতেই নিজের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা হারাতে রাজী হয় নি।

পিকাসো কমিউনিস্ট-দলের যতই সমালোচনা করুক না-কেন, সে ছিল দলের নয়নের মণি। ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের জন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও তাকে পাঠিয়েছিল হাজার-হাজার ডলার উপহার।

পুনর্বিবাহ : নতর-দাম-দ্য-ভ

আর্লে যাওয়ার পথে পিকাসো মিলিত হল ডগলাস কুপারের সঙ্গে। পুরাতন ও নতুন নানাধরনের জিনিষ সংগ্রহ করাই ছিল তার নেশা। ডগলাস কুপার-পিকাসোকে এক-আঁ-প্রভাঁসের কাছাকাছি ভভ্‌নারগে একটি শাতো বিক্রীর কথা জানালো। এই স্থানটি অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ম্যাক্সিম'-এর রচয়িতা লুই দ্য ক্লাপিয়ের ও মারকুই দ্য ভভ্‌নারগের জন্মস্থান। একথা ভেবে পিকাসোর শাতোটি খুব পছন্দ হল। মঁ স্যান্ত্‌ ভিক্তোয়ারের পাদদেশে শাতোটি একটি পুরনো দুর্গ। এতে ছিল চারটি গম্বুজ ও একটি নতুন ধরনের সুন্দর তোরণ। পিকাসো শাতোটি দেখতে এসে জানলা দিয়ে সোজা দূরের গ্রামের দিকে তাকিয়ে রইল। উন্মুক্ত নীল আকাশ। ঘন সবুজ বনানীর ওপর সোনালী মিসোসা ফুলের তোড়া। চেরী ফুলের রাশি। স্নিগ্ধ বাতাসের দোলা আর সোনালী রোদ। পিকাসো আনন্দের আতিশয্যে ওখানে পৌঁছেই কানওয়েলারকে ফোনে জানালো—জায়গাটা আমার দারুণ পছন্দ হয়েছে। সেজানের আঁকা দৃশ্যগুলি আমি কিনে নিয়েছি।

শুরু হল ভভ্‌নারগে বাড়ী বদলের তোড়জোড়। পিকাসোর মত জ্যাকুলিন ও সেখানে যাবার জন্য মেতে উঠল। গৃহস্থালীর কাজে কোনটা নিতে হবে, কোনটা তার না নিলেও চলবে সে হিসেব করতে করতেই জ্যাকুলিনের একটা বেলা কেটে গেল। তারই ফাঁকে সে পিকাসোর পাশে এসে দাঁড়াতো। পিকাসো তখন নিজের ছবি আঁকার সরঞ্জাম গোছাতেই ব্যস্ত। জ্যাকুলিন তাকে কোনরকম কথা বলে বিরক্ত করতে চাইতো না, পিকাসোও এ ব্যাপারে কারো নাক-গলানো পছন্দ করত না। ঝলমলে এক সকালে পিকাসো জ্যাকুলিন

ও পরিচারিকা লুসিয়েনকে নিয়ে ভভ্নারগের শাতোতে এসে পৌঁছলো। কুড়ি বছর আগে কানওয়েলারের উপহার দেওয়া ব্রিক-কেসটা পিকাসো এবার গাদাগাদা ছবির তলা থেকে উদ্ধার করে সঙ্গে নিয়ে এল। পোষা কুকুর দু'টি ও ছাগল ছানাটা এল তাদের সঙ্গে। 'লা ক্যালিফোর্নি' থেকে দু'টি ট্রাক বোঝাই করে পাঠানো হল ছবি ও রান্নার সব সরঞ্জাম। পরিচারিকার সেলাইয়ের মেসিনটাও ট্রাকের ছাদে পাঠাতে কারো ভুল হল না।

কোন রকমে ঘর গোছাতে দিন দুই কাটলো। পিকাসো শাতোর বিরাট বিরাট ঘরগুলিতে বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে ভাবতো দেওয়াল-গুলিকে কেমন করে ভরাট করা যায়। অনেক খরচ করে স্টুডিও গোছানো শুরু হল। সময় কাটাবার জন্য পিকাসোকে দেখা গেল বাথরুম সাজাতে। স্নানপাত্রের ওপরে দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলিতে বন্য পশুরা সব বন থেকে বেরিয়ে আসছে।

পিকাসোর ব্যক্তিগত জীবনে নিঃশব্দে ঘটে গেল আর এক ঘটনা। ভ্যালেরির কমিউনিস্ট মেয়র পল দেরির্গর আগ্রহে জ্যাকুলিনের সঙ্গে পিকাসোর বিয়ে অনুষ্ঠিত হল অত্যন্ত গোপনে। সংবাদটি প্রকাশিত হল গীর্জা থেকে। এভাবে দেরির্গর আন্তরিক প্রচেষ্টায় পিকাসোকে আর সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল না। শাস্ত্রমতে বিয়ে হওয়ায় জ্যাকুলিন খুব খুশি হল। জ্যাকুলিনকে বিয়ে করার অল্পদিনের মধ্যে পিকাসো 'ভভ্নারগের খাবার ঘর' ছবিটি বর্ণাঢ্য করে এঁকে ফেললো।

ভভ্নারগে কিছুদিন কাটবার পর পিকাসো আবার সমুদ্রসান্নিধ্যে যাবার জন্য কাতর হয়ে উঠল। তাই সে ফিরে এল কানে। কান্ থেকে মাঝে মাঝে তার আবার ভভ্নারগে যাতায়াত শুরু হল। ভভ্নারগে অহেতুক দর্শকদের ভীড় এড়াতে তার কোন অসুবিধা ছিল না।

নিছকই যাযাবর বৃত্তির তাড়নায় পিকাসো কয়েক বছরের জন্য

ভভ্‌নারগে এসেছিল। আবার তার বাড়ী বদলের সময় হল। অলিভ ও সাইপ্রাসে ঘেরা মুজিঁ পাহাড়ের ওপরে যাবার জন্য পিকাসো এবার বদ্ধপরিকর। অনেক দেখেশুনে পিকাসো একশো আশি মিলিয়ন ফ্রাঙ্কে সেখানে একটি বাড়ী কিনলো। বিশাল বাড়ীতে অনেক ঘর। গোটা একতলা পরিণত হল তার স্টুডিওতে। বাড়ীটি পিকাসোর কাছে যেন একটি উপাসনালয়। তাই বাড়ীটির নামকরণ হল নতর-দাম-দ্য-ভি।

মুজিঁতে এসে পিকাসোর পূর্বস্মৃতি স্মরণে এল। চিন্তা করতে লাগল যুদ্ধের আগেকার কথা। বহুদিন সে এ জায়গায় কাটিয়েছিল ডোরা মার, নুশ আর পল এলুয়ারের সঙ্গে। পিকাসো জ্যাকুলিনকে তার বিগত জীবনের গল্প শোনাতে লাগল।

জ্যাকুলিন যেন নির্বাক শ্রোতা। পিকাসোকে খুশি করতে সে নির্বিবাদে পিকাসোর পূর্বপ্রণয়িনীদের গল্প শুনে যেতে লাগল। মনে মনে ভাবলো সে এখন পিকাসো-রাজ্যে সর্বময়ীকর্ত্রী, পিকাসোও তাকে এখন সুখে রাখতে তৎপর। নতর-দাম-দ্য-ভির মত বিশাল বাড়ীটিও কেনা হয়েছে তার নামে। তবে তার আর অসন্তোষের কি কারণ থাকতে পারে! জ্যাকুলিন সুখী, গর্বে পরিপূর্ণ।

নতুন আবাসে এসে পিকাসো মনের আনন্দে ভভ্‌নারগ থেকে আনা চিত্রগুলিতে রদবদলের বাসনায় রঙ, তুলি নিয়ে মগ্ন হয়ে রইল। মানের 'লা দে জোনে স্যুর ল এরব' অর্থাৎ 'এরব-এ চড়ুইভাতি' চিত্রটিকে নিয়েও সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগল। ভাস্কর্যগুলিতে সেভাবে চলতে লাগল ছুরি বাটালি। লিনোকাটের মধ্য দিয়ে সে শিল্প কৌশলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো পরিপূর্ণতার দিকে। তাকে দেখা গেল মৃৎপাত্র ও টাইলের ওপর এচিং করতে। ঢেউ খেলানো টিন থেকে নানারকম মূর্তি তৈরী হতে লাগল তার স্টুডিওতে। এই মূর্তি থেকে শুরু হল পিকাসোর এরোটিক্ ড্রয়িং। কাগজ ও ক্যানভাস ভরে উঠল তার এ ধরনের ড্রয়িং-এ, অথচ কোন মূর্তি বা ড্রয়িংশেষ হল না। কেমন অসম্পূর্ণ—তাতে নেই কোন সমাপ্তির স্পর্শ।

ছবি আর ছবি, সে সঙ্গে মূর্তি। একতলা ঠাসাঠাসি। পিকাসো বাধ্য হয়ে শোবার ঘরের পাশের স্থানটি ঘিরে ফেললো স্টুডিওর প্রয়োজনে।

এখানে নতুন পরিবেশে পিকাসো এক নতুন মানুষ। গোটা-দুনিয়ার খবর নেওয়ার তার কি অসীম কৌতূহল। জনবিরল সমুদ্রোপকূলে পিকাসো মনের আনন্দে জ্যাকুলিনকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। ইচ্ছেমত হিস্পান গাড়ী চড়ত। বয়সের শাসন ভুলে গিয়ে রেস্তোরাঁয় বসতো বুভুক্ষু মানুষের মত, আস্বাদ করত নিত্য নতুন খাবার। মন চাইলেই কানে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতো। যখন অশীতি-প্রায় বৃদ্ধের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসত—সে রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে পড়ত সেখান থেকে। তাকে দেখতে জমে উঠত ভীড়।

ভীড় ভাল লাগতো না। পিকাসো তাই নিজের স্টুডিওতে প্রোজেক্টার লাগিয়ে ফাঁকা দেওয়ালে পুরনোদিনের ছবি দেখার আয়োজন করল। তাতে ভীড় জমার ভাবনা কেটে গেল। ছবি দেওয়ালে বা পর্দায় ফুটে উঠলে পিকাসো আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত।

শিল্পী চলে সাবলীল গতিতে। সে কখনো স্থবির হয়ে থাকতে পারে না। তার জীবনপ্রবাহ শুধু তার শিল্পেই প্রতিফলিত হয় না, এই প্রবাহ তার ব্যবহারিক জীবনে এনে দেয় আলোড়ন। তাই পিকাসোর মত শিল্পীর শুধু কি জীবনের বাহ্যিক আনন্দে অবগাহন করে দিন কাটানো সম্ভব? শুরু হল তার কঠোর জীবনযাত্রার পালা। বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রতিজ্ঞায় সে স্থির হল। নতর-দাম-দ্য-ভিতে দর্শক আর পরিচিতের প্রবেশাধিকার রইল না। টেলিফোনেও তার কোন সাড়া মিলতো না। নিজের ধ্যানেই তখন সে আত্মস্থ। কেউ এলে বাগানের মালী শেখানো বুলি আওড়াতো—বাড়িতে কেউ নেই। কোন আগন্তুক পিকাসোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তাকে অনুমতির জন্য নাম লিখে পাঠাতে হত অন্দর মহলে।

সাক্ষাৎকারের এই কড়াকড়িতে পিকাসোর বহু ঘনিষ্ঠ ও পুরনো বন্ধুরা হল মর্মাহত। বন্ধু ফ্রাঁসোয়া পুলেঁস পরপর তিনবার পিকাসোর সাক্ষাতে ব্যর্থ হয়ে অতি দুঃখে এ বাসনা চিরকালের মত ত্যাগ করেছিল।

কবি রেভেরেডীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পিকাসো লিখলো—একবার নতর-দাম-দ্য-ভিতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে খুশি হব। আশা করি আমার এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন।

কবি রেভেরেডী ছাড়বার পাত্র নয়। সুযোগ বুঝে সেও পিকাসোকে জানিয়ে দিল—আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে কলিংবেল টেপা অথবা মালীর মুখের বাঁধা গৎ শুনে ফিরে আসা আমার আত্মমর্যাদার পরিপন্থী।

কবির আক্রমণে পিকাসো আনন্দে নিজেই ছুটলো তার সঙ্গে দেখা করতে।

পিকাসোর মেজাজ ও খামখেয়ালীপনা দেখে বাড়ীতে প্রবেশের যারা অনুমতি পেত তাদেরও কম ভয় ছিল না। তারা সব সময় অশঙ্কা করত সে তাদের ঠাণ্ডা অভ্যর্থনা জানাবে। নিউইয়র্ক থেকে আগত এক আর্ট ঐতিহাসিকের সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করতে সরাসরি অস্বীকার করল।

দর্শকেরা অনেক আশা নিয়ে দূর দূর দেশ থেকে আসত তার সঙ্গে দেখা করতে অথচ বাড়ীর লৌহকপাট ডিঙোবার অধিকারটুকু তারা পেত না। তারা উত্তেজিত হয়ে উঠত। মালীর সঙ্গে চলতো তাদের কথা-কাটাকাটি, শেষে গালিগালাজ। পিকাসো আড়ালে দাঁড়িয়ে সে সব দৃশ্য উপভোগ করত।

একবার এক চিত্রপরিচালক নানারকম উপঢৌকন নিয়ে এসে দাঁড়:লো নতর-দাম-দ্য-ভির দরজায়। লৌহকপাট ফাঁক হল না। অনুমতি সে পেল না সাক্ষাতের। অবশ্য কিছুদিন পরে পিকাসো কি খেয়ালে আবার তাকে নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিল। জীবনের এই

মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পিকাসোর কেমন একটা ধারণা হল কারও কাছ থেকে কোন কিছু পাবার দিন তার ফুরিয়ে গেছে। শুধু চাওয়া আর পাওয়ার লোভে সবাই তার কাছে ভীড় জমায়।

ফটোগ্রাফার ডগলাস ডানকান একসময় ছিল পিকাসোর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। ছোটবেলায় পিকাসো তাকে একবার একটি আংটি উপহার দিয়েছিল। তবুও পিকাসোর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ভয়ে ভয়ে সে নিয়ে এসেছিল রব্যের কাপার কাছ থেকে পরিচয়পত্র। অবশ্য পিকাসোর সাক্ষাৎ ও বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে কাটাবার অনুমতি ডগলাস সহজেই পেয়েছিল। ডগলাসের ক্যামেরা ছিল সব সময়ই সচল কিন্তু তার এ সময়ের তোলা ফটোগুলি পিকাসোকে বড় একটা সম্মান এনে দিতে পারে নি।

সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পিকাসো তাদের বিরাগ ও সমালোচনার পাত্রই হয়েছিল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে পিকাসো সাংবাদিকদের কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দেওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আত্মগোপন করে থাকতো স্টুডিওতে।

নতর-দাম-দ্য-ভিতে থাকাকালে ককতোর মৃত্যু সংবাদ পিকাসোকে চরম আঘাত দিয়েছিল। ককতো ছিল এক আশ্চর্য মানুষ। স্ত্রীলোক মোহিত করার যাদু সে জানতো। ককতো জ্যাকুলিনকে কথায় বশীভূত করেছিল। মুজিঁর যেকোন বিষাদমুহূর্ত ককতোর আগমনে আলোকিত হয়ে উঠত। সেই ককতোর মৃত্যুতে পিকাসো একেবারে শোকাভিভূত হয়ে পড়ল। তার মনে হল ককতোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িককালের প্রথম সারির প্রতিভার সমাপ্তি হল। বাকি রইল দ্বিতীয়সারির কবি, সমালোচক, সাংবাদিক, আড্ডাবাজ এবং শিল্পকারবারীরা। পিকাসোকে জাগতিক সুখ দেবার জন্য তারা মেক্সিকোর টুপি, শেরিফের রিভলবার, স্পেনের বুলফাইটারদের পোশাক এবং নিগ্রো-মুখোস উপঢৌকন দিতে এগিয়ে এল। আমেরিকা থেকে পিকাসোর জন্য এল একটা ঘড়ি যার সংখ্যাগুলির

জায়গায় পিকাসো নামের অক্ষরগুলি সুন্দর করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

একটি ছবিতে পিকাসোকে অতিকায় দেখিয়ে অন্যান্যদের করা হল খর্বাকৃতি। ছবিটি আঁকার উদ্দেশ্য ছিল পিকাসোকে খুশি করা। খুশি হওয়ার চেয়ে পিকাসো এতে বিরূপই হল। পিকাসো চাটুকারদের কাছ থেকে আত্মগোপন করার বাসনায় নিজের কাজে ডুবে গেল। জ্যাকুলিন তার অতন্দ্র প্রহরী। পিকাসোর অনিচ্ছায় কাউকেই সে বড় বেশী একটা নতর-দাম-দ্য-ভিতে প্রবেশের অনুমতি দিত না।

কানওয়েলারের দশাও হয়েছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। মঁতে কার্লোতে জুয়াঁ গ্রির ওপর বক্তৃতা করতে কানওয়েলার আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। বক্তৃতা শেষে তার ইচ্ছা হল পিকাসোর সঙ্গে একবার দেখা করে ফেরার। সেই বাসনা নিয়ে যখন সে নতর-দাম-দ্য-ভির দরজায় এসে দাঁড়ালো, পিকাসো তাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিল না। এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে কানওয়েলার তা একবারও কল্পনা করতে পারে নি। করুণ মুখে বাড়ীর দিকে হতাশ হয়ে চেয়ে রইল। চোখের জলে, তার গলা-বুক ভিজে গেল। তারপর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে ফিরে গেল।

পলো, তার স্ত্রী ও ভিলাতোকে পিকাসোর সঙ্গে এসময় দূরত্ব রেখেই চলতে হত। এমন যে ক্লোদ আর পালুমা বাবাকে দেবতার মত ভক্তি করত তারাও হল ক্রমশঃ পিকাসোর স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত।

জ্যাকুলিন আর শিল্পকর্ম—এ নিয়েই পিকাসো তখন মগ্ন। মারি কুত্তোলি একদিন নিছকই ভুলবশে জ্যাকুলিনকে ফ্রাঁসোয়া বলে সম্বোধন করেছিল, এতে পিকাসো এত উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল যে বছরখানেক সে আর মারি কুত্তোলির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখল না। মারি কুত্তোলি হল তার ঘৃণার পাত্রী। বেচারী মারি কুত্তোলি—এক সময় যে পিকাসোকে আন্তরিক সাহায্য করেছিল সে এতবড় একটা শাস্তির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

পিকাসো এমনই এক জেদী শিল্পী যাকে ব্যক্তিগত জীবনের কোন ঘটনায় স্তব্ধ করতে পারে না। শিল্পই যার ধ্যান, সাধনা তার সামনে নতুনের যেমন এক দুর্বার আকর্ষণ তেমনি পূর্বসূরীরাও তাকে তোলপাড় করে তোলে। তাই রেমব্রান্ট-এর 'বাথসেবা' চিত্রটিকে কেন্দ্র করে সে কিছু চিত্র রচনা করল।

এরপরেই তার কাজে যুদ্ধের বর্বরতার চিহ্ন পাওয়া গেল। 'সেবাইন স্ত্রীর ওপর পাশবিক অত্যাচার' ছবিটির মধ্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'শিল্পী ও মডেল' বিষয়বস্তুকে নিয়ে যে পঁয়তাল্লিশটি ক্যানভাস প্রাণবন্ত হয়ে উঠল তাতে চিত্র এবং প্রকৃতির মধ্যে আলাপনের সুর ধ্বনিত হল। ন্যুড প্রসঙ্গে সে বলল—আমি নিজে ন্যুড ছবি করতে খুব ইচ্ছুক নই তবুও আমাকে দিয়ে এমন কিছু সৃষ্টি হচ্ছে যা লোকের না দেখে উপায় নেই। আমি প্রকৃতি থেকে কাজ করি না কিন্তু প্রকৃতির সামনে এবং সঙ্গে কাজ করি।

এদিকে সুইডেনে ক্রিসতিন-য়াম-এ ভেইনের হ্রদের তীরে বালী ও কংক্রিটে তার নির্মিত বিরাট এক দীর্ঘ নারী মূর্তির মস্তক স্থাপন করা হল। দর্শকদের মধ্যে দেখা দিল আলোড়ন। এই মূর্তিটি পিকাসোকে শ্রেষ্ঠতার আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল।

অন্তিম দিনগুলি

চুরাশি বছরের জন্মদিন। চারিদিকে আলোর রোশনাই আর বাজীর ঝলকানি। পিকাসো ফিরে এল সেই যৌবনে—যেখানে তার অবাধ মেলামেশার কোন বৈষম্য বা কঠোরতা ছিল না। সেদিন সকলে পিকাসোর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেল, সুযোগ পেল তাকে শ্রদ্ধার্ঘ ও উপহারে-উপহারে ভরিয়ে দিতে।

সুলভি মারিওঁ এসেছিল তার উপহার নিয়ে। সহাস্যে পিকাসো তাকে বললে—ধরে নাও, এটাই আমার শতবার্ষিকী। আমার কাছে আয়না না থাকলে আমি বয়সের কথা একেবারেই ভুলে যাই। আমি আশি বছর পেরিয়েও যুবক রয়েছি।

পনেরো হাজার দর্শকের সমাগমে পিকাসো সেদিন ছিল একজন যুবকের মত উৎফুল্ল, প্রাণবন্ত। পিকাসোর পরনে ছিল একটি কালো রঙের স্যুট। উৎসবের আনন্দ চলল রাত ছুটো পর্যন্ত। নিগ্রো গায়কদের গান, বুদাপেস্ট অপেরার ও আনডালুশিও নাচ দেখে পিকাসো মুগ্ধ হল।

পরদিন ভ্যালেরিতে পিকাসো নিজের কাজের ছোট একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করল। এসময় ফ্রান্স ও স্পেন উভয় দেশের জাতির গৌরবের স্বীকৃতি হিসাবে তাকে একটি সোনার চাবি উপহার দেওয়া হল। তারপর পিকাসোর সভাপতিত্বে যে ষাঁড়ের লড়াই শুরু হল তাতে অনেক ষাঁড়ের প্রাণ গেল। সারাদিন কাটলো খোলা-আকাশের নীচে। সন্ধ্যাবেলা এক রেস্তোরাঁতে বিরাট ভোজপর্ব শেষ হলে পিকাসো আবেগে দাঁড়ালো টেবিলের ওপর। কমিউনিস্ট প্রতিনিধি জাক ডুকলোও আবার অনুকরণ করল পিকাসোকে। পিকাসোর ফুর্তি যেন ফেটে পড়ছিল।

পিকাসোর জন্মদিনের উৎসবের রেশ তখনও কাটেনি হঠাৎ প্রকাশিত হল ফ্রঁাসোয়া জিলোর লেখা বই 'পিকাসোর সঙ্গে জীবন'। চারিদিক হল তোলপাড়। পিকাসোর মনও হল চঞ্চল। বইটিতে ফ্রঁাসোয়া পিকাসোর নানা দোষের কথা গুণের পাশাপাশি লিখেছে। পিকাসোর পারিষদরা তাকে উত্তপ্ত করার মত একটা খোরাক পেল। তারা তিলকে তাল করে পিকাসোকে দিয়ে জোর করে এই পুস্তিকার রচয়িতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করাতে কসুর করল না। কিন্তু মামলায় পিকাসোর কিছু সুবিধা হল না। কোর্ট কাছারির শোক ভুলতে না ভুলতে পিকাসো অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তারের চিকিৎসার জন্য তাকে যেতে হল প্যারিসে। পিকাসোর অনুগামীদের এজন্য ভাবনা-চিন্তা বড় একটা দেখা গেল না। জ্যাকুলিনের সেবাপরায়নাতাই তার প্রধান ভরসা।

পিকাসো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেই পছন্দ করত। তাই জ্যাকুলিনকে সঙ্গে করে সোজা কানের পথে না গিয়ে স্যঁাত রাফেল দিয়ে ঘুরপথে প্যারিসের পথ ধরল। স্টেশনে পৌঁছবার পরে ট্রেনের শেষ যাত্রীটির চলে-যাওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করল পাছে তাদের উপস্থিতি কারও নজরে পড়ে যায়। তাছাড়া পিকাসো তার পাশের কামরায় একজন মহিলাকে দেখে বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। পিকাসো ভয়ে ভয়ে জ্যাকুলিনকে বললে —কি সর্বনাশ! ঐ মহিলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যদি একবার আমার ওপর পড়ে তাহলে আর কোন রক্ষা নেই। প্যারিসবাসীর কাছে খবরটা পৌঁছে যেতে সময় বেশী লাগবে না।

প্যারিসে পৌঁছে তার গলব্লাডার অপারেশন হল। সাংবাদিকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আত্মীয়, শিশু, বন্ধুবান্ধব কাউকেই পিকাসোর কাছে ঘেষতে দেওয়া হল না। একটু আরোগ্যের দিকে যেতেই পিকাসো আবার নিঃশব্দেই নতর-দাম-দ্য-ভিতে ফিরে এল। এসময়ে পিকাসোর সামনে কেউ এলেই পিকাসো তাকে অস্ত্রো-

পচারের জায়গাটা দেখিয়ে বলতো—আমার কিছু হয় নি। আমি এখনও যুবকের মত বলিষ্ঠ।

পিকাসো নিজের শরীর সম্পর্কে যতই নিশ্চিন্ত হোক না কেন তার আরোগ্যলাভ খুবই শ্লথগতিতে চলছিল। বছর খানেক তার আর প্রায় তুলি ধরা হয়ে ওঠে নি। চোখের দৃষ্টিও ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসছিল। এবার তার একটা চশমার প্রয়োজন হল।

কিন্তু পিকাসো কি নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকার মানুষ! তুলি না ধরে সে ধরল কলম। তার 'অরগাজের কাউন্ট-এর সমাধি,' লেখা জনচিত্তে তুললো যথেষ্ট আলোড়ন।

নতর-দাম-দ্য-ভিতে এল নাট্যকার ক্রোমেলুঁকের ছেলেরা। মিদিতে সে আমন্ত্রণ জানালো কয়েকজন প্রযুক্তিবিদ্‌দের তার এচিং ছাপানোর জন্য—এদেরই মধ্য দিয়ে তার কিছু কিছু নতুন সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল। এরই মাঝে খেয়ালখুশি মত সে কিছু চিত্ররচনা করল যাকে বলা হল 'মসকেতেয়ার সিরিজ'।

দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা বছর। পঁচাশিতম জন্মবার্ষিকীতে বিশ্বের মানুষ তাকে জানালো সম্মান। ফ্রাঁসোয়া জিলোর বইয়ের গ্লানি ও দুঃখ তার মন থেকে মুছে গেল। কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দ-ভোগের আর সুযোগ হল না। ছুটির দিনে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যাওয়ার তার আর কোন তাড়া দেখা গেল না। অসুখের পর তাকে নানা নিয়মের বেড়াজালে পড়তে হয়েছিল। মাঝে মাঝে মন করত বিদ্রোহ কিন্তু নিরুপায়।

জন্মদিনের অল্পকিছুদিনের মধ্যেই চিত্র-প্রদর্শনীর জন্য পিকাসো আমন্ত্রণ পেল প্যারিসের গ্রাঁদ পালে এবং পেতিত পালেতে। সেখানে তাকে সম্বর্ধনা জানাবারও একটা আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে সে আর সেখানে সম্বর্ধনা গ্রহণ করতে গেল না। উদ্যোক্তা আঁদ্রে মালরো নিজে গিয়ে পিকাসোকে অনুরোধ জানালে ব্যাপারটা হয়ত অন্যরকম হত। শেষ মুহূর্তে

জ্যাকুলিন-কন্যা ক্যাথারিনের বান্ধবী মা জঁা লেমেয়ারের চেষ্টায় পিকাসো কিছুটা নরম হয়ে স্কেচ, পেন্টিং, এচিং, ভাস্কর্য এবং সিরামিকের অনেকগুলি কাজ প্রদর্শনীতে পাঠালো। সাড়ে আট-লক্ষ দর্শকের সমাগমে গ্রাঁদ পালে, পেতিত পালে ও বিবলিওয়েক নাসিওঁনাল ছাড়া আরও কুড়িটি গ্যালারিতে তার ছবি একসঙ্গে প্রদর্শিত হতে লাগল।

জীবনপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মহান স্রষ্টিধর পিকাসোর খ্যাতি ও গৌরবের সঙ্গে কিছু বিরূপ মন্তব্য জুটলো। সাধারণ লোক তার সমালোচনায় মুখর হল। কিন্তু কমিউনিস্ট-প্রেস তার প্রশংসায় যখন পঞ্চমুখ হয়ে উঠল তখন সেটা ভাল লাগল না নিরপেক্ষ সমালোচকদের। তারা শুরু করল পিকাসোর শিল্পের নতুন মূল্যায়ন। জ্যাকুলিনের সংগ্রহ-করা প্রেস-কাটিংগুলিতে পিকাসোর প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবুও অনেকের মনে হল পিকাসোর দিন ফুরিয়ে এসেছে। সমালোচক ক্লদ লেভিস্ত্রস ঘোষণা করল—পিকাসোর মৌলিকতা হারিয়ে গেছে। তার মধ্যে যেটা রয়েছে তা শুধু চিত্রাঙ্কনের আকাডেমিক ধারা ভঙ্গ করা।

এর পরের বছরগুলিতে গ্রাফিক আর্ট-ই তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। সে এরোটিক ভাবনায় সমৃদ্ধ তিনশো সাতচল্লিশটি এচিং করে সবাইকে বিস্মিত করল। মিসেস ইভন জেরভো প্যালেস অব্ পোপ-এ যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল সেই প্রদর্শনীতে আভিইউ-উৎসবের অঙ্গহিসেবে পিকাসোর চিত্র দেখানো হল।

ক্রমে সে অষ্টআশি বছরে পদার্পণ করল। তার সৃজনীশক্তিতে তখনও যৌবনের উচ্ছলতা। বার্সেলোনার পিকাসো মিউজিয়ামে সংগ্রহ করা হল শিল্পীর আটশোটি ক্যানভাস, এই মিউজিয়ামের পরিকল্পনা করেছিল স্যাবার্তে।

এল নবব্ ই-এর জন্মদিন। গ্রাঁদ গ্যালারিতে তাকে এক বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া হল। এর পূর্বে কোন শিল্পী জীবিতাবস্থায় এ সম্মান পায় নি। এ বছরই অপ্রকাশিত তার প্রথম জীবনের কিছু চিত্রসম্ভার

প্রদর্শিত হল লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর পুশকিন মিউজিয়ামে। নিউইয়র্কের মার্লবরো এবং সেইডেনবার্গ গ্যালারিতে তার বিগত সত্তর বছরের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণও দর্শকের সামনে তুলে ধরা হল। লণ্ডন স্কুলের ছাত্ররা টাটে গ্যালারির সিঁড়িতে জড়ো হয়ে পিকাসোর 'ঘুঘু হাতে শিশু' প্রতিচ্ছবিটি উপস্থাপিত করল। এই উপলক্ষ্যে নব্বুইটি পায়রাকে মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হল।

পরের জন্মদিনে বিশ্বের কোথায় তার জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে কিনা সেদিকে পিকাসোর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তখনও সে নতর-দ্যাম-দ্য-ভিতে অনলসভাবে কাজ করে চলেছে। এসময় কালির ওয়াশ ছবিগুলি নিয়ে নতুন এক চিন্তা তাকে গভীরভাবে নাড়া দিল। এই ছবিগুলিই প্রদর্শিত হল প্যারিসে।

জীবন-সায়াহ্ন উপস্থিত। শুরু হল পিকাসোর হিসেব নিকেশের পালা। দীর্ঘজীবনের অসংখ্য সৃষ্টির—তালিকা হদিস করতে গিয়ে সব কিছুই তার জট পাকাতে লাগল। যে শিল্পী জীবিতাবস্থায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করেছে, শিল্পে এনেছে যে এক যুগান্তর, তার উপলব্ধি ছিল মহান ও অতলস্পর্শী। পুরনো খোদাইয়ের দিকে তাকিয়ে পিকাসো বিভোর হয়ে ভাবতো—সে যেন একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। সেই আয়নায় তার প্রতিকৃতি উদ্ভাসিত। সে প্রতিকৃতিটি একজন প্রতিভাবান বোহেমিয়ান শিল্পীর—যার মধ্যে আছে তার সমালোচকদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবল স্পৃহা। মূর্তিটি অহংকারে ভরপুর, একগুঁয়ে, কামুক—যে মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুতে ভয় পায় না।

এবার পিকাসো হল বার্ধক্যের কাছে পরাস্ত। একানব্বুই বছর চলছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা জাঁকিয়ে বসে তাকে একেবারে কাবু করে দিল। আমেরিকান হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পিকাসোকে নিয়ে

জ্যাকুলিন সংগোপনে এসে পৌঁছলো প্যারিসে। মাস পাঁচেক কাটলো হাসপাতালে। কিন্তু স্বাস্থ্যোন্নতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

তারা ফিরে এল নতর-দাম-দ্য-ভিতে। স্থাবার্তে আর জ্যাকুলিনের দেখাশোনার ত্রুটি নেই। পিকাসো যেন মৃত্যুর আহ্বান অহর্নিশ শুনতে পেল তাই বারবার সে বললে আমার চিরসঙ্গিনী একজন— সেই মৃত্যু আমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবে না।

মাত্র সাতদিন কোনরকমে নতর-দাম-দ্য-ভিতে এসে পিকাসো কাটালো।

তারপর ?

গোটা বাড়ীটা নিস্পন্দ, যেন একটা ছবি। পিকাসোর উঁচু গলার হাসিটা আর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল না। পায়রার একটানা বক-বকম রব আর শোনা গেল না। পিকাসোর সেই পোষা প্রিয়-ছাগলটা আধখাওয়া ক্রোটনের পাতা থেকে মুখ তুলে কেমন বিস্মিত আর ব্যথিত চোখে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। জ্যাকুলিন বসেছিল পিকাসোর মাথার কাছে, যেন একটা শিলীভূত মূর্তি—একটু আগে যেন তাকে খোদাই করা হয়েছে।

যুগযুগান্তর ধরে বিশ্বের মানুষের কাছে থাকবে একটা জিজ্ঞাসা— মৃত্যু কি তোমাকে কোনদিন মানুষের মন থেকে মুছে দিতে পারবে ?

মঁসিয়ে পিকাসো, তোমাকে ? তোমার শিল্পকীর্তিকে ?

সমাপ্ত